আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক উর্দু, হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িআ, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, পাঞ্জাবী, মালায়ালম, সিন্ধী, কাশ্মীরী, গুজরাতী, মারাঠী, ভারতীয় ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা ও পূবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনামূলক প্রথম বাংলা গ্রন্থ।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপায়ন
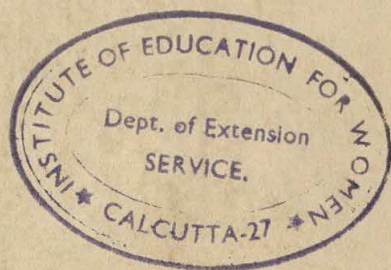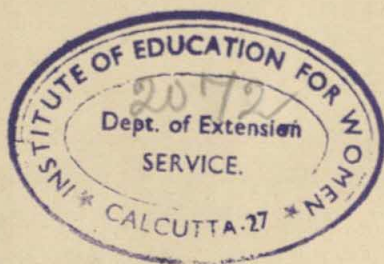
প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬১
প্রকাশিকা
রেণু দেবী
দীপায়ণ
২০, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা : ৯
মুদ্রক
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা : ৬
প্রচ্ছদ ও আখরশিল্পী
মনীন্দ্র মিত্র
ছবি
কালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

ছ' টাকা
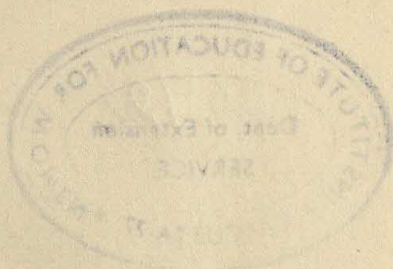
। পরিবেশক ।
নবভারতী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা : ১২

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॰ লেখকের অন্যান্য বই ॰

পঞ্চকন্যা [যন্ত্রস্থ]

নতুন নায়িকা

রাম রহিম

রাত্রির আকাশে সূর্য

অনুবাদ

সেতুবন্ধ

দুই ভাই

রাজসূয়

প্রিয়তমেষু

শাদাকালো

গোধূলির গান

সেই আশ্চর্য রাত

অবতরণিকা

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বাংলার ভূমিকা অনন্য—সেযুগেও, এযুগেও। বহু জাতি-উপজাতির মিলন ঘটেছে বাংলার মাটিতে, সংস্কৃতির অজস্র ধারা মিশেছে এখানে। যাগযজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে কোনদিন বাংলা প্রশ্রয় দেয়নি। শাস্ত্রপাণি উত্তরভারতের ভ্রূকুটিকে বরাবর অগ্রাহ্য করেছে। দেবতার ওপর আসন দিয়েছে মানুষকে। দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা। বাংলা মানবপন্থী চিরকাল। আর্যবিধানে বাংলা ছিল নিষিদ্ধ দেশ, এখান থেকে ফিরে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে পবিত্র হতে হত। তবু সে স্বধর্মচ্যুত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ এখানে ভূমি উর্বর। বীজ মাত্রেই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে।…পুরাতন মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয়না।… পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না সইলেও জীবনের দাবি-দাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে। প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে।…

প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের নিদর্শন চর্যাগীতি। চর্যাগীতিকাররা ছিলেন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। সংস্কৃত রূপরীতিকে তাঁরা পরিহার করেছিলেন, বৈদিক ধ্যানধারনাকে অস্বীকার। লৌকিক ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে সমসাময়িক গণমানসেরই আশ্চর্য প্রতিফলন চর্যাগীতিতে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের মূল সুর মানবতাবাদ। রাষ্ট্রিক ঝড়ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ সামাজিক জীবনের অনুপম রূপায়ণ মঙ্গলকাব্যগুলি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের, সুখদুঃখ-মিলনবিরহের, শান্তি-সমৃদ্ধি-নিরাপত্তার আকুল কামনার বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র। মঙ্গলকাব্যের দেবতাও বৈদিক নন, লৌকিক। তার ভাষাও। ইসলামের আবির্ভাবে বাংলায় যে-ঐতিহাসিক সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটে তার পরম বিকাশ শ্রীচৈতন্য। ভাববিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক চৈতন্যদেব। তাঁর মানবধর্ম—এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু হেন ধন বিলাইল সংসারে। ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব গীতিকবিতা ও চৈতন্যচরিত কাব্যের নায়ক রূপকাশ্রিত

দেবতাও নন—দেবপ্রতিম মানুষ। কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ। কিন্তু—

কিন্তু, যুগে যুগে প্রবলকণ্ঠে উচ্চারিত এই মানবধর্ম বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও শ্রেণীবৈষম্যে মুমূর্ষু সমাজকে রক্ষা করতে পারেনি। এ-গৃহ শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্রবচন বলে—কোন ফল হয়নি এই বৈদিক প্রার্থনায়। কেননা, কে না জানে,শুধু মহান আদর্শের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাই সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে, দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না—যদি-না সেই সঙ্গে ঘটে সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের মৌলিক কোন রূপান্তর। আর-আর মহাপুরুষদের মত শ্রীচৈতন্যও ছিলেন ভাবলোকের বিদ্রোহী। প্রচলিত সমাজ-কাঠামোয় তিনি আঘাত হানেননি। হানতে চাননি। তাই, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেখি—বৃন্দাবন আর নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে চৈতন্যভক্তরা দ্বিধাবিভক্ত। দু'দলই ভ্রষ্ট তাঁর উদারমানবিক আদর্শ থেকে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চৈতন্যদেবের অসাধারণ গৌরবময় ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েও নবজাগৃতির পুরোহিত তাঁকে বলা যায় না। তিনি ভাবজগতের সমন্বয়সাধক মাত্র। দুর্বল শরীরে অত্যুগ্র সুরার প্রতিক্রিয়ার মত সমাজজীবনকে তা আলোড়িত করেছিল নিঃসন্দেহে—সামাজিক সমস্যার স্থায়ী কোন সমাধান করতে পারেনি। অধিকন্তু, এর অনিবার্য পরিণামে চৈতন্যপরবর্তী ও প্রাক-ইংরেজ যুগে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নেমে আসে নৈরাশ্য-জনিত অন্ধকার অধ্যায়।

এক লক্ষ্মণ সেনের দুর্বলতা যেমন বাংলায় ইসলাম আধিপত্য কায়েম করেনি, তেমনি বাংলার পরাধীনতার জন্য শুধু মীর জাফর একা দায়ী নয়। ব্যক্তিবিশেষের মর্জিমাফিক ইতিহাস এগোয় না, যদি-না পথ সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে, পরিবেশ অনুকূল হয়। গলিতনখদন্ত সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারে, কুসংস্কারে ও কূপমণ্ডূকতায়, দুর্নীতিতে আর ব্যাভিচারে বাংলার সমাজজীবন যখন মৃতকল্প—ইতিহাসের সেই মহেন্দ্র লগ্নে আবির্ভাব ইংরেজের। ভারত-অভিযানে যাযাবর আর্যের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল দ্রুতগামী অশ্ববাহিনী। ইসলামের বাঁ হাতে তরবারি ডান হাতে কোর্‌আন—একেশ্বরবাদ আর নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শ। এযুগে ইংরেজ নিয়ে এল যুগান্তকারী আধুনিক বিজ্ঞান। বৈদিক মন্ত্রবচনে যা হয়নি, আধুনিক যন্ত্রবলে তাই হয়েছে। প্রতিটি গৃহ অবশ্য সুখসমৃদ্ধির আগার হয়ে আজো ওঠেনি, তবু অসাধ্যসাধন—মন্ত্র নয়—

যন্ত্র করেছে। মহামানবদের জীবনস্বপ্ন কোনদিন যদি সফল হয়, হবেই, তা করবে বিজ্ঞান।

বহুবার ভারত বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে—সেই হানাদারেরা হয় লুঠতরাজ করে চলে গিয়েছে, কিম্বা নিঃশেষে একাত্ম হয়েছে ভারতের সঙ্গে। ব্যতিক্রম শুধু আর্য আর ইসলামের অভিযান। এবং ইংরেজের। সমসাময়িক ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় ইংরেজ-সভ্যতা ছিল উন্নততর। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ইংরেজ ভেঙে ফেলেছে। ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার মহান অবদানগুলি নস্যাৎ করে দিয়েছে। ভারতে ইংরেজ শাসনের সমগ্র ইতিহাস নির্মম শোষণ আর পাশবিক শাসনের হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্ত। তবু—

তবু, ইংরেজই পরোক্ষ স্রষ্টা আধুনিক ভারতের। ইংরেজ শহর প্রতিষ্ঠা করে। নিজের প্রয়োজনে নতুন এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলে। ইংরেজেরই প্রশ্রয় ও স্নেহাতপতলে ভারতে নতুন বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয়। অসমাপ্ত হলেও ভারতের সমাজবিন্যাসে ইংরেজই প্রথম ঘটায় মৌলিক রূপান্তর। সেদিনের ভারত মানে বাংলা। সেদিনের বাংলা মানে কলকাতা—'আজব শহর কলকাতা'। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করলেও বাংলাতেই নির্ণীত হয় ইংরেজের ভাগ্য, কালক্রমে কলকাতাই সংস্কৃতির প্রধান পীঠস্থান হয়ে ওঠে। এই সংস্কৃতির স্রষ্টা ইংরেজ-সৃষ্ট নব্যসম্প্রদায়, এই সংস্কৃতির শিকড় দেশের গভীরে নয়, এই সংস্কৃতির সঙ্গে জনসাধারণের বৃহদংশের আন্তরিক যোগাযোগ নেই—সবই সত্যি—তবু অবদান এর অনস্বীকার্য।

আর্য ও অনার্য এবং ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পর এবার ঘটল তৃতীয় ঐতিহাসিক সংস্কৃতি-সংমিশ্রণ—সামন্ততন্ত্রী ভারত আর ধনতন্ত্রী ইউরোপ। যন্ত্রশিল্পের প্রসারে দেশকালের গণ্ডি তিরোহিত হল। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে নব্যসম্প্রদায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে—ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার, আধুনিক যুক্তিবাদের জাতীয়তাবোধের ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অজ্ঞাতপূর্ব আদর্শের সঙ্গে—পরিচিত হলেন। নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। নবজাগৃতির জোয়ার এল।

এই নবজাগৃতি শুধু মানসলোকের ফসল নয়, তার একটা সামাজিক বনিয়াদও তখন গড়ে উঠেছে। তিনটি অধ্যায় একে ভাগ করা যায়—রামমোহন, 'ইয়ং বেঙ্গল,' মধুসূদন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ। নতুন ভাবগঙ্গার ভগীরথ

রামমোহন, সেই গঙ্গায় বন্যার আবেগ এনেছিল 'ইয়ং বেঙ্গল', বন্যার পলিমাটিতে নতুন ফসলের সমারোহ সৃষ্টি করলেন মধুসূদন-বঙ্কিমরা। তৃতীয় অধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তী কাল, ভারতে সামন্ততন্ত্রের আত্মরক্ষার অন্তিমপ্রয়াস তখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম এই যুগে।

সেযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র, যুগসন্ধির ঈশ্বর গুপ্ত, এযুগের প্রথম কবি রঙ্গলাল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের পার্থক্য গুণগত। আধুনিক বাংলা গদ্যেরও জন্ম এই যুগে। নাটক, প্রহসন, উপন্যাস ও ছোট গল্প সম্পূর্ণভাবে এযুগের দান। আর, অনুবাদ। এর আগেও অবিশ্যি বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের রেওয়াজ ছিল, কিন্তু অনুবাদ-সাহিত্য স্বতন্ত্র একটি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়। নতুন সৃষ্টির প্রাক্কালে অনুবাদের বাতায়নপথেই বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে।

সমাজচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমুখিতা ও আত্মপ্রসার, এবং জাতীয়তাবোধ —আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। যুগসন্ধির ঈশ্বর গুপ্ত জাতীয়তাবোধের প্রথম স্ফুরণ। বিদেশের ঠাকুরের বদলে স্বদেশের কুকুরকে তিনি শ্রেয় মনে করেন। গুপ্ত কবির এক চোখ ছিল অতীতের দিকে, আরেক চোখ বর্তমানের—তাই ভবিষ্যতের পথ চিনে নিতে পারেননি। শিষ্য রঙ্গলাল গুরু-অতিক্রমী : ইংরেজি কাব্যের রোমান্স্-রস আনিয়া দিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ ফিরাইলেন নবযুগের দিকে। অবান্তর কাল্পনিক পরিবেশে স্থূল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে গ্রহণ করিলেন কাব্যের বিষয়রূপে। ইংরেজি-শিক্ষিতের অবচেতনায় পরাধীনতার বেদনা যে অস্বস্তি জাগাইয়াছিল তাহার কথঞ্চিৎ প্রলেপ যোগাইল টডের রাজস্থান কাহিনী। রাজপুত-বীরত্বের গল্পে বাঙ্গালীর দেশগৌরববোধ খাড়া হইবার অবলম্বন পাইল। ইংরেজি শিক্ষিত প্রথম বাঙ্গালী কবি রঙ্গলালও তাই টডের ভাণ্ডার হইতে কাব্যের বিষয় নির্বাচন করিলেন।...'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের নিগূঢ় অনুভূতিকে কতকটা বাঙ্ময় দেখিয়া আশ্বস্ত হইল।...কাব্যরঙ্গভূমিতে মধুসূদনের প্রবেশের পূর্বে রঙ্গলাল নান্দী গাহিয়াছিলেন। (সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। প্রথম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি মধুসূদন। বিদ্রোহী তিনি ব্যক্তিজীবনে, কবিজীবনেও।

বাংলা কাব্যে নবযুগের প্রবর্তক। দুর্বার প্রাণাবেগ, আর সমসাময়িক দ্বন্দ্বজটিল সমাজমানসিকতার শিল্পায়ণে মধুসূদন ভাস্বর। ইংরেজি শিক্ষা এবং দেশি-বিদেশি ধ্রুপদী সাহিত্যের সচেতন সক্রিয় অনুশীলনের সাহায্যে তিনিই প্রথম নিজস্ব একটি কাব্য-পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন। ব্যক্তির মুক্তিতে তিনি বিশ্বাসী, ব্যক্তির মর্যাদায় আস্থাবান। তাঁর কাব্য ও নাটকের নায়কনায়িকারা রক্তমাংসের নরনারী—একেকটি আইডিয়ার প্রতীক নয়, চিরাচরিত টাইপ না। তারা হাসে, কাঁদে। ভুল করে, অনুতাপে দগ্ধ হয়। প্রচলিত ধ্যানধারনার প্রতি তাঁর অশেষ অনীহা। পররাজ্যে হানাদার অবতার রামের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষায় অকুতোভয় রাক্ষসরাজের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সোচ্চার। মেঘনাদ তাঁর কাছে *a fine fellow,* রাবণ *a grand fellow,* শ্রীবিভীষণ *a scoundrel,* এবং রাম ও তার বানরবাহিনীকে তিনি ঘৃণা করেন। তবু রাবণকে পরাজিত হতে হয়। প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে! ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি মধুসূদনকে অদৃষ্টবাদী করে তোলে।

মধুসূদনের কবিকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী। আত্মমুখী কবিতা রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস। দেশপ্রেমমূলক কবিতার সূচনা রঙ্গলালে, তাতে বীররসের আবেগ সঞ্চার করেন হেম, নবীন। আত্মমুখী কবিতা আধুনিক গীতিকাব্যের খাতে প্রবাহিত হয় বিহারীলালের হাতে। বাংলা কাব্যের—বাংলা সাহিত্যের—সর্বতোমুখী বিকাশ রবীন্দ্রনাথে। এ-বিকাশের বিশেষণ অনির্বচনীয়। ভাববস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের বহিরঙ্গের পরিবর্তনও অনিবার্য। পয়ার ত্রিপদী মালঝাঁপের চিরাচরিত কাঠামোয় কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছিলেন রঙ্গলাল, মধুসূদন ঘটালেন বৈপ্লবিক রূপান্তর—পয়ারের শৃঙ্খলমুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ব্যক্তিগত আবেগানুভূতির সুসংহত প্রকাশের অনুপম বাহন সনেট। নাটক, উপন্যাস পুরোপুরি আধুনিক যুগের দান—ধনতন্ত্রী সভ্যতার ফসল। সংস্কৃত নাটক ও যাত্রাকে নাটকের পূর্বরূপ বলা হলেও, আধুনিক নাটকের জন্ম ইংরেজির অনুসরণ বা অনুকরণের মধ্যে দিয়ে। সেই হিশেবে প্রথম বাংলা ট্রাজেডি জি সি গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস,' কমেডি তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। প্রথম বড় গল্প—রোমান্স বলাই সঙ্গত—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়,' ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', সামাজিক 'বিষবৃক্ষ', রাজনৈতিক 'আনন্দমঠ', গার্হস্থ্য তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'। ঠিক উপন্যাস না হলেও সমসাময়িক সমাজের বাস্তবচিত্র হিশেবে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের

তুলাল'-এর নামও পাশাপাশি উল্লেখ্য। বাংলা গদ্যকে নতুন করে গড়ে তুললেন অক্ষয়কুমার, তাতে সংস্কৃতের মাধুর্য সঞ্চার করলেন বিদ্যাসাগর, সাধারণের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আসরে আনলেন প্যারীচাঁদ, গদ্যকে কথাসাহিত্যের বাহন করে তুললেন বঙ্কিমচন্দ্র।

কী ঐতিহাসিক কী সামাজিক সর্বত্রই বঙ্কিম ইংরেজি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। কিন্তু এ-রোমান্টিসিজম অক্ষমের কল্পনাবিলাস নয়, জীবনের অঙ্গীকারে মহিমময়। দ্বিধাদ্বন্দ্ব-পিছুটানের অভাব বঙ্কিমে নেই, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রগতি-বিরোধীর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ—কিন্তু সে-দ্বন্দ্ব সে-বিরোধিতা বঙ্কিমের নীতিবাগীশ মনের, শিল্পী বঙ্কিমের নয়। সচেতন পাঠকের আজ বুঝতে দেরি হয়না—কোথায় নীতিবাগীশ বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমকে হত্যা করলেন ঠাণ্ডামাথায়। যেমন বুঝতে দেরি হয়না—তাঁর 'মুসলিম-বিদ্বেষে'র আসল তাৎপর্য। বঙ্কিমের ধর্মবোধ প্রবল ছিল, সন্দেহ নেই, প্রবলতর ছিল জাতীয়তাবোধ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা হিশেবে রঙ্গলাল মধুসূদন হেম নবীন দীনবন্ধু বঙ্কিম রমেশচন্দ্র অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদ বিহারীলাল প্রমুখের নামের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এঁরা অবশ্যই এক-একজন দিকপাল। কিন্তু, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণের সবখানি কৃতিত্ব একান্তভাবে এঁদেরই শুধু নয়। সে এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের যুগ। মধ্যযুগের অচলায়তন ধ্বসে পড়ছে, পশ্চিমী সূর্যের তীব্র আলোকচ্ছটা চোখে এসে লাগছে। সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দীর্ঘদিনের চোরাকুঠরীর বাসিন্দারা সকলেই দিশেহারা কম-বেশি। গতিহারা নয়। চোখে তাঁদের নবজাত শিশুর বিস্ময়। সৃষ্টির নেশায় একযোগে সবাই মেতে উঠেছেন। নতুন নতুন দেশ-আবিষ্কারের মত সাহিত্য-ভূগোলের সীমানাকে এঁরা বিস্তৃত করেছেন। হয়ত বেশিদূর সবাই এগোতে পারেননি—পারেননি নিজেদের অক্ষমতার জন্যে ,সামাজিক প্রতিবন্ধকতার দরুন। তবু যাত্রাটা তাঁদের মিথ্যে নয়। বাংলার জাতীয় জীবনে সেদিন যে বিপুল কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, তার সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস আজো অলিখিত। ভারতেতিহাসে বাংলার উনবিংশ শতাব্দী সবচেয়ে গৌরবময় আর সবচেয়ে উপেক্ষিত অধ্যায়—মোহিতলালের মত অন্ধ অতীত-অনুরাগী না হয়েও এ-কথা বলা যায়। তাই এই দিকপাল লেখকদের আড়ালে এমন অনেককে আমরা আজ ভুলতে বসেছি তুলনায় কম শক্তিধর হলেও নগণ্য তাঁরা কোনমতেই নন।

শুধু *'also ran'* বলে উপেক্ষা এঁদের করা উচিত নয়। তাঁদের সামগ্রিক প্রয়াসেই বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টি, সমৃদ্ধি। অনস্বীকার্য, সে-আনন্দের ভোজে আপামর জনসাধারণের নিমন্ত্রণ ছিল না। নিমন্ত্রণ সম্ভবও ছিল না। তবু, চেষ্টা তাঁরা যথাসাধ্য করেছিলেন। নিছক সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিতরণের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। শুধু পাঠ্যপুস্তক মারফৎ নয়, সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেও। বাংলা সাহিত্যের প্রসারে অসাধারণ সংবাদপত্রের ভূমিকা। আর, পুরোভাগে তার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।

রামমোহনে যে-অগ্রগতির শুরু, রবীন্দ্রনাথে তার সমাপ্তি। (উপনিবেশের মাটিতে বুর্জোআ সংস্কৃতির বৃহত্তম বনস্পতির জন্ম-যে কী করে সম্ভব হল!) ইতিমধ্যে উনিশশতকীয় রোমান্টিসিজমের শরীরে পচন শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজ-রাজ সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটেছে। নিজের গরজে ইংরেজ শিবাজীর স্বপ্নকে সফল করে—তবে ধর্মরাজ্যপাশে নয়, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গকে বাঁধে এক শাসনের নাগপাশে। নেশনের জন্ম হয়, ন্যাশন্যালিজমেরও। সেই ন্যাশন্যালিজমের চশমায় ভারতীয় বণিকরা ছাখে—তাদের সামনে প্রবল অন্তরায় ইংরেজ বেনে। মধ্যবিত্ত বিভ্রান্ত—বি-এ পাশ করে ডেপুটী হওয়া দূরস্থান, এম-এ হয়েও আর চাকরি জোটে না। শিক্ষিতের যথোচিত মর্যাদা মেলে না! ওদিকে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতাপে আর কলকারখানার প্রসারে নির্বিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতিতে। ধূমায়িত অসন্তোষ সর্বত্র। এই পটভূমিকায় কংগ্রেসের জন্ম। ইংরেজ প্রথমে কংগ্রেসকে প্রশ্রয়ই দিয়েছিল। ভেবেছিল, অনুগ্রহের ছিটেফোঁটা বিলিয়ে অভিমানী উচ্চবিত্তকে বশে রাখবে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধাপ্পায় জাতীয় অসন্তোষকে ধামা চাপা দেবে। পারেনি। নেতৃত্বের পিছটান সত্বেও জনতার চাপে ধাপে ধাপে কংগ্রেস গণ-আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে। ভারতের চোখের উপর ধনতন্ত্রী জগতের আভ্যন্তরীণ সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে, দু-দুটি মহাযুদ্ধে তার বীভৎস-ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে বেরিয়েছে। আবার, বিপ্লবের রক্তাক্ত জঠর থেকে জন্ম নিয়েছে শিশু সোভিয়েট।

কিন্তু, উনিশ শতক যেমন অবলীলায় ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপ্ত হতে পেরেছিল, বিশ শতকের বাংলা তত সহজে অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি। তাকে করতে দেয়নি ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। ফলত, অতিআধুনিক লেখকরা পুরনো ধ্যানধারনা ও

মূল্যবোধের ওপর অনিবার্যভাবেই অবস্থা হারিয়েছেন, নতুন আশ্রয় খুঁজে পাননি। অগত্যা নৈরাজ্যবাদের বাঁকাচোরা পথ। মুক্তি খুঁজেছেন আত্মরতিতে, নির্বীর্য রোমান্টিক অভিসারে। যৌনসমস্যাকেই চরম ভেবেছেন। অথবা, হাহাকার করেছেন স্বকপোলকল্পিত অতীতের রোমন্থনে।

এটা সত্যি, এই শুধু সত্যি নয়। আপোষকামী কংগ্রেসী আন্দোলনের পাশে পাশে আরও-একটি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে—কিসান-শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন। তারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে তাঁরা ক্রমেআশার আলো দ্যাখেন। নতুন করে আত্মোপলব্ধি করেন। জীবনের মানে খুঁজে পান। অনেক যন্ত্রণা সয়ে, সংশয়ের অনেক কাঁকর মাড়িয়ে, আত্মপরীক্ষার অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তাঁরা—অন্তত তাঁদের বৃহত্তম অংশ—আজ বুঝছেন: মুক্তি কোন্ পথে। জীবন-সায়াহ্নে সভ্যতার সংকট দেখে রবীন্দ্রনাথ শিউরে উঠেছিলেন, এ-সভ্যতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—তবু তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানোর মত পাপ করেন নি। দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে—তাদের ডাক দিয়ে গিয়েছেন। এঁরা সেই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মহান অবদানগুলি আত্মস্থ করে নিয়ে এরা এগোতে চান। সমুখে দাঁড়ায়ে আছে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর বলে একদা-আর্তনাদকারী নতুন পথের দিশারীরা অধুনা সাহিত্যিক আত্মহত্যা বা রবীন্দ্রনাথে নিঃশর্ত আত্মবিসর্জন করলেও এঁরা জানেন: আমরা শুধু জাতক নই, জনকও।

আজ ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আজ দিল্লীতে স্থানান্তরিত, বাণিজ্যিক বোম্বাইয়ে—তবু, আজো বাংলা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে মাত্র দুটি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, ইংরেজি আর বাংলা'—জনৈক ইংরেজ অধ্যাপকের এই উক্তি মিথ্যে নয়। বাংলা যেমন ইংরেজির কাছে ঋণী, সারা ভারত তেমনি বাংলার কাছে। গত শতক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলার প্রতিটি সাহিত্যিক আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সারা ভারতকে প্রেরণা যুগিয়েছে। সামাজিক বিকাশের তারতম্য অনুযায়ী সে-প্রভাবের তারতম্য ঘটেছে। বাংলার সে-ঋণ স্বীকারে অন্যান্য অঞ্চলের স্থিতধী লেখকরা পরাঙ্মুখ নন।

গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে ভারতে মোট ভাষার সংখ্যা একশো উনআশি, উপভাষাগুলি ধরলে সাতশো তেইশ। এর মধ্যে সাহিত্যিক সমৃদ্ধি অবিশ্যি অধিকাংশেরই নেই। আধুনিক সাহিত্যের বাহন হিশেবে মাত্র পনেরোটিকে গ্রহণ করা যায়—উর্দু, হিন্দী, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িআ, মারাঠী, গুজরাতী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, নেপালী, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম ও কানাড়ী। বইটি বাঙালি পাঠকের জন্যে, তাই বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। তাই নেপালীর বদলে মৈথিলীকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনায় বহু বাঙালি-অবাঙালি লেখকের সাহায্য আমি নিয়েছি, সে-দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আমাকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করেছেন, পরিশিষ্টে তাঁদের কয়েকজনের মাত্র নাম দেওয়া হল। প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন শ্রীতুলসী দাস। এঁদের সকলের কাছে ঋণ আমার অপরিশোধ্য, সবিনয়ে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখলাম।

'অসমীয়া' ও 'পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য' ছাড়া বাকি প্রবন্ধগুলি 'যুগান্তর' সাময়িকীতে প্রকাশিত। প্রথমোক্তটি বেরোয় অধুনালুপ্ত 'বঙ্গশ্রী'তে, দ্বিতীয়টি শারদীয় 'সত্যযুগ'-এ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ আমূল পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত। তবু পূর্ণাঙ্গ বলে একে দাবি করিনে। একটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা কি সম্ভব? আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা আমি সৃষ্টি করতে চেয়েছি মাত্র। যাই হোক, এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

শক্তি-সামর্থ্য আমার যৎসামান্য। তবু দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্বেও হয়ত ভুলত্রুটি থেকে গিয়েছে, হয়ত যা বলতে চেয়েছি ঠিকভাবে বলতে পারিনি, চিন্তার দৈন্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে, হয়ত-বা অকারণে কারো মনে ব্যথা দিয়েছি—এসবের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত এবং মার্জনাপ্রার্থী।

বইটি সম্পর্কে পাঠক সাধারণের অভিমত ও সকল প্রকার গঠনমূলক সমালোচনা আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব। ইতি—

১১, কুচিল ঘোষাল লেন
হাওড়া

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
২২-শে শ্রাবণ, ১৩৬১

সূচীপত্র

প্রেমচাঁদ ইকবাল রবীন্দ্রনাথ ভাল্লাথোল ভারতী

উর্দু

The great literary output of Hindus, Muslims and Europeans and Indo-Europeans is an index of the tremendous variety and richness of Urdu literature. It is a mighty river with noble tributaries. ...Urdu literature does not belong to an exclusive community. It is a common heritage. It is above all communal passions and party politics. It is a symbol of unity and love. ···Hindus, Muslims, Europeans and Indo-Europeans have built it up with all the best that they possessed.

উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে পণ্ডিতম্মন্য মহলের, আর, পশ্চিম-পাকিস্তানের 'বাবায়ে উর্দু'র প্রাণঘাতী উর্দুপ্রীতির কথা স্মরণ করে এই উধৃতির প্রয়োজন বোধ করলাম। উর্দু সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সমালোচক ডক্টর রামবাবু শক্সেনা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ: *European and Indo-European Poets of Urdu and Persian*-এ কথাগুলি বলেছেন। উর্দুর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শুধু-যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচার তাই-ই নয়, বরং বলা যায়—ভাষার দিক দিয়ে ভারতের সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক ঐক্যের সবচেয়ে বড় যোগসূত্র উর্দু। উর্দুর জন্মই তো আশ্চর্য এক সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে।

উর্দু শব্দটি তুর্কী, অর্থ—সৈন্যশিবির বা ছাউনী। লিপি ফার্সী। প্রধানত সৈন্যদের মধ্যেই এই ভাষার জন্ম, তাই এর ঐ নাম। মুঘল আমলে সৈন্য-বাহিনীতে আরব, ইরান, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের লোক ছিল অনেক। এদেশের কোন ভাষা তারা জানত না, আবার নিজেদের মাতৃভাষায় পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ও ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। ধর্মের দিক দিয়ে ইরান ও আরবের, আরব এবং তুরস্কের লোকদের মধ্যে মিল অবিকল সন্দেহ-কি, কিন্তু ভাষা কেউ কারো বোঝে না। অথচ, প্রয়োজনের তাগিদ পুরোমাত্রায়। আর, এই

প্রয়োজনের তাগিদ শুধু বিদেশি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজা-বাদশা আমীর-ওমরাহ্‌ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও ছিল। তাঁদের মাতৃভাষা ফার্সী, প্রজাসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হলে কাজ চলে না ফার্সীতে। এরই ফলে আরবী, ইরানী ইত্যাদি বিদেশি ও নানা দেশি শব্দের সংমিশ্রণে একটি নতুন ভাষা গড়ে উঠল : উর্দু। আসলে উর্দু হিন্দীরই আরেক রূপ। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মতে : 'উর্দুর মা হিন্দী, বাবা ফার্সী।' অর্থাৎ, উর্দুকে এক হিশেবে 'মুসলমানী হিন্দী' নামেও অভিহিত করা চলে।

প্রথম দিকে উর্দু ছিল ভারতপ্রবাসী মুসলিমদের ভাবপ্রকাশের বাহন মাত্র, কালক্রমে হয়ে ওঠে সাহিত্যের মাধ্যম। মুসলিম শাসকরা প্রথম থেকেই এই নতুন ভাষাটিকে সযত্নে লালন করতে শুরু করেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুরাও ফার্সীর বদলে উর্দুকেই মনে করতেন অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

প্রথম উর্দু সাহিত্যিক কে? প্রশ্নটা বিতর্কমূলক। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে মুসলিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি আমীর খশরুর (১২৪৬-১৩২৬) নাম মনে পড়ে। আমীর খশরু ফার্সীতে কবিতা লিখলেও তিনিই প্রথম তাঁর কবিতায় হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গক্রমে এঁর 'খলিক বারী' কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দী শব্দের ভূরি ভূরি নিদর্শন এতে রয়েছে। আমীর খশরুর সঙ্গে সঙ্গে কবীরের নামও কেউ কেউ করে থাকেন। তাঁর রচনাতে আবার হিন্দীর পাশাপাশি বহু আরবী-ফার্সী শব্দ চোখে পড়ে। এই সংমিশ্রণজাত কবিতাকে বলা হত 'রেখ্‌তা'। দীর্ঘকাল ধরে ধ্রুপদী ফার্সী সাহিত্যে পাশাপাশি এই রেখতার প্রবাহও বয়ে এসেছে। আজকের উর্দুরই পূর্বরূপ রেখতা—একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। তবু, আমীর খশরুকে উর্দু কবি হিশেবে অভিহিত করা যায় না। উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি দাক্ষিণাত্যের মুহম্মদ ওয়ালী। শুধু ধর্মান্তরিত হিন্দু কিম্বা মুসলিম শাসকগোষ্ঠী নন, ধর্মপ্রচারকদের দানও উর্দুর সমৃদ্ধিতে যথেষ্ট। এইরকম এক ধর্মপ্রচারক—সৈয়দ মুহম্মদ বান্দা নওয়াজ গিসু দরাজ উর্দু ভাষায় রচিত প্রথম গদ্যগ্রন্থের (প্রচার-পুস্তিকা) প্রণেতা। সে হল ১৪২২ সালের কথা।

উর্দু কবিতা সম্পর্কে একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উর্দু ভাষার জন্ম ভারতে হলেও প্রথম যুগের উর্দু কবিদের নাড়ির যোগ ছিল না দেশের মাটির সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন মূলত ফার্সী কবি, এবং উর্দুতে কাব্যরচনাকে নিছক বিলাস

ও অবসরবিনোদনের উপায় বলে মনে করতেন। কাসিদা, মশনবী, গজল, রুবাঈ, কিতা ও মর্সিয়া—উর্দু কাব্যসাহিত্যের এই আঙ্গিকগুলি ফার্সীর হুবহু অনুকরণ। কবিরা কবিতা লিখতেন ভারতে বসে, কিন্তু তাঁদের হৃদয়-মন পড়ে থাকত মুসলিম জাহানের দিকে। এমন-কি, মহাকবি গালিব পর্যন্ত বলতেন—তাঁর প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় মিলবে তাঁর, উর্দু নয়, ফার্সী কবিতাবলীতে।

আরও-একটি আশ্চর্যের কথা: দিল্লী ও লাখনৌ একদা ফার্সী শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠলেও, উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি ছিলেন হায়দরাবাদের বাসিন্দা, নাম আগেই বলেছি—মুহম্মদ ওয়ালী। পরবর্তী যুগে দিল্লী ও লাখনৌকে কেন্দ্র করে দুটি 'স্কুল' গড়ে ওঠে। দিল্লী-'স্কুলে'র প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা শাহ্ হাতিম ও মজহর জান জানান, লাখনৌ-'স্কুলে'র ইনশা মুশাফির ও জুরাত। দুই 'স্কুলে'র কবিদের মধ্যে পার্থক্যও ছিল অনেকখানি। রাজকীয় বিলাস-ব্যাভিচার আর রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকার দরুন দিল্লীর কবিদের ভাবনাচিন্তা বিষণ্ণ ও নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে ওঠে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই হতাশা আরও বিকট-বীভৎস রূপে প্রতিফলিত হয় তাঁদের রচনায়। ১৭০০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত রচিত তাঁদের অধিকাংশ কবিতা রীতিমত শুকারজনক। এর ব্যতিক্রম লাখনৌর কবিরা। প্রশান্ত পরিবেশে কাব্যসাধনার অবকাশ পেয়েছিলেন বলে এঁদের কবিতাবলী অনুপম লাবণ্য ও স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত। দিল্লীর কবিতা বড়-বেশি স্পষ্টবাক, উচ্চকণ্ঠ, কিছুটা স্থূলও – লাখনৌর মৃদু, মিতভাষী।

মুসলিম নবজাগৃতির বাহন

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ঘুণধরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এক প্রচণ্ড আঘাত খেল। শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসের রাজত্ব—ব্যাপক খুনজখম, ধরপাকড়, ধ্বংসোৎসব। শিল্প-সংস্কৃতির কোন মূল্য, সাময়িক ভাবে হলেও, রইল না। বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে গালিব পর্যন্ত বন্দী হলেন। কারাবাসকালেই গালিব তাঁর বিখ্যাত ফার্সী গ্রন্থ 'দাস্তাম্বু' রচনা করেন। মুঘল আমলের ইতিহাস বিবৃত এই গ্রন্থে।

সাল আঠারো শ' সাতান্ন আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জন্মকাল। সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম, না, সামন্ততান্ত্রিক ভারতের অন্তিম অভ্যুত্থান—সে-বিতর্ক আপাতত মুলতুবি। তবে, সিরাজের পতনের মধ্যে দিয়ে যার সূচনা দেখা গিয়েছিল, বাহাদুর শাহ্‌র নির্বাসনে তাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল—ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ হল দৃঢ়ভিত্তিক।

এবং, ইংরেজ শাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ইংরেজি শিক্ষা। ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতি একদিকে যেমন ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর মূল ধরে নাড়া দিল, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার বিস্তারে প্রচলিত ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নতুন জীবনদর্শন ও নতুন নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব হল।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার বেদনাটা বেশি বেজেছিল মুসলমানদের। কারণ, বাহাদুর শাহ্‌ যদিচ নামকাওয়াস্তে সম্রাট ছিলেন, তবু ইংরেজ সরাসরি তাঁর হাত থেকেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তাই শিশুয়ালী একটা অভিমানে মুসলিম সম্প্রদায় সেদিন ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা শুরু করেন। ধর্মগুরুদের ফতোয়া অনুযায়ী ইংরেজি শিক্ষা তাঁদের কাছে হারাম হয়ে যায়। কিন্তু, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) দেখলেন, এ-অসহযোগিতা আত্মহত্যার নামান্তর। যত মর্মান্তিক হোক, সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যর্থতা বাস্তব ঘটনাবলীর কার্যকারণ পরিণতি মাত্র। মুসলমানদের বাঁচতে হলে, মুসলমান হিশেবে ফের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, নতুন সভ্যতার জোয়ারে অবগাহন তাদের করতেই হবে। এ-ই কালের অমোঘ নির্দেশ।

স্যর সৈয়দ শুধু ভারতে মুসলিম নবজাগৃতির হোতা নন, আধুনিক উর্দু সাহিত্যের ভিত্তিও নির্মিত তাঁর হাতে।

অবিশ্যি, নিছক সাম্প্রদায়িক প্রীতির প্রেরণায় স্যর সৈয়দ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, স্বীকার্য। তাঁর অনন্য ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের যুগধর্মী করে তোলা, নতুন চেতনায় দীক্ষিত করা। সিপাহী-বিদ্রোহে তিনি বৃটিশের পক্ষে ছিলেন। বিদ্রোহীদের হাত থেকে বহু বৃটিশের জান-মালও বাঁচিয়েছিলেন। আর, তার বিনিময়ে পেয়েছিলেন স্যর উপাধি ও নগদ পুরস্কার। ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা যেমন তিনি, তেমনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সূচনাও করে গিয়েছিলেন তিনিই। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরের বছরই স্যর সৈয়দ আহ্বান করেন 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন'। নামে শিক্ষা সম্মেলন হলেও এর

উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক—মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তাই প্রতি বছর কংগ্রেস ও মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হত প্রায়-একই সময়ে। প্রথম থেকেই স্যর সৈয়দ কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। অবিশ্যি, তাঁকেও ধর্মান্ধ মুসলমানদের কম বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়নি।

নিজের মতবাদ প্রকাশের জন্যে স্যর সৈয়দ সহজ সাবলীল প্রাণবান এক গদ্য-রীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গালিবের কিছুসংখ্যক রচনা (পত্রসাহিত্য) এবং ফোর্ট উইলিয়াম ও দিল্লী কলেজের উদ্যোগে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ ছাড়া এর আগে প্রকৃত উর্দু গদ্যসাহিত্য বলতে কিছু ছিল না। এই দিক দিয়ে স্যর সৈয়দকেই উর্দু-গদ্যের স্রষ্টা বলা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে মুসলিম সাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্যে তিনি একটি অনুবাদক সমিতির প্রতিষ্ঠা ও একটি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন। এতদিন দিল্লী এবং লাখনৌ ছিল সাংস্কৃতিক পীঠস্থান, স্যর সৈয়দ সেটা স্থানান্তরিত করলেন আলীগড়ে। ১৮৭৫ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হল আলীগড় কলেজ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনকে প্রদত্ত এক মানপত্রে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল : 'কলেজ-কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের এমন ভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা বুঝতে পারে বৃটিশরা কত সহৃদয়! যাতে তারা বৃটিশ-সম্রাটের উপযুক্ত প্রজা হয়ে ওঠে। অন্ধ ভক্তির বশে নয়, বুদ্ধি দিয়ে সদাশয় সরকার বাহাদুরের মহত্ব বুঝে তারা যেন অনুগত প্রজা হয়ে ওঠে', ইত্যাদি ইত্যাদি। আলীগড়ে স্যর সৈয়দের নেতৃত্বে নতুন এক সংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল—'আলীগড় আন্দোলন' নামে তা ইতিহাসখ্যাত।

স্যর সৈয়দের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে বহু শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিক তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। হালী, মওলানা শিবলী নোমানী, মুহম্মদ হুসেন আজাদ, মুন্সী জাকাউল্লাহ্, ডাঃ সৈয়দ আলী বিলগ্রামী, নাজির আহ্‌মদ প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদেরই প্রচেষ্টায় সাহিত্যের সর্বতোমুখী বিকাশ শুরু হয়।

পত্রসাহিত্য এই যুগের এক বিশিষ্ট অবদান। এর স্রষ্টা গালিব। পত্রসাহিত্যে গালিব যে-নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, আজও তা অনুসৃত। স্যর সৈয়দের কৃতিত্বও কিন্তু পত্রসাহিত্যে কম নয়। তবে, উর্দুতে তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি, মনে হয়, ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আসার-উস্-সানাদিদ'। হালীর

'মোকাদ্দামায়ে শের-ও-শায়েরী' (উর্দু কবিতা সম্পর্কে আলোচনা), 'ইয়াদগারে গালিব' (গালিবের স্মরণে), শিবলীর 'শের-উল-আজাম' (ফার্সী কবিতার ইতিহাস) ও 'মওয়াজনায়ে আনিস ও দাবির (কবি আনিস ও দাবিরের তুলনামূলক আলোচনা), আজাদের 'আবে হায়াত' (উর্দু কবিদের নিয়ে আলোচনা) ও 'দরবার-ই-আকবরী'—এযুগের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। এবং নাজির আহ্মদ আধুনিক উর্দু সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক।

মুসলিম জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনের উদ্দেশ্য শিবলী নতুন দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। ১৯১৪ সালে তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে স্যর সৈয়দের যুগের অবসান ঘটে। পরবর্তীযুগের বিখ্যাত গদ্যলেখক মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আলী, ডাঃ আন্সারী প্রমুখের পূর্বসূরী শিবলী নিঃসন্দেহে।

কাব্যসাহিত্য

সব দেশের সাহিত্যের মত উর্দুতেও গদ্যের আগে পদ্যের জন্ম। প্রাচীন উর্দু সাহিত্যের 'চার স্তম্ভ' : মীর্জা জান-ই-জানান (১৬৯৯-১৭৮১), মীর তাকি মীর (১৭২৪-১৮১০), মুহম্মদ রফি সওদা (১৭১৩-৮০) ও মীর দর্দ (১৭১৯-৮৫)। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ছিলেন মীর। বহু গজল, গীতিকবিতা ও রোমান্স এঁদের রয়েছে। মীরের প্রধান উপজীব্য প্রেম। সওদা ছিলেন ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং এ-পথের পথিকৃৎ। দর্দ সুফী কবি।

আধুনিক উর্দু কাব্যসাহিত্যের জনক হালী। স্যর সৈয়দের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ইনি প্রভাবিত। কিন্তু তাঁর প্রাথমিক প্রেরণার উৎস ছিলেন গালিব— মীর্জা আসাদুল্লাহ্ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯)। গালিবের মধ্যেই প্রথম নতুন চেতনার আভাষ অনুভূত হয়।

গালিবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বতন মীরের নামও স্মরণীয়। মর্সিয়া উর্দু কাব্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক। মর্সিয়াকে বলা চলে 'শোক গাথা'। মীর শ্রেষ্ঠ মর্সিয়া কবি। প্রাচীন মর্সিয়ার উপজীব্য ছিল মোহর্‌রম। কবি মীর তাঁর মর্সিয়ায় সামাজিক দুঃখ-বেদনাকেই ভাষা দেন। মীরের অনুগামীর সংখ্যা আজও অজস্র।

গালিব শুধু উনবিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি হিশেবে পরিগণিত। বিপুল কাব্যপ্রতিভা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ চিন্তাধারার অধিকারী গালিবকে কেউ কেউ মহাকবি গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। গালিব ছিলেন সৌন্দর্যবাদী কবি এবং প্রধানত গজল-রচয়িতা। কিন্তু গজলের গণ্ডিবদ্ধ পরিসরেও তাঁর যে-অত্যাশ্চর্য কবিকীর্তির স্বাক্ষর রয়েছে তা চিরন্তন সাহিত্যের সম্পদ। এই সময়কার আর-এক প্রতিভাধর কবি মীর্জা দাঘ। হায়দরাবাদের দরবারে ইনি রাজকবির সম্মান লাভ করেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে দাঘ্ ছিলেন প্রাচীনপন্থী। গজলে সবিশেষ পারঙ্গম। 'গুলজার-ই-দাঘ' এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

গালিবই প্রথম হালীকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদ হালীর কবিতার প্রধান সুর। কিন্তু এ-সুর বিষাদকরুণ। প্রথম দিকে ছোট ছোট কবিতা লিখে বিশিষ্ট কবি হিশেবে খ্যাতি অর্জন করলেও 'মাদ্দো-জাজারে ইসলাম'—ইসলামের জোয়ার-ভাটা—নামে তাঁর সুদীর্ঘ কবিতাটিই উর্দু কাব্যসাহিত্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মুসলমানদের দুর্দশা, তার কারণ, এবং ইসলামের গৌরবময় অতীত এর উপজীব্য। (সাধারণত এটা 'মোসাদ্দাস-ই-হালী' নামে পরিচিত। 'মোসাদ্দাস' মানে ষট্‌পদী কবিতা) আর, সেই সঙ্গে রয়েছে অমুসলমানদের উন্নতির প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। হালীর গভীর মানবতাবোধ সম্পর্কে এই উক্তিটি স্মরণীয় :

এ'হ হায় ইবাদৎ এহি হায় ইমান
কে কাম আবে দুন্ইয়ামে ইনসান কো ইনসান।

—মানুষ মানুষের কাজে লাগবে—এই হল সত্যিকারের ভগবৎ-প্রার্থনা, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস।

মোসাদ্দাস-এর পরে ইনি লেখেন 'শিকওয়া-ই-হিন্দ্' ও 'কাসাইদে গিয়াসিয়া'। এ-সব কাব্যগ্রন্থ মুসলমানদের দুঃখের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত।

কিন্তু, শুধু অতীতের জন্যে দীর্ঘশ্বাসই হালীর কবিতায় ফুটে ওঠেনি, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানকে স্বীকার করে নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে, বিগত গৌরব-গরিমা ফিরিয়ে আনবার জন্যেও মুসলমানদের প্রতি তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন :

"গঙ্গা যখন প্রবহমান তখন তোমার ভূমিতে পানি দাও। হে তরুণ যুবক, তারুণ্যের প্রারম্ভেই কিছু কর। পূর্বপুরুষদের শিল্পগুণে নিজেকে ভূষিত করিতে পারিলেই তোমার দ্বারা মহৎ কিছু অনুষ্ঠিত হইবে। তাহা না করিলে পূর্বপুরুষদের কীর্তি হইবে তোমাদের জন্য শুধু গল্প-কাহিনী।" (অনুবাদ : আবুব্ যোহা নূর আহ্‌মদ)

"যদি তোমরা এখন হাত-পায়ের নাড়া-চাড়া না কর তবে তোমাদের নৌকা ডুবিয়া যাইবে, যমানার সহিত পা মিলাইয়া না চলিলে তোমাদের হইবে সর্বনাশ।" (অনুবাদ—ঐ)

নারী জাতির প্রতিও হালীর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। জীবনের প্রথম দিকে মেয়েদের দেখতেন তিনি নিছক সম্ভোগের সামগ্রী হিশেবে। গতানুগতিক রীতিতে অনেক প্রেমের কবিতাও তখন লিখেছিলেন। কিন্তু ঠিক সুস্থ মনে নয়। নিজেই বলেছিলেন :

সখুন পরহামে আপনে রোনে পড়েগা
ইয়ে দফ্‌তর কেসি দিন ডুবোনে পড়েগা।

—নিজের এই কথার জন্যে একদিন আমায় কাঁদতে হবে, জলে একদিন ভাসিয়ে দিতে হবে এই বই।

পরে হালীই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'চুপকি দাদ'-এ ঘোষণা করলেন :

আয়ে মায়োঁ বহেনো বেটিয়ো দুন্‌ইয়াকি
জিনত তোমসে হ্যায়
মূলকোঁ কি বস্তি হো তোমহে
কওমোঁ কি ইজ্জত তোমসে হ্যায়।

—হে মা বোন ও মেয়েরা, তোমরা আছ বলেই পৃথিবী সুন্দর! তোমরাই দেশ, দেশের গৌরব তোমরাই।

হালী প্রধানত সাম্প্রদায়িক কবি হলেও এ-সাম্প্রদায়িকতা আক্রমণাত্মক নয়। স্বসম্প্রদায়ের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম থেকেই এর জন্ম। 'দেশপ্রেম' কবিতায় হালী বলেছেন :

মরদ্ হো তু কেসী কে কাম আও
অর্‌না খাও পিউ চলে যাও।
যব্ কুয়ী জিন্দেগী কা লুৎফ উঠাও
দিল্‌কো দুখ্ ভাইয়োঁকী ইয়াদ দেলাও।
কেৎনে ভাই তোম্‌হারে হ্যায় নাদার
জিন্দেগী সে হে জিন্‌গে দিল্ বেজার।

—যদি মানুষ হও, তবে মানুষের কাজে লাগ। নইলে খাও-দাও চলে যাও। নিজে যখন সুখ ভোগ করো, তখন মনে করো তোমার গরিব ভাইদের দুঃখের কথা। তোমার কতশত ভাই দুঃখে দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত—জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় অন্তর তাদের ভরে উঠেছে।

অন্যত্র কবি বলছেন :

তুম্ আগর চাহ্‌তে হো মুল্‌ক্‌কী খায়ের
না কিসী হাম্-ওতান্‌কে সমঝে গায়ের।
হো মুসলমান উস্‌মে ইয়া হিন্দু
বুধ্ মজ্‌হাব হো ইয়া কেহ্ হো ব্রাহ্মো।
সব কো মিঠী নেগাহ্ সে দেখো
সমঝো আখোঁকী পুৎলিয়া সবকো।

—তুমি যদি মাতৃভূমির মঙ্গল চাও, মাতৃভূমির কাউকে পর ভেব না। সে মুসলমান কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কি ব্রাহ্ম যাই হোক না কেন— সকলের দিকে মধুর দৃষ্টিতে তাকাবে, সকলকেই ভাববে তোমার নয়নের পুত্তলী।

হালীর কবিতা সম্পর্কে স্যর সৈয়দ একবার বলেছিলেন : 'ভবিষ্যতে যদি জিজ্ঞেস করা হয় জাতির গৌরব, কবিদের গৌরব, দেশের গৌরব, বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর গৌরব কে বাড়িয়েছেন, জাতিকে অগ্রগতির পথে কে চালিত করেছেন, তবে তার একমাত্র জবাব হবে—হালী।'

শুধু যুগন্ধর কবি নন, গদ্যসাহিত্যেও হালীর 'ইয়াদগারে গালিব' ছাড়া আরও দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে—'হায়াতে সাদী' (সাদীর জীবনী) ও 'হায়াতে জাবিদ' (স্যর সৈয়দের জীবনী)। উর্দু সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক হালী।

হালীই প্রথম উর্দু কবিতায় ঋজু ও সরল এক প্রকাশভঙ্গি এবং পাশ্চাত্য রীতির আমদানি করেন। শ্রীমতী নাইডু বলেছেন : 'পুরনো রীতির শৃঙ্খল ভেঙে হালী এমন সহজ ও সাবলীল ভাবে ও ভাষায় লিখেছেন যে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা পর্যন্ত তাঁর কবিতা পড়ে বুঝতে পারে।' হালী মনে করতেন মহত্তর শিল্প-সৃষ্টির জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। শিল্পের জন্য শিল্প—এই মতবাদের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। ভারতীয় মুসলমানদের নবজাগরণে যে দু'জনের ভূমিকা সর্বাগ্রে স্মরণীয় তাঁদের একজন স্যর সৈয়দ, দ্বিতীয়জন কবি হালী—

'হালী' মানেই 'যুগ-কবি'। শ্রীমতী নাইডুর মতে—আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা হালী। স্যর সৈয়দ-এর স্বীকারোক্তি: 'শেষ বিচারের দিন যদি আমায় জিজ্ঞেস করা হয়—পৃথিবীতে গিয়ে তুমি কি কি ভালো কাজ করেছ? তাহলে বলব—হালীকে দিয়ে মোসাদ্দাস লিখিয়ে নিয়েছিলাম, আর কিছু করিনি।'

হালীর মন্ত্রশিষ্য ইকবাল—স্যর মোহাম্মদ ইকবাল [১৮৭৩—১৯৩৮]। কবি, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিবিশারদ—সব্যসাচী প্রতিভাধর। কেম্ব্রিজ ও জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত, নীটশে ও বের্গসেঁার মতবাদে প্রভাবান্বিত—আর, সর্বোপরি, ইসলামের মূল নীতির প্রতি অনুরক্ত। হালীর আবেদন মূলত মুসলমানদের কাছে, কিন্তু তাঁর শিষ্য ইকবালের মধ্যেই প্রথম এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা যায়:

> আমায় বলতে দাও, হে ব্রাহ্মণ, মনে কিছু কোরো না,
> তোমার পূজার পুতুল আজ হয়ে গেছে পুরোনো।
> পুতুলের নেশায় জমালে অস্নেহের সুদ
> যেমন শিখল মোল্লারা ধর্মের নামে বিরোধ।
> ক্লান্ত আমি এড়িয়েছি মন্দির মসজিদের হাতছানি
> ত্যাগ করলাম ধর্মযাজকের বক্তৃতা আর কাহিনী।
> (ভাবানুবাদ: ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী)

'কৃষকদের প্রতি' কবিতায় ইকবাল বলেছেন:

> মূর্তি যত চূর্ণ হোক ধর্ম গোত্র জাতের মন্দিরে
> যে প্রাচীন নীতিশাস্ত্র মানুষকে বেঁধেছে জিঞ্জিরে
> ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক সে অচিরে।
> সারা দুনিয়ার লোক বাঁধা রবে মৈত্রীর বাঁধনে—
> (অনুবাদ: আবুল হোসেন)

ইকবালের আসমুদ্রহিমাচল ভারতের বন্দনাগীতি 'সারে জাহাঁসে সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা'—'তরন-ই-হিন্দ্'—একদা সারা ভারতে 'বন্দেমাতরমের' পরেই মর্যাদা লাভ করেছিল। 'হিমালয়' 'নতুন শিবালয়' 'বুদ্ধ' 'নানক' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমের পরিচয় স্পষ্ট। মাতৃভূমির দুর্দশায় তাঁর হৃদয়মন সেদিন ব্যথিত হয়ে উঠেছিল:

হায় হিন্দুস্তান, তোমাকে দেখে কেবল উদ্গত হয় আমার অশ্রু।
সব কাহিনীর মধ্যে তোমার কাহিনী স্মরণ করায় অপরাধ॥

আকাশের আস্তিনে লুকনো রয়েছে বজ্র।
এই বাগানের বুলবুলিরা তাদের কুলায় নিশ্চিন্ত না থাকুক॥

(অনু: কাজি আবদুল ওদুদ)

উর্দু কবিদের মধ্যে রুশবিপ্লবের তাৎপর্য ইকবালই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন—'খিজর-ই-রাহ্'-তে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সোভিয়েট বিপ্লবের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন—'পৃথিবীর জঠর থেকে এক নতুন সূর্যের অভ্যুদয়'। হালীর মত ইকবালও শিল্পের সামাজিক ভূমিকায় ছিলেন আস্থাবান। তিনি বলতেন, কাব্য জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়। ভালো কবিতা সমাজকল্যাণকরও বটে। মহৎ শিল্প মানুষের মনে বেঁচে থাকবার, সমস্ত প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করবার প্রেরণা ও শক্তি সৃষ্টি করবে। শিল্পীকে মানবপ্রেমিক হতেই হবে। কারণ, একমাত্র প্রেমই সৌন্দর্য ও শক্তির সমন্বয়সাধক:

দিল্‌বরি বে কাহিরি জাদুগারী আস্ত্,
দিল্‌বরি বা কাহিরি পয়গাম্বরী আস্ত্।

—শক্তিহীন সৌন্দর্য ভেল্কিবাজী মাত্র, শক্তিমান্ সৌন্দর্যই ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

অবিশ্যি, ইকবালের এই মতবাদে স্ব-বিরোধিতা অস্পষ্ট নয়। তাঁর মতে, শিল্পীর প্রেরণা ঈশ্বর-প্রদত্ত, শিল্পীর এখানে হাত নেই কোন। এ-প্রেরণা যেন স্বয়ম্ভু। প্রেরণাকে যুগোচিত ভাবে প্রকাশের দায়িত্বই শুধু শিল্পীর। তিনি বলতেন, কোন জাতির জনগণের নৈতিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে সেই জাতির কবি-শিল্পীদের ঈশ্বর-প্রদত্ত মহান অবদানগুলি গ্রহণের যোগ্যতার ওপর।

ইকবাল ছিলেন ইসলামীয় সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। কিন্তু ধর্মমূলক সাম্যবাদ তাঁকে বেশিদূর অগ্রসর হতে দেয়নি, পরবর্তী যুগে এই অখণ্ড ভারতের কবিই নিখিল ইসলামবাদ ও পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

ইউরোপে গিয়ে ইকবাল মুসলিম দেশগুলির দুঃখদুর্দশা ও অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ দেখে বিচলিত হন। বিশ্বের মুসলমানদের একতার বাঁধনে বাঁধবার জন্যে

গঠন করেন 'প্যান ইসলাম সোসাইটি'। এ-ব্যাপারে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন ভারতে মুসলিম নবজাগৃতির অন্যতম নায়ক সৈয়দ জামালুদ্দীন আল্-আফগানীর কাছে, আর তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন স্যর আবদুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ইকবালের মতে, মুসলমানদের অবনতির হেতু সুফীমতের মধ্যে আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্যবাদ। এর হাত থেকে উদ্ধার না পেলে ধ্বংস তাদের অনিবার্য। উদ্ধারের উপায় হিশেবে তিনি এক দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুললেন—'খুদীবাদ' বা আমিত্ব-তত্ত্ব :

> খুদিকো কর্ বুলান্দ ইতনা কে
> হর তকদীর সে পেহলে খোদা বন্দেসে
> খোদ পুছে বাতা তেরি রিজা ক্যা হায় ?

—নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন করে তোল যে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সময় খোদা যেন নিজেই এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করেন—'হে বান্দা, বল তুমি কিসে সন্তুষ্ট হবে ? কী আমি তোমার জন্যে করতে পারি ?'

এই দিক দিয়ে তাঁর গুরু নীটশে। তবে—নীটশের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও কতকটা রয়েছে। নীটশে নাস্তিক, জনগণের শক্তিতে অবিশ্বাসী, নারীর মর্যাদা স্বীকারে অনিচ্ছুক। ইকবাল আস্তিক, গণতন্ত্রের প্রতি তেমন আস্থাবান না হলেও তিনি মনে করেন যে জনগণের মধ্যেও কিছুটা মহত্ত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। নরনারীর সমানাধিকার অবশ্য তিনি স্বীকার করেন না, তবু নারীকে একেবারে হেয় জ্ঞানেও নারাজ। নারীকে তিনি চান গৃহিণী ও জননী হিশেবে। নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য শ্রদ্ধেয় তাঁর কাছে। ফার্সী কাব্যগ্রন্থ 'আসরারে খুদী'তে ইকবালের দার্শনিক মতবাদ বিধৃত। *Secrets of the self* নামে এর ইংরেজী তর্জমা হয়েছে।

ইকবাল ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, তাই বলে সুফীদের মত ঈশ্বরসমীপে আত্মবিসর্জনে নয়। তার মতে মানুষকে ঈশ্বরের গুণাবলী আত্মস্থ করে নিয়েই "ইনসান-ই-কামেল'—পূর্ণ মানুষ—হয়ে উঠতে হবে :

> আমিত্বের স্বরূপ হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা।
> প্রতি কণায় ঘুমিয়ে আছে আমিত্বের বীর্য।
>
> জ্ঞান হচ্ছে জীবন রক্ষার একটি উপায়,
> জ্ঞানের কাজ আমিত্বকে শক্তিমান করা।

এক মুঠো ধুলি দিয়ে করো সোনা তৈরী
পূর্ণ মানুষের দ্বারের ধুলি করো চুম্বন।
যার নিজের উপর কর্তৃত্ব নেই
তার উপর কর্তৃত্ব করবে অন্যজন।
সংসারে সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি হওয়া আনন্দের
প্রকৃতির উপরে স্বামীত্ব লাভ করা আনন্দের।

(অনু : কাজি আবদুল ওদুদ)

অসাম্প্রদায়িক স্বদেশপ্রেমিক ইকবালের পরিণতি হল নিখিল ইসলামবাদ ও আমিত্বতত্ত্বের প্রবক্তা ইকবালের মধ্যে—Poet of Islam, কায়েদে আজমের friend, philosopher and guide। মুসলমানদের দুর্দশায় হৃদয় তাঁর ব্যথিত হয়ে উঠল, শুধু মুসলমানদেরই দুর্দশায়! তিনি প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু, মুসলমানদের অন্তরে এক জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা দাও'—কিন্তু ভুলে গেলেন যে, ভারতে কেবল মুসলমানরা নেই, অমুসলমানও রয়েছে। তাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সবার উপরে মানুষ সত্য, কিন্তু ইকবালের কাছে, সবার উপরে মুসলমান। অধিকন্তু, তাঁর প্রথম জীবনের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিও শেষ দিকে রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়। রুশবিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 'খিজর-ই-রাহ্' লিখেছিলেন, পরবর্তী যুগে ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের পর লিখলেন 'ইবলিস কি মাজ্‌লেমে সুরা' নাটিকা। ঘোষণা করলেন—একমাত্র ইসলামী নীতির প্রয়োগেই যাবতীয় পার্থিব সমস্যার সুরাহা সম্ভব। অর্থাৎ, Back to Quran. সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ দুই-ই এক হয়ে গেল তাঁর কাছে :

হার দো রা জান না সবুর ও না শেকায়েব
হার দো ইয়াজদান নাশিনাস আদম-ফেরায়েব

—এদের উভয়েরই [সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ] চিত্ত অস্থির। খোদাকে এরা কেউই চেনে না। দুজনেই মানবপ্রতারক।

পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার ঔরসে আধুনিক ভারতের জন্ম—ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই ঐতিহাসিক সত্য অনস্বীকার্য। জীবন-সায়াহ্নে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাংসাশী রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সভ্যতার সঙ্কট'—অভিমান আর তিক্ত ক্ষোভ সে রচনার ছত্রে ছত্রে। তবু তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি—মানুষের

ওপর বিশ্বাস হারানো যে পাপ! আর, শেষ বয়সে ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষে ঘোষণা করলেন, 'মুষ্‌কে ইন্‌সওদাগরষ নাফে সগসত'—এই সওদাগরের মৃগনাভিও কুকুরের নাভি ছাড়া কিছু নয়। তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল শুধু মাত্র মুসলমানদের দিকে। বিজ্ঞানবিরোধী বাস্তববিমুখ দর্শন-তত্ত্বের অন্ধকূপে অধঃপতন ঘটল তাঁর।

তাই বলে নিছক সাম্প্রদায়িকতাবাদী কবি ইকবালকে কোনমতেই বলা চলে না। প্রতিক্রিয়াশীলরা যদিচ ইকবালকে অনায়াসেই নিজের মুখপাত্র হিশেবে ব্যবহার করতে পারেন (বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকে যেমন করা হয়ে থাকে), কিন্তু ভারতের সমসাময়িক সমাজ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, সামগ্রিক বিচারে, ইকবাল শুধু একজন প্রগতিশীল কবি নন, উর্দু কাব্যসাহিত্যে প্রগতি আন্দোলনের অগ্রদূত—বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি।

'শেকওয়া', 'বান্দ-ই-দারা', 'বাল-ই-জিব্রিল' ইত্যাদি উর্দু এবং 'পয়াম-ই-মশরিক' [গ্যেটের প্রাচ্য-প্রতীচ্য দীওয়ান-এর অনুসরণে লিখিত], 'জাবিদ নামা' [দান্তের ডিভাইন কমেডীর অনুকরণে রচিত], 'পসচায় বায়াদ করদ' ইত্যাদি ফার্সী কাব্যগ্রন্থ এবং *The Development of Metaphysics in Persia* ও *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* ইকবালের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ইকবালের সমসাময়িক আর-এক প্রতিভাধর কবি পণ্ডিত ব্রজনারায়ণ চকবস্ত। এঁর অকালবিয়োগে উর্দু সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। চকবস্তের দেশপ্রেমমূলক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-কেন্দ্রিক কবিতাবলী তদানীন্তনকালে যথেষ্ট আলোড়ন এনেছিল। ইনিও অনেক মর্সিয়া লিখেছিলেন। তবে মোহর্‌রমের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়, গোখেল, তিলক প্রমুখ নেতাদের মৃত্যু উপলক্ষে। সারল্যে, গভীরতায় ও আন্তরিকতায় এঁর কবিতা ভাস্বর। রাজনীতিতে ইনি এ্যানি বেশান্তর মতাবলম্বী ছিলেন :

> ব্রিরতানিয়াঁ কা সায়া, সিরপর কুবুল হোগা,
> হাম হোঁগে ঐশ হোগা আওর হোমরুল হোগা।

দেশের যুবসম্প্রদায়কে ডাক দিয়ে বলেছিলেন :

> তুম্‌হেঁ জো করনা হায় কর্‌লো আভী ওয়াতন্‌কে লিয়ে
> লোহু মে ফির্‌ ইয়ে রবানী রহে, রহে, ন রহে।

কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। ১৯২৬ সালে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় এঁর মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হলেও জীবিতাবস্থায় চকবস্তের কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এঁর 'সুবহে ওয়াতন' কাব্যসংকলন বেরোয় মৃত্যুর পরে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন তেজবাহাদুর সপ্রু। শুধু কবি নন, সমালোচক ও গদ্যলেখক হিশেবেও চকবস্ত স্মরণীয়।

আকবর এলাহাবাদীর নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন রক্ষণশীল, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার ঘোরতর বিরোধী। গোঁড়া জাতীয়তাবাদী। ব্যঙ্গাত্মক কবিতাবলীর মধ্যে দিয়ে ইনিই সে-যুগে প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এবং এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে সবিশেষ জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠেন। তাৎক্ষণিক—এক্‌স্‌টেম্‌পোর—কবিতা রচনায় অত্যাশ্চর্য দক্ষতা দেখান জাফর আলী খাঁ। শব্দ ও ছন্দের ওপর এঁর দখল অসাধারণ। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তেজনা সঞ্চারের অভিযোগে বৃটিশ সরকার একদা এঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করেন।

প্রগতি-আন্দোলন

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইকবালের পাশাপাশি আর-একটি ধারার অবির্ভাব ঘটে। এই গোষ্ঠীর লেখকরা ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আওতার বাইরে। এবং যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত। যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের উৎকেন্দ্রিকতা ও মনোবিকার, যৌনতার বাড়াবাড়ি এবং আঙ্গিকসর্বস্বতা—সবই এঁদের লেখায় ফুটে ওঠে। প্রচলিত ঐতিহ্যের এঁরা বিরোধী ছিলেন, কিন্তু নতুন ঐতিহ্যের স্রষ্টা নন। তবে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য, এঁদের মধ্যে বাঁধনভাঙা প্রাণচাঞ্চল্যের যে-আভাষ পাওয়া গিয়েছিল, পরবর্তী যুগে তারই প্রেরণায় উর্দু সাহিত্যে প্রগতি-আন্দেলনের জন্ম।

১৯৩৬ সাল উর্দু সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনাকাল। এই বছর লাখনৌয়ে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। অসাম্প্রদায়িক এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একদল জীবনবাদী কবি-সাহিত্যিক মিলিতভাবে নতুন এক সাহিত্য-আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন

মুন্সী প্রেমচাঁদ ও জোশ মলিহাবাদী। উর্দু কথাশিল্পী হিশেবে প্রেমচাঁদ তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মোহাম্মদ হাসান আসকারী, মীরাজী, আহ্‌মদ আলী, সজ্জাদ জহীর, ফৈয়জ আহ্‌মদ ফৈয়জ, কৃষণ চন্দর, সর্দার আলী জাফরী, খাজা আহ্‌মদ আব্বাস, ফিরাক গোরখ্‌পুরী, সগর নিজামী, কাজি আবদুল গফ্‌ফর, উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক্‌, হাফিজ জলেন্ধরী প্রমুখ শক্তিশালী কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিকরা এই আন্দোলনে শামিল হলেন। পরবর্তী যুগে অবশ্য নানা কারণে এই গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে, তবু এই গোষ্ঠীর লেখকরাই উর্দু সাহিত্যে অতি-আধুনিক যুগের স্রষ্টা। বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক সমাজ-চৈতন্য এবং শিল্পক্ষেত্রে আঙ্গিক ও ভাবগত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই আন্দোলনের অবদান। উর্দু কবিতার প্রচলিত ছন্দ-কাঠামো ভেঙে এ-যুগের কবিরা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'আজাদ নজ্‌ম্'-এর—গদ্যকবিতার—প্রবর্তন করেন।

জীবিত উর্দু কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় শব্‌বীর হুসেন জোশ মলিহাবাদী। প্রথম থেকেই ইনি 'বাগী' কবি—বিদ্রোহী কবি—হিশেবে পরিচিত। ইকবাল ও নজরুলের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে ইনি গ্রহণ করেন। জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ও তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এঁর কবিতার প্রধান সুর। 'কিস জুবা সে কেহ্‌ রহে হো আজ তুম সওদাগরোঁ' শীর্ষক কবিতাটির জন্য জোশকে একবার কারাদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে হয়।

জোশের 'ভুখা হিন্দুস্তান' একটি বিখ্যাত কবিতা। একবার কবি কোন রেল-স্টেশনে দেখলেন একটি ফার্স্টক্লাস কামরার পাশেই রয়েছে ভাঙ্গাচোরা একটি থার্ডক্লাস কামরা। দুই কামরার যাত্রীদের মধ্যেও প্রভেদ বিস্তর। এই বৈষম্য দেখে তিনি লিখেছিলেন :

> ইস্‌তরফভী আদমী থে, উস্‌তরফভী আদমী,
> উন্‌কে জুতো পর চমক্ থী, উন্‌কে চেহরোঁ পর ন থী।

এই শ্রেণীচেতনা থেকেই জোশ ঘোষণা করেছিলেন :

> নাম হ্যায় মেরা জবানী, নাম হ্যায় মেরা শবাব
> মেরা নাড়া ইনক্লাবো, ইন্‌ক্লাবো, ইন্‌ক্লাব।

এখানেই শেষ নয় :

> হাড্ডিয়াঁ ইস্ কুফ্রো ইমাঁ কী চবা জাঁউগা মৈ।

বিপ্লবী কবিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের কবি হিশেবেও জোশের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজনীতির মত প্রেমের ক্ষেত্রেও বরাবরই ইনি উগ্রপন্থী।

এবং ইদানীং হয়ে উঠেছেন নারী, সুরা ও গোলাপের উপাসক—সম্ভোগবাদী কবি। এঁর বিপ্লববাদ আজ রোমান্টিক কুয়াশাচ্ছন্ন।

ভাষা ও ছন্দের ওপর জোশের দখল অসাধারণ। কিন্তু যত আবেগপ্রবণ, ভাবগম্ভীর তত নন। বরং ব্যঙ্গাত্মক ও গীতিকবিতায় অধিকতর কুশলী, সিনেমা-সঙ্গীতেও সবিশেষ খ্যাতিমান।

এঁরই সমগোত্রীয় কবি রঘুপতি সাহাই ফিরাক। আধুনিক ভাবধারা প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে ইনি প্রচলিত রুবাঈ-এর কাঠামোকে অবলম্বন করেছেন। প্রগতিশীল সমালোচক হিশেবেও ইনি যশস্বী।

আলী সর্দার জাফরী, পারভেজ শাহিদী, কাইফি আজমী, মকদুম মহীউদ্দীন প্রমুখ কবিরা মার্কসবাদী রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। সর্দার জাফরীর কাব্যনাটক 'নঈ দুনিয়াকো সালাম' কাব্যরীতির জন্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পসৌন্দর্য ও শিল্পমূল্যকে পুরোপুরি বজায় রেখে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির সারল্যী-করণে কবি আশ্চর্য দক্ষতার এখানে পরিচয় দিয়েছেন। উর্দু সাহিত্যে প্রথম গদ্যকবিতা রচয়িতাদের অন্যতম সর্দার জাফরী। আঙ্গিকের দিকে ইনি খরদৃষ্টি, অভিনব চিত্রকল্প রচনায় পারদর্শী। কাইফি আজমী ও মকদুম মহীউদ্দীন জনগণের কবি। তেলেঙ্গানার কৃষক-বিপ্লবে মহীউদ্দীনের কবিতা ও গান ছিল অমেয় প্রেরণা। হায়দরাবাদ অঞ্চলে এঁর জনপ্রিয়তা অপরিসীম। তবে, কুশলী কারুশিল্পী এঁকে বলা যায় না। জনসভায়, মুশায়রায় এঁর কবিতা যে-পরিমাণ উত্তেজনার সঞ্চার করে, বিদগ্ধ মনে ততখানি সাড়া জাগাতে পারে না।

পারভেজ শাহিদী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শক্তিমান কবি। ভাষা ও ছন্দের ওপর এঁরও দখল যথেষ্ট। কবির নিজস্ব মতবাদ কবিতায় সোচ্চার, সত্যি, কিন্তু কাব্যকে হত্যা করে ইনি মতবাদকে বড় করে তোলেন না:

(১)

নীরবতার বুক থেকে বাণী হয়ে আমি নেমে আসব
সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হব আমি প্রত্যেকটি নিশ্বাস থেকে
বোকার দল! যাও, দুনিয়া ভরে দাও তোমরা চোখের জলে
হাসিতে পরিণত হব আমি, ঝাঁপিয়ে পড়ব তোমাদের ঘৃণা করে।

(২)

আমাদের শরীরে ঘামের গন্ধ, লোহার আঘ্রাণ
ইস্পাতকঠিন শাখায় শাখায় দুলছি যেন জলন্ত আবেশে
অগ্রগতির দৃপ্ত সংকল্পকে কখনও বাঁধা যায় না
যে ফুল ফুটবেই
কারাপ্রাচীরের মধ্যেও সে বসন্ত-উৎসবে জেগে উঠবে।

(অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

রুবাঈ দুটি কারাবাসকালে রচিত। পারভেজ কলকাতার বাশিন্দা। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার ওপর রচিত 'কলকাতার দাঙ্গার এক দিন' এঁর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা :

আজকেও দেবমন্দির আর মসজিদের চকমকিতে ঠোকাঠুকি
শহরকে তাতিয়ে তুলল, আগুন হয়ে উঠল শহর।
বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দীপাধারে উপছে পড়ছে তেল—
তেল, না রক্ত ?—রক্ত। রাস্তায় গড়িয়ে আসছে রক্ত।......
কওসার আর গঙ্গার দুর্দান্ত বন্যায়
ভেসে চলল খোলামকুচি, ঘাস পাতা রাস্তার মানুষ।
সোনাদানায় বোঝাই জাহাজ ওদিকে বাণিজ্য বায়ুতে বেশ পালতোলা।
আজও দিব্যি নিরাপদ টেমসের ঢেউয়ে শ্বেতদ্বীপ, দুর্গ, দুর্গের নিশানা।
সোনাচাঁদির পাড়ায় তাই মানুষ চলে বুক ফুলিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে
কুঁজোপিঠ মানুষই খালি মৃত্যুর নরক বেয়ে নামে।...

(অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

নতুন চীনকে উদ্দেশ করে লিখিত পারভেজের দীর্ঘ কবিতাটি শুধু এঁর নয়, আধুনিক উর্দু কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা নিঃসন্দেহে :

ইয়াংসি নদীতরঙ্গ হল ভল্লার হাতে বীণা
উচ্ছল সেই জলকলতান মিশে গেল মহাকালের মুখর গানে
ইয়াংসির সে-জলকল্লোলে ধূলিধূসরিত স্বপ্ন ছড়াল পাখা।
ইয়াংসির সে-আরক্ত ঢেউয়ে নির্ভীক নিঃসংকোচ সুর বাজে
জীবননৃত্য ইয়াংসির সে-ঘূর্ণিতে দেখে ছায়া
যার যা প্রশ্ন, নদীতরঙ্গে তার যথাযথ উত্তর পাওয়া গেল।
আজ ইয়াংসি নদীতে এযুগ দৃষ্টি বদল করে
ট্রুম্যানের দেওয়া ট্রুম্যানের ডিঙ্গি ডুবে গেছে এরি জলে।...

নববধূ শান্তির হাতের লাল কাঁকনের রিনি রিনি শব্দ শোনো।
বাহুবন্ধে তার মুখরিত লাবণ্যগাথা।
কামনার উদ্যান ভুরভুর করছে তার মিষ্টি গন্ধে
সঁাথিতে পুজোয় বসেছে ছায়াপথ।...

এই জরাজীর্ণ সমাজকে জাহান্নামে পাঠাবে যৌবন
পচে যাওয়া প্রাচীনত্বের ঠাঁই হবেনা এশিয়ায়
বিতাড়িত অন্ধকার সাহস পাবেনা ফিরে আসতে
নতুন সকালের মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত হবে নতুন বাগান
নতুন বসন্তের সুরে সুর মেলাবে বাতাস
গেয়ে যাবে, তারা গেয়ে যাবে আর সমস্ত চরাচর ঝংকৃত হবে সেই গানে।...

নতুন যুগকে আমি দীপান্বিতা করব আমার লেখায়
কাব্য আর গানের জগৎ আনন্দে ভরে তুলব আমি...
আমি গঙ্গার তরঙ্গবীণার তালে তাল দিয়ে রক্তিম সূর্যোদয়ের গান গাইব।...

বছর পনের আগে এক তরুণ কবি—রাজা মেহদে আলী খাঁ—মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে পাঠক ও সমালোচকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। এঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'গুণ্ডা':

আরে আরে ইয়ার
চেহারাটাকে বাগিয়ে ধরে
দেখনা চেয়ে একবার।
আসছে কে ঐ রাস্তা ধরে?
সেই নারী, ল্যাংড়া শেঠের সেই সুন্দরী।...
আরে ইয়ার, ফেলে দে আজ তাস।
একবার চেয়ে দেখ
তার কালো আঁখির চঞ্চলতা
তার শাড়ির বাহার।

(অনুবাদ: মুনীর চৌধুরী)

কবিতাটি সম্পর্কে রুচির প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু ইনিই আবার যখন লেখেন 'নাগ্নীর মেয়ের প্রার্থনা':

ও আল্লাহ্, আজ এ-নিস্তব্ধ অরণ্যে
যখন কেউ কোনদিকে নেই,
এখন তুমি আমায় দর্শন দাও,
দর্শন দাও!

যদি না দাও
তবে জেন
ছোট্ট একটি মেয়ে
তোমার ওপর রাগ করবে…।

(অনু: ঐ)

কিম্বা, ভণ্ড মওলানা-মওলবীদের প্রতি এঁর তীব্র বিদ্রূপ যখন চোখে পড়ে:

খট্ খট্ খট্ !
মওলানা,
একটিবার খুলে দাওনা
জান্নাতের এ-দ্বার ।
রাত হয়েছে অনেক
কেউ এখন দেখছে না
মওলানা
একটিবার খুলে দাওনা
জান্নাতের এ-দ্বার।…
খট্ খট্ খট্ !
এত রাত
চুপে চুপে মওলানা,
এসেছি টিপে দিতে
তোমার পা,
মওলানা,
একটিবার খুলে দাওনা
জান্নাতের এ-দ্বার।

(অনু: ঐ)

অন্যত্র আবার:

আমি আর শয়তান
সেদিন সন্ধ্যেবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে
বেহশ্‌তের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে
চেয়েছিলাম এক দৃষ্টিতে
বেহেশ্‌তের পানে
দেখি
শুভ্র দুধের একটা শীর্ণাঝর্ণা বইছে
মৃদু বাতাসের সাথে তাল রেখে।

তার পাশে মস্তবড় একটা
হজমী-গাছের নিচে
বিশাল একটা হালুয়ার ঢিপির ওপর বসে
এক মওলানা
(দাড়ি ওর বাতাসে দুলছে)
ঝিমুচ্ছেন।

(অনু : ঐ)

তখন কবির শক্তিকে—উন্মার্গগামী হলেও—স্বীকার করে নিতেই হয়। আপসোস, এঁর লেখা ইদানীং আর চোখে পড়ে না।

সাম্প্রতিককালের অন্যান্য শক্তিশালী কবি হিশেবে সিকান্দর আলী ওয়াজ্‌দ্‌, মাজাজ, জগন্নাথ আজাদ প্রমুখেরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কথাসাহিত্য

উপন্যাস বয়েসে অর্বাচীন। তবে, কারো কারো মতে, উর্দুর ক্ষেত্রে ওটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি নয়। তারা বলেন, উর্দু সাহিত্যে উপন্যাসের অস্তিত্ব আগেও ছিল—অন্য নামে। আধুনিক উর্দু উপন্যাস পাশ্চাত্য রূপ-রীতির অনুসারী হলেও, এর জন্ম পুরনো 'দাস্তান' থেকে।

'দাস্তান' মানে দীর্ঘ কাহিনী। আঠারো-উনিশ শতকে ইরান থেকে ফার্সী ভাষার মাধ্যমে এই 'দাস্তান' ভারতে আমদানি হয় এবং এদেশের আমীর-ওমরাহ্‌দের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। সদাশয় পৃষ্ঠপোষকদের আনন্দবিধানই ছিল 'দাস্তাঙ্গো' অর্থাৎ দাস্তান-রচয়িতাদের চরম-পরম লক্ষ্য। দাস্তানের কিস্‌সায় ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতা বা চরিত্রের জীবন্ততার দিকে দাস্তাঙ্গোরা ততটা নজর দিতেন না, যতটা সচেতন থাকতেন একই কাহিনীতে সর্ব-রসের সমন্বয় সাধনের প্রয়াসে। রাজা-উজীরের দরবারে এঁদের মর্যাদা ছিল অনেকটা সভাকবিদের মত। কালধর্মে এই দাস্তানই উপন্যাসের রূপ পরিগ্রহ করে। আধুনিক কালেও কোন কোন উর্দু ঔপন্যাসিকের মধ্যে দাস্তানের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—ফৈয়াজ আলী ও মুহম্মদ আসলামের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যে-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও যুগদৃষ্টি আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, বলা বাহুল্য, দাস্তানে তা অনুপস্থিত।

উর্দু কথাসাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিশেবে 'দাস্তানে হামীর হাম্জা' ও 'তিলিস্মে হোশ রোবা'র নাম করা হয়ে থাকে। আরব্য উপন্যাসের অনুকরণে রচিত এই বইগুলি আর-যাই-হক উপন্যাস-সাহিত্য নয়। তবে রজব আলী বেগ সরুরের 'ফাসানায়ে আজায়েব', মীর আম্মানের 'বাগ্-ও-বাহার' এবং 'কিস্সায়ে চাহার দরবেশ' ইত্যাদি গ্রন্থকে কিছুটা ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।

উর্দু সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক নাজির আহ্মদ (১৮৩১-১৯১২)। স্যর সৈয়দের সমসাময়িক ইনি, তাঁরই মতবাদে দীক্ষিত। 'ইবন-উল্-ওয়াক্ৎ', 'মীরাট-উল্-উরুস' ও 'বিনত-উম্-নাস'-এ ইনি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাবলীই শুধু উপস্থাপিত করেননি, সেই সঙ্গে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিয়েছেন। ইনিই প্রথম পাশ্চাত্য আঙ্গিকে উপন্যাস লেখার সূত্রপাত করেন। 'মীরাট-উল্-উরুস'-এ আছে একটি অশিক্ষিত কুমারী শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের বধূ হয়ে এসে নতুন পরিবেশে কিভাবে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলল তার মনোরম পারিবারিক চিত্র। 'বিনত-উম-নাস'-এ লেখক নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কাহিনীর মাধ্যমে পেশ করেছেন। এই সময় ঢাকার নবাব সৈয়দ মুহম্মদ আজাদও একটি উপন্যাস লেখেন—'নবাবী দরবার'। এর সাহিত্য-মূল্য তেমন না থাকলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তারিফযোগ্য। জনৈক গলিতনখদন্ত সামন্ত প্রভুর চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে লেখক এখানে তীব্র কশাঘাত করেছেন।

নাজির আহ্মদের পরবর্তী যুগের শক্তিশালী গদ্যলেখক আবদুল হালিম সরুর ও রতননাথ সারসার। সরুরকে বলা হয়ে থাকে উর্দু সাহিত্যের ওয়াল্টার স্কট। সারসারের 'ফিসানা-ই-আজাদ' উর্দু কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৮৮০ সালে বইটি প্রকাশিত, কিন্তু আজো এর সমাদর কমেনি। সমসাময়িক লাখনৌর সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সমাজ-জীবনের একটি সর্বাঙ্গীণ বাস্তব চিত্র লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। আফিং-খোর, বিদঘুটে পোশাক পরা নবাব ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ, ভিক্ষুক, ফিটনবিহারী নর্তকী, পুলিশ, রেলওয়ে বাবু, ফেজধারী 'আধুনিক' মুসলমান, ধুতিপরা বাঙালি, রাজপুত, গণিকা ইত্যাদি নানা ধরনের নরনারী এবং আয়েসবাগের মেলা, মোহর্‌রম ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গত শতকের শেষার্ধের লাখনৌর এক জীয়ন্ত প্রতিচ্ছবি 'ফিসানা-ই-আজাদ'-এ পাওয়া যায়। সারসারই প্রথম

সাহিত্যে সাধারণ মানুষের মর্যাদা স্বীকার করে নেন। এই দিক দিয়ে ইনি প্রেমচাঁদের পূর্বসূরী।

সারসারের পরে এবং প্রেমচাঁদের আগে আরও-একজন শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিকের অবির্ভাব ঘটে—মীর্জা রশ্‌উয়া। এক গণিকার জীবন নিয়ে লিখিত এঁর নাটক 'উমরাও জান আদা' বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যুগান্তকারী সৃষ্টি।

প্রেমচাঁদের আবির্ভাব

উর্দু সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টা মুন্সী প্রেমচাঁদ। এঁর প্রকৃত নাম ধনপৎ রায়। প্রথম দিকে ইনি উর্দুতে লিখতে শুরু করেন, শেষে হিন্দীতে। তবে, এঁর উর্দু ও হিন্দীর মধ্যে প্রভেদ আসমান-জমিন নয়। উর্দুতে লেখা উপন্যাসের কিছুটা সংস্কার করে ইনি তাকে ভাষান্তরিত করতেন। যেমন এঁর উর্দু উপন্যাস 'ময়দানে আমল' হিন্দীতে হয়েছে 'রঙ্গভূমি'। উর্দু ও হিন্দী উভয় ক্ষেত্রেই কথাশিল্পী হিশেবে প্রেমচাঁদের আসন সর্বাগ্রে।

নিজের সম্পর্কে প্রেমচাঁদ বলেছেন:

'আমার জন্ম ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। বাবা ছিলেন ডাকঘরের কেরানি, মা চিররুগ্না, আর এক বড় বোনও ছিলেন। বাবা তখন কুড়ি টাকা মাইনে পেতেন, চল্লিশ টাকায় তাঁর জীবনাবসান হয়। ....(অতঃপর বাল্য ও কৈশোরের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কাহিনী।) শীতকাল। একটি পয়সাও আমার সম্বল নেই। এক-এক পয়সার চালভাজা খেয়ে দুদিন কাটালাম। মহাজনের কাছে ধার চেয়ে পাইনি, কিম্বা আমিই হয়ত চাইতে পারিনি। সন্ধ্যে হয়েছে, এক বইয়ের দোকানে গিয়ে উঠলাম। চক্রবর্তীর গণিতের সমাধান-পুস্তক, বছর দুই আগে কিনেছিলাম, এতদিন খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম—নিরুপায় হয়ে আজ এটা বিক্রী করব ঠিক করলাম। দু টাকার বই, বেচলাম এক টাকায়।......আমি গল্প লিখতে আরম্ভ করি ১৯০৭ সাল থেকে। এর আগে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প ইংরেজিতে পড়েছিলাম ও তার উর্দু অনুবাদ করে পত্রিকায় বার করেছিলাম। উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করি ১৯০১ সাল থেকে। আমার একটি উপন্যাস ১৯০২ ও একটি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালে 'জমানা' পত্রিকায় ছাপা হয় আমার প্রথম গল্প—'সংসারে সবচেয়ে অমূল্য রতন'। পাঁচটি গল্পের সংকলন 'সোজে ওয়াতন' (দেশপ্রেম) প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে। কংগ্রেসের মধ্যে গরমপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটেছে।......তখন আমি 'নবাব রায়' নামে লিখতাম। কাজ করতাম শিক্ষা-বিভাগে সাব-ডেপুটী ইন্সপেক্টর হিশেবে।

রাজদ্রোহের অভিযোগে 'সোজে ওয়াতন' নিয়ে প্রেমচাঁদকে অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছিল।

প্রেমচাঁদের প্রথম উপন্যাস 'সেবাসদন'। 'সেবাসদন'-এ (উর্দু নাম হল 'হুসনুরমা বা হুসনয়াব') গণিকাবৃত্তির সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দু সমাজের পণপ্রথা ও বৈধব্য-জীবনের অসহায় পরিণতিই যে এর অন্যতম কারণ, লেখক তা স্পষ্ট করে বলেছেন—'যে-সমাজে অত্যাচারী জমিদার, দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র এবং অসৎ মহাজনরা সম্মান পায়—সে-সমাজে গণিকাবৃত্তি কেন বেড়ে চলবে না ? এই সব পাপের অস্তিত্ব যেদিন লোপ পাবে, গণিকাবৃত্তিও উঠে যাবে সেদিন।' অবশ্য প্রেমচাঁদের সমাজ-দৃষ্টি এতে খুব স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠেনি। আদর্শ সেবাসদনই যেন পতিতাদের পরম ভরসাস্থল। 'প্রেমাশ্রম' কিসানদের উপর জমিদারের নিষ্ঠুর নির্যাতনের পটভূমিকায় লিখিত। সশস্ত্র অত্যাচারের প্রতিবাদে 'সত্যাগ্রহ' যে নিরর্থক বারবার লেখক সেথা বলেও যেভাবে তিনি সমস্যার সমাধান করেছেন সেটা ঠিক বাস্তবধর্মী নয়। তবে ১৯১৯-২০ সালের ভারতীয় কিসান সমাজের যে নগ্ন চিত্র এতে তিনি তুলে ধরেছেন, অন্যত্র তা দুর্লভ। 'রঙ্গভূমিকে' বলা হয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় কাব্য—১৯২০-২১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পটভূমিকায় বইটি রচিত। 'প্রেমাশ্রম'-এ যে-রোমান্টিক আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, 'রঙ্গভূমি' তা থেকে মুক্ত। লেখকের দৃষ্টি এতে অনেক-বেশি স্বচ্ছ। লেখক বলেছেন : ব্যবসা হত্যা ছাড়া কিছু নয়। মানুষকে পশুর মত ব্যবহার করাই হচ্ছে আধুনিক ব্যবসার মূল নীতি। ব্যক্তিগতভাবে দু'একজন ধনী ভালো হতে পারে, কিন্তু শ্রেণী হিশেবে তারা শোষক। বিদেশি শাসকদের কূটনীতি ও ভারতীয় নৃপতিদের স্বেচ্ছাচারিতার পাশে কংগ্রেস-সত্যাগ্রহীদের লেখক মহিমময় করে তুলে ধরেছেন। ১৯৩০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় 'কর্মভূমি' রচিত। লেখক এখানে আরও-বেশি বস্তুনিষ্ঠ। 'কায়কল্প'-এ প্রেমচাঁদ আচমকা মোড় নিলেন। বর্তমান বাস্তবকে পরিহার করে জন্মজন্মান্তরের সম্পর্কের জেরকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। শিল্পসৃষ্টি হিশেবে 'গবন' আগের উপন্যাসগুলির চেয়ে সার্থক। 'গোদান' গ্রামের কৃষকজীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী। এবং সমালোচকদের মতে ওটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'নির্মলা' ও 'প্রতিজ্ঞা' নামে দুটি ছোট উপন্যাসও প্রেমচাঁদের রয়েছে।

প্রেমচাঁদের আগে পর্যন্ত উর্দু কথাসাহিত্য প্রধানত ছুটি খাতে প্রবাহিত ছিল—একদল লেখকের উপজীব্য ছিল নবউদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অপর দল ছিলেন হৃতগৌরব মুসলিম মহিমার রোমন্থনে মশ্‌গুল। জনসাধারণের জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস কেউই লেখেননি। উভয় দলের লেখকরাই ছিলেন মূলত কল্পনাবিলাসী রোমান্টিক—তফাৎ এই, প্রথমোক্তদের মধ্যে ছিল বাস্তবতার ভান, আধুনিকতার ছদ্মবেশ। প্রেমচাঁদের প্রথম যুগের লেখায় ভাবপ্রবণতা ও রোমান্টিক দৃষ্টিভংগির ছাপ কিছুটা থাকলেও—জনসাধারণের, বিশেষ করে গ্রামের কিসান জনতার দিকে ইনিই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আদর্শবাদী মানবধর্মী লেখক প্রেমচাঁদ। অনেকে তাঁকে নিছক সংস্কারবাদী বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু তাঁর যুগের পরিবেশের কথা মনে রাখলে এ ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে। সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে তিনি বিধবা বিবাহ করেন, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন। পুরোপুরি গান্ধীবাদী রাজনৈতিক বাতাবরণে তাঁর মানসিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ও প্রথম-সমরোত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে উর্দু সাহিত্যে একদা যখন ব্যাপক নৈরাজ্যবাদের প্রকাশ দেখা গেল, তখন একমাত্র প্রেমচাঁদই ধর্মবিচ্যুত হননি। শুধু তাই নয়, প্রেমচাঁদের মত লেখক সামনে ছিলেন বলেই এই নৈরাজ্যবাদ উর্দু (এবং হিন্দী) সাহিত্যে দৃঢ়মূল হতে পারেনি। সত্যিকারের জীবননিষ্ঠ শিল্পী প্রেমচাঁদ। শিল্পের জন্যে শিল্প, শিল্পীর জন্যে শিল্প—ইত্যাকার বাগাড়ম্বরে সায় তিনি দেননি। শিল্পের সামাজিক দায়িত্বের কথা একাধিকবার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আর্ট সামাজিক উদ্দেশ্যকে সাহায্য করে। প্রোপাগাণ্ডা কথাটা শ্রুতিকটু, কিন্তু গভীর আবেদনময় ভাবনাধারণা খানিকটা প্রোপাগাণ্ডার কাজ অবশ্যই করে। সাহিত্য হল এই রকম কাজের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।' তাঁরই নেতৃত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের জন্ম।

প্রেমচাঁদকে কেউ কেউ উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যের গর্কি বলে থাকেন। কথাটা অনেকাংশে সত্যি। গর্কির মত বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী না হলেও নিচু-তলার জীবনের এতবড় দরদী কথাশিল্পী উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যে আর নেই। ভারতীয় সাহিত্যেও মুষ্টিমেয়। জমিদারের নিষ্ঠুর শোষণ ও নির্মম অত্যাচার, আর নিপীড়িত কৃষকসাধারণের দারিদ্র্যদীর্ণ দৈনন্দিন জীবন, তাদের মহত্ত্ব,

তাদের সাহসিকতা, তাদের সততা ও তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার অপরাজেয় প্রয়াসের বাস্তবধর্মী চিত্রে মহিমময় প্রেমচাঁদের সাহিত্য। শোষিত শ্রেণীর প্রতি তাঁর শুধু দরদ ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী-সমন্বয়ের কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। বর্তমান সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন তিনি চাইতেন, তবে যুগের গণ্ডিবদ্ধতার [লিমিটেশন্‌স্] দরুণ পুরোপুরি সমাজ-বিপ্লবী হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতাকে আক্রমণ করে 'মহাজনী সভ্যতা'য় প্রেমচাঁদ বলেছেন :

'এই সভ্যতা মানুষকে শোষক শোষিত এই দুই ভাগে ভাগ করেছে। টাকা—শুধু টাকাই আজ মানুষের সামাজিক মর্যাদার, তার মহানুভবত্বের, তার প্রতিভার মানদণ্ড।......সাহিত্য, সঙ্গীত, আর্ট—সব-কিছুই আজ এর পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে।...ধনীদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠছে তাই প্রকৃত সভ্যতা। আজ হোক, কাল হোক, সারা পৃথিবীকে একদিন সে-পথে অগ্রসর হতেই হবে। এদেশের সামাজিক বা ধর্মীয় পরিবেশে ও-সভ্যতা খাপ খাবে না—এ-যুক্তি অচল। খৃশ্চান ধর্মের জন্ম জেরুজালেমে, কিন্তু তার সৌরভ ছড়িয়েছে বিশ্বময়। বৌদ্ধধর্ম গড়ে উঠেছিল উত্তর-ভারতে, পরে পৃথিবীর অর্ধেক নরনারী এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সব দেশের মানুষই, ছোটখাট পার্থক্য থাকলেও, মূলত এক।......একথা অবশ্য ঠিক যে এই মহাজনী বিধিব্যবস্থা আর তার বেতনভুক দালালরা প্রাণপণে রুখে দাঁড়াবে, নানা মিথ্যে প্রচারকার্য চালাবে, চোখে ধুলো দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে—কিন্তু যাই তারা করুক, পরিণামে সত্যের জয় অনিবার্য।

১৯৩৬ সালে প্রেমচাঁদের মৃত্যুর একমাস পরে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ভারতের গণমুক্তি-সংগ্রামের একজন সক্রিয় সমর্থক হিশেবে তিনি শুধু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী।

প্রেমচাঁদের সমসাময়িক লেখক হিশেবে দু'জনের নাম উল্লেখযোগ্য—কাজি আবদুল গফ্‌ফার ও রাশেদুল খইরী। কাজি সাহেবের 'লয়লা-কে-খতুত' (লয়লার চিঠি) 'মজনু-কে-ডায়েরী' (প্রেমিকের ডায়রী) বই দু'টি বিখ্যাত। প্রথমটি এক গণিকার জীবনী। উপন্যাসে লেখকের সমাজ-সচেতন মনের ছাপ সুস্পষ্ট। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই যে গণিকাবৃত্তির হেতু—আশ্চর্য শিল্পদক্ষতার সঙ্গে লেখক সেটা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। রাশেদুল খইরী ট্রাজেডি লেখক হিশেবে

উর্দু সাহিত্যে অনন্য। মধ্যবিত্ত জীবনই এঁর উপজীব্য। বাস্তবধর্মী, অবিশ্যি সে-বাস্তবতা ফটোগ্রাফিক। তবে, অনুপম রচনাশৈলীর জন্যে আধুনিক উর্দু কথাসাহিত্যে ইনি বিশিষ্ট একটি আসনের অধিকারী। রচনাশৈলীর প্রসঙ্গে নিয়াজ ফতেপুরীর নামও স্মরণীয়। এঁর বক্তব্য বিদ্রূপাত্মক এবং সর্বপ্রকার প্রচলিত রীতিনীতি ও গতানুগতিকতার ইনি বিরোধী। 'জামালীস্তান' ও 'শের-কা-আমজান' এঁর দুটি বিখ্যাত বই। শক্তিমান সমালোচকও।

অন্যান্য লেখক

ইসমৎ চুগতাই, কৃষণ চন্দর, উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক্‌, রাজেন্দর সিং বেদী, খাজা আহ্‌মদ আব্বাস, বলবন্ত সিং গার্গী, হাজরা বেগম প্রমুখ আধুনিক কালের খ্যাতনামা উর্দু কথাসাহিত্যিক। তবে ছোট গল্পে এঁরা যতখানি দক্ষ, উপন্যাসে ততখানি নয়। অর্থাৎ আধুনিক উর্দু কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রধানত ছোট গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ইসমৎ চুগতাই কথাশিল্পী হিশেবে সত্যিই শক্তিমান। বিশেষ করে চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা সংস্থাপন ও মনোবিশ্লেষণে এই মহিলার কৃতিত্ব অসাধারণ। তবে কিনা নর-নারীর যৌন-জীবনকে বড়-বেশি প্রাধান্য ইনি দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে এঁর 'তেড়িলকীর' উপন্যাসটির নাম করা যায়। এঁর 'লিহাফ' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত হয়।

বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক কৃষণ চন্দর। গভীর মানবতাবোধ ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির গুণে এঁর লেখা দেশে-বিদেশে প্রভূত সমাদর লাভ করেছে। লেখক সমাজসচেতন, আশাবাদী। প্রথম উপন্যাস 'শিকস্ত' (পরাজয়) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি এঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। 'জিন্দ্‌গীকে মোড় পর', 'হম্ ওয়াহ্‌শী হ্যয়', 'ফুল সুরখ্‌ হ্যয়' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ ও ছোট উপন্যাস 'অন্-দাতা'-য় লেখকের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে ইনি বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

কিন্তু বক্তব্যের সোচ্চার ঘোষণায় কৃষণ চন্দর যতখানি তৎপর, জীয়ন্ত চরিত্র-সৃষ্টিতে মনোযোগী সে-পরিমাণ নন। এঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'খেত

জাগে' (তেলেঙ্গানার কিসান অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় রচিত)-তেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বিশেষ করে, 'অন্-দাতা'র পর থেকেই এঁর কলমের ধার যেন কমে গেছে। এবং এই দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার জন্যে ইদানীং চমক সৃষ্টির দিকে নজর দিয়েছেন সমধিক। এই চমক-সৃষ্টিও আবার সবসময় মৌলিক নয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতার চেয়ে কল্পনার উপর ইনি নির্ভর করেন বেশি। কোরিয়া ['সিওল জল্ রহা হয়'] চীন, তেলেঙ্গানা ও বাংলাদেশ ['ব্রহ্মপুত্র'] নিয়ে যেসব কাহিনী তৈরি করেছেন তার মধ্যে ধার হয়ত আছে, ভার নেই। বক্তব্য প্রগতিশীল সন্দেহ-কি, তবে কিনা জীয়ন্ত মানুষের দেখা মেলে না। আব্বাস রিপোর্টাজধর্মী গল্পেই অধিকতর পারদর্শী। এঁর 'জাফরানকে ফুল' ও 'নয়া সংসার' বই দুটি খুবই জনপ্রিয়। হৃদয়াবেগের অনুপস্থিতি ও বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য হেতু আব্বাসের লেখা মনকে স্পর্শ করে, হৃদয়কে আলোড়িত করতে পারে না।

কৃষণ চন্দর ও আব্বাস সম্পর্কে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা কর্তব্য মনে করি—লেখক হিশেবে এঁদের ভূমিকা দ্বৈত। একদিকে প্রগতিশীল, অন্যদিকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল। মার্কিনী ঢঙে তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমার গল্প লিখেও এঁরা প্রগতিবাদের বুলি আউড়ে যাচ্ছেন। বাংলার দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে কৃষণ চন্দর উপন্যাস লিখেছেন (এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে অবশ্য মতদ্বৈত আছে); আবার এই ভদ্রলোকই রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'কে 'জলজলা' বানিয়েছেন ! ভারতীয় সিনেমা মারফৎ মার্কিনী অপসংস্কৃতির প্রধান দুই প্রচারক কৃষণ চন্দর ও খাজা আহ্মদ আব্বাস।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামই উপেন্দ্রনাথ আশ্কের উপজীব্য। সংযত লেখনী, দরদী ও জীবনধর্মী কথাশিল্পী। প্রেমচাঁদের মানবতাবোধের ইনি উত্তরাধিকারী। আঙ্গিক সম্পর্কে সতর্কদৃষ্টি। উর্দু ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই উপেন্দ্রনাথ লিখে থাকেন। শিল্পী হিশেবে রাজেন্দর সিং বেদীকে অনেকে কৃষণ চন্দরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। আঙ্গিক বা ভাষার কারু-কার্যের দিক দিয়ে ইনি অবশ্য কৃষণ চন্দরের মত কুশলী নন, কিন্তু কাহিনীর মানবিক আবেদনে অতি-সহজেই এঁর লেখা পাঠকের হৃদয়-মনকে অভিভূত করে। মধ্যবিত্ত ও গ্রামজীবন নিয়ে লিখিত এঁর 'নয়া কোট' (নতুন কোট) আধুনিক উর্দু সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। শিখদের নিয়ে কয়েকটি সার্থক গল্প লিখেছেন বলবন্ত সিং গার্গী এবং এক্ষেত্রে ইনিই প্রথম—তাই স্মরণীয়।

অনুবাদেও উর্দু সাহিত্য রীতিমত সমৃদ্ধ। বিদেশি সাহিত্য ও বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্য থেকে অনূদিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা সুপ্রচুর। বাংলা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের বহু গল্প-উপন্যাস-কবিতার অনুবাদ তো হয়েইছে—আধুনিক যুগের তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এমন-কি তরুণতম ননী ভৌমিক পর্যন্ত উর্দু পাঠকসমাজে সুপরিচিত। নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন'-এর অনুবাদ উর্দু সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। কৃষণ চন্দরের মত প্রগতিশীল লেখক রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাৎপর্য উপলব্ধিতে অক্ষম হলেও সাধারণভাবে উর্দু লেখকরা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কৃতী বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন।

পাকিস্তানের লেখকবৃন্দ

দেশবিভাগের পর উর্দু লেখকের একটা বড় অংশ পাকিস্তানে থেকে যান বা চলে যান। পাকিস্তানের দুই প্রগতিশীল শক্তিশালী লেখক সজ্জাদ জহীর ও কবি ফৈয়জ আহ্‌মদ ফৈয়জ আজ কারাগারে বন্দী। এঁরা নাকি লিপ্ত ছিলেন সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে !

সজ্জাদ জহীর সমালোচক ও ছোট গল্পলেখক। একান্তভাবে রাজনীতিতে আত্মসমর্পণ করার দরুণ এঁর সাহিত্যিক প্রতিভা উপেক্ষিত। 'বিমার' নাটক ও 'লণ্ডন কী এক রাত' উপন্যাসটির জন্যে উর্দু সাহিত্যে নিঃসন্দেহে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে এই উপন্যাসটি লিখিত।

সজ্জদ জহীরের

> মজ্‌লুমোঁনে মুল্‌কো মুল্‌কো আব্ ঝাণ্ডা লাল উঠায়া হৈ
> জো ভুখা থা জো নংগা থা অব্ গুসসা উস্‌কো আয়া হৈ
> রোকে তা কোই হমকো জরা সারা সংসার হমারা হৈ—

গানটি একদা উত্তর-ভারতের জনতার প্রভূত সমাদর লাভ করেছিল।

ফৈয়জ শুধু পাকিস্তানের নয়, সাম্প্রতিক উর্দু কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান। এঁর 'তাজ' কবিতাটি আধুনিক উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আঙ্গিকগত চমকপ্রদ কারুকার্য ফৈয়জের নেই, মূলত ইনি রোমান্টিক সংবেদনশীল কবি। রোমান্টিক মানে অবিশ্যি নিছক কল্পনাবিলাসী নন।

প্রথম দিকে কিছুটা পলায়নাভাব দেখা গেলেও পরে ইনি যুগজীবন সম্বন্ধে সচেতন এবং বলিষ্ঠ আশাবাদের ঘোষণায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। 'নক্‌শ্-ই-ফরিয়াদী' কাব্য গ্রন্থটির নাম উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে।

ফৈয়জকে বাদ দিলে পাকিস্তানের প্রবীণ ও নবীন কবি হিশেবে জাফর আলী খাঁ, আমীন-ই-হাজিন, তাজওয়ার, সিমাব, রাজা আলী ওয়াহ্‌শত, হাফিজ জলেন্ধরী, তাছির [ডাঃ মোহাম্মদ দীন], আবীদ আলী আবীদ, ইহসান দানীশ, খালিদ [ডাঃ তাসাদ্দেক হুসেন], আছর সেভাই, কাছমী, জহীর কাশ্মিরী, আবদুল মজিদ ভাট্টি, মোখতার সিদ্দিকী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারজন ইকবালের সমসাময়িক এবং তাঁর দার্শনিক-ধর্মীয় মতবাদে আচ্ছন্ন। তাজওয়ার [ইহসান উল্লাহ্ শাহ্] কবি অপেক্ষা কবি-স্রষ্টা হিশেবেই সমধিক পরিচিত। পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি বর্তমানে হাফিজ জলেন্ধরী—কবিতার বিনিময়ে ইনি শুধু প্রচুর খ্যাতি নয়, প্রভূত অর্থও উপার্জন করে থাকেন। এঁর প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ 'নাগমাজার' ও 'সুজ ওয়া সাজ'-এ যে দেশপ্রেম ও জীবনচাঞ্চল্যের স্বাক্ষর ছিল, পরবর্তী যুগের 'তালখারায়ে শিরিন'-এ তা অনুপস্থিত। শেষের দিকে হাফিজ রীতিমত সিনিক হয়ে ওঠেন। একদা প্রগতি আন্দোলনের শরিক হলেও আজ ইনি পুরোপুরি ইসলামীয়—'শাহ্‌নামায়ে ইসলাম'-এর—কবি। ভাট্টি ও সিদ্দিকী দাঙ্গা ও দেশবিভাগ সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে উপজীব্য করে কবিতা লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সুর এদের কবিতায় সোচ্চার। কবি খালিদের তেমন কোন স্বকীয়তা নেই, তবে উর্দুতে গদ্যকবিতার প্রবর্তকদের অন্যতম হিশেবে ইনি স্মরণীয়। তরুণ পাকিস্তানী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কাছমী ও জহীর কাশ্মিরী। এরাই উর্দু সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ভাবীকালের অগ্রদূত। অসাম্প্রদায়িক, সমাজসচেতন—প্রগতিশীল।

উর্দু কাব্যসাহিত্যে গজলের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। আগে গজল মানে শুধু প্রেমের গানই বোঝাত। আরবে এই নামে এক কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার একমাত্র উপজীব্য ছিল প্রেম। পরে প্রেমের গান বা কবিতা মাত্রেই গজল নামে অভিহিত হত। মতান্তরে : গজল একটি আরবী শব্দ। এর মানে—মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ। যাহক

আরবী গজলের প্রেরণায় ফার্সী কবিরা প্রথম গজল রচনা শুরু করেন। এবং উর্দুতে আরবীর চেয়ে ফার্সী গজলেরই প্রভাব সমধিক। বিশিষ্ট সমালোচক মওলানা আবদুল হালিম শররের মত : উর্দুতে গজলের যতখানি সমৃদ্ধি ঘটেছে আরবী বা ফার্সীতেও অতখানি ঘটেনি। যুগধর্মে বারবার গজলের ভাবগত পরিবর্তন ঘটলেও কাঠামোটা বরাবর অক্ষুণ্ণ। পাঠক-শ্রোতা ও কবির মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলবার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম গজল। তাই আধুনিক কবিরাও সযত্নে এই আঙ্গিকটিকে লালন করে চলেছেন। পাকিস্তানী গজল-রচয়িতাদের মধ্যে এখনো অবিশ্যি কেউ হসরত মোহানী, মীর্জা যাস, আগানা, ফানী, জিগর বা আসগর গোন্দভীর সমতুল্য নন। তবু এক্ষেত্রে সার্থক শিল্পী হিশেবে রাজা আলী ওয়াহ্-শত, হাজী মছলিশারী, হামিদ আলী খান,জালালুদ্দীন আকবর, জেড এ বোখারী ও হাফিজ হোসিয়ারপুরীর নাম করা যায়। এঁদের মধ্যে রাজা আলী ওয়াহ্শত ও বোখারীই সবচেয়ে শক্তিশালী ও মৌলিক। বোখারীর ছন্দ ও অনুভূতিবোধ সূক্ষ্ম এবং মানুষের মর্যাদা ও মহিমার জয়গানে ইনি উদাত্ত। গজলে গালিবের মহান ঐতিহ্যের সার্থকতম অনুগামী রাজা আলী ওয়াহ্শত।

পাকিস্তানের শক্তিশালী প্রবীণ ও নবীন কথাশিল্পীদের মধ্যে আহ্মদ আলী, আজিজ আহ্মদ, হাসান আসকারী, আখতার রায়পুরী, গোলাম আব্বাস, সাদাত হোসেন মিণ্টো, কুদরতুল্লাহ্ শাহাব, কুর্রাতুল আইন হায়দার, আহ্মদ নাজীম কাসমী, শফিকুর রহমান, মমতাজ মুফতি, ইবনে সায়ীদ, মুমতাজ শিরিন, ও ইন্তিজার হোসেনের নাম করা যায়।

আহ্মদ আলী এক সময় বাস্তবধর্মী ও সমস্যামূলক ছোট গল্পলেখক হিশেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দেশবিভাগের পর একটি বই-ও ইনি প্রকাশ করেননি। হাসান আস্কারী ও আজিজ আহ্মদ দুজনেই ছোট গল্প ও উপন্যাসে সমান দক্ষ। তবে জীবনধর্মী লেখক এঁদের বলা যায় না। প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে একদা যুক্ত থাকলেও, তার থেকে কোন পাঠ এঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। বিশেষ করে হাসান আস্কারী। ছোট গল্প ও সমালোচনা সাহিত্যে এঁর প্রতিভা অনস্বীকার্য। কিন্তু হলে কি হবে—জীবন সম্পর্কে নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ কোন মহৎ সাহিত্য ইনি সৃষ্টি করতে পারেননি। ইনিই একবার লিখেছিলেন—বাংলার দুর্ভিক্ষকে নিয়ে লেখা গল্প পড়ার চেয়ে উলঙ্গ ছবি দেখা অধিকতর আরামপ্রদ! এঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ

'জাজিরে' থেকে ইদানীংকার 'কেয়ামত হামরেকাব আয়ে না আয়ে' পর্যন্ত সমস্ত বইয়েই ভাঙনধরা সমাজের চিত্রটিকেই একান্তভাবে তুলে ধরেছেন। আজিজ আহ্‌মদ ও মিণ্টোর লেখাতেও বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে নর-নারীর যৌনজীবন। অশ্লীলতার অভিযোগে 'ঠাণ্ডা গোস্ত্'-এর জন্যে মিণ্টোকে সরকারী সাজাও ভোগ করতে হয়েছিল। বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। 'ঠাণ্ডা গোস্ত্'-এর আগে প্রকাশিত এঁর 'বু' (গন্ধ) ও 'কালী শালওয়ার' (কালো শালোয়ার) বই দুটিও প্রবল আলোড়নের সঞ্চার করে—একই কারণে।

তবে, সাম্প্রতিককালের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে প্রায়-সকলেই সমসাময়িক সমাজ-জীবন ও সামাজিক সমস্যাবলী থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলেও—মিণ্টোই একমাত্র ব্যতিক্রম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ইনি শতাধিক গল্প লিখেছেন। অবিশ্যি দৃষ্টিভঙ্গির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি—আগের মতই ধর্মীয় ভণ্ডামী ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিকে তীব্র কষাঘাত করেছেন, যৌনবৃত্তির অবদমনের বিষময় পরিণামও দেখিয়েছেন—সুস্থ কোন জীবনাদর্শ এই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে পারেননি। অধিকন্তু, এঁর প্রথমদিকের লেখার আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর মধ্যে যে অত্যাশ্চর্য কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যেত, দাঙ্গার গল্পে সেটাও অনুপস্থিত। মিণ্টোর 'মিণ্টো-কে-মাজানিন' সমধিক জনপ্রিয়। আব্বাস জনপ্রিয় গল্পলেখক, সূক্ষ্ম রসানুভূতি রয়েছে, চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-গ্রন্থনেও পারঙ্গম—বক্তব্যের দিক দিয়ে গতানুগতিক।

কুদরতুল্লাহ্ শাহাব, কুর্‌রাতুল আইন হায়দার, আহ্‌মদ নাজীম কাসমী, মমতাজ মুফ্‌তী ও শফিকুর রহমান—দেশবিভাগের আগে শক্তিশালী লেখক হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান ও প্রগতিশীল লেখক নাজিম কাসমী। জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে নির্যাতীত কৃষক-জীবনকে ইনি বিভিন্ন গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ছাপ এঁর লেখায় সুপরিস্ফুট, সমাজসচেতন শিল্পী ইনি। এঁর 'হিরোসীমা সে পহলে' ও 'হিরোসীমা কে বাদ'-এ পাঞ্জাবের এক নগণ্য গ্রামে ১৯৪৬ সালের প্রতিক্রিয়ার চিত্র সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রথমে ছোট গল্পলেখিকা হিশেবে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেও 'মেরী ভি সনম খানেমে' (আমার মন্দিরেও) উপন্যাসেই কুর্‌রাতুল আইন হায়দারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'সিতারোঁ সে আগে' [তারার দেশ ছাড়িয়ে]

এঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। ক্ষয়িষ্ণু সমাজজীবনই এঁর লেখার উপজীব্য, দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক। হাল্কা ও হাস্যরসাত্মক গল্পলেখক হিশেবে শফিকুর রহমান পাঠকশ্রেণীর এক-অংশের স্তুতি অর্জন করেছেন। মনস্তত্বমূলক গল্পে মমতাজ মুফ্তী বিশিষ্ট একটি আসনের অধিকারী। ফ্রয়েডের ইনি মন্ত্রশিষ্য। পটভূমিকার বৈচিত্র্যের জন্যে ইব্‌নে সায়ীদের নাম উল্লেখযোগ্য—যুদ্ধবিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় ইনি অনেকগুলি সুখপাঠ্য গল্প লিখেছেন। এঁর লেখা অনেকটা সাংবাদিকধর্মী। ব্রহ্মযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'নারিয়ালকি ছায়েঁ' [নারকেল বনের ছায়ায়] এঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। মুমতাজ শিরীন উপন্যাস, ছোট গল্প ও সমালোচনা —সব দিকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।—জনপ্রিয় লেখিকা—রচনাশৈলী কিন্তু দুর্বল, দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক। ইন্তিজার হোসেন বয়েসে তরুণ ও প্রতিশ্রুতিবান। 'গলি কোচি' (গলি ঘুঁজি) এঁর উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন। শ্রমিক-জীবনকে ভিত্তি করে ইনি কয়েকটি সার্থক গল্প লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গি বলিষ্ঠ, সমাজসচেতন।

আগে বলেছি, উপসংহারেও বলি—উর্দু সাহিত্যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার নেই। মুসলিমদের হাতে এর গোড়াপত্তন হলেও, এবং, মুসলিম নবজাগৃতির বাহন হিশেবে উর্দু সাহিত্যে আধুনিকতার বিকাশ ঘটলেও, সে-বিকাশ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নেই-ও। সকল সম্প্রদায়ের লেখকরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ অনুযায়ী উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তুলছেন।

হিন্দী

"বাংলা, মারাঠী বা ওড়িআর সংস্কৃত ঐতিহ্য হিন্দীর তুলনায় অনেক প্রাচীন। একশ' বছর আগে খড়ীবোলী, অর্থাৎ আধুনিক নমুনার হিন্দী গদ্যে কোন সাহিত্য ছিল না—এমন—কি ১৯২৫ সন পর্যন্তও খড়ীবোলী গদ্যে কোন সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন নেই। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের অর্বাচীন এই হিন্দী গদ্য এখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে……।"

বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে যাঁরা ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন, যাঁদের ধারণা হিন্দীর চেয়ে অনেকগুণ সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করে হিন্দীকে **একমাত্র** রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার পেছনে হিন্দীভাষী ধনিকশাসিত কংগ্রেসের চক্রান্ত রয়েছে—আসমুদ্রহিমাচল হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠাই এর আসল উদ্দেশ্য—ডাঃ সুনীতিকুমার চাটুয্যের উপরোক্ত মন্তব্যে তাঁরা উৎসাহিত বোধ করবেন নিঃসন্দেহে।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্য যে বাংলার বহু পেছনে পড়ে রয়েছে এবং মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া ছোট-বড় প্রায়-প্রত্যেকটি হিন্দী লেখক যে বাংলা সাহিত্যের থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বাংলা সাহিত্যের অনুকরণ করেছেন—উগ্র হিন্দী দরদীরা অস্বীকার করলেও এটা বাস্তব সত্য। তাই শুধু নয়—আধুনিক হিন্দী ভাষা-সাহিত্যের অগ্রগতিতে বাঙালির দানও সর্বাগ্রগণ্য। এই প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিআম কলেজের হিন্দুস্তানী বিভাগের হেড-মুন্সী তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সবিশেষ স্মরণীয়। রাষ্ট্রিক ঐক্যের জন্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭৫ সালেই হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার আবশ্যকতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন ঐ একই মতাবলম্বী। বাংলার বাইরে সেদিন হিন্দীর স্বপক্ষে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন পাঞ্জাবের শিক্ষাবিভাগের বাঙালি কর্ণধার নবীনচন্দ্র রায়। প্রথম হিন্দী মহিলা পত্রিকা 'সুগৃহিণী' (১৮৮৮) বার করেন এক বাঙালিনী —নবীনচন্দ্রের কন্যা হেমন্তকুমারী দেবী—পাঞ্জাব থেকে। প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্র (দ্বিভাষিক) 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এর সম্পাদক এক বাঙালি—

শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালে কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রাক-ভারতেন্দু যুগের শ্রেষ্ঠ দুটি হিন্দী পত্রিকা 'বনারস অখবার' আর 'সুধাকর'-এর সম্পাদক ছিলেন তারামোহন মিত্র—বাঙালি।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বিকাশের একমাত্র কৃতিত্ব নাকি কাশীর 'নাগরী প্রচারিণী সভা'র! সভার কৃতিত্ব সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েও একথা মনে রাখা দরকার যে এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৩ সাল।

ভারতেন্দু-যুগ

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে মোটামুটি চারিটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ (১) ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের যুগ, (২) পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর যুগ, (৩) ছায়াবাদের যুগ ও (৪) প্রগতিবাদের যুগ। এর মধ্যে প্রথম দু যুগের লেখকরা সাহিত্যসৃষ্টির চেয়ে ভাষা-সংস্কারের দিকেই নজর দিয়েছিলেন বেশি। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধতম অধ্যায় ছায়াবাদের যুগ।

প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের বাহন ছিল অবধি ও ব্রজভাষা। কিন্তু এই ভাষা আধুনিক ধ্যানধারণা প্রকাশের উপযোগী না হওয়ায় তার সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। অধিকন্তু, ১৮৫০—৭৫ সাল পর্যন্ত এক প্রবল ভাষা-দ্বন্দ্ব হিন্দী সাহিত্যে প্রকট হয়ে ওঠে। রাজা শিবপ্রসাদের নেতৃত্বে একদল লেখক ফার্সী-প্রধান ও রাজ্য লক্ষ্মণ সিংয়ের নেতৃত্বে অন্য দল সংস্কৃতবহুল হিন্দীর স্বপক্ষে জোর আন্দোলন শুরু করেন। এ-বিবাদে মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। মাত্রাতিরিক্ত সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়ে ইনি পশ্চিমী-হিন্দীর কথ্যভাষার মার্জিত রূপ খড়ীবোলীকে সাহিত্যের মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেন। আধুনিক হিন্দী সাহিত্য প্রধানত এই খড়ীবোলী ভাষায় রচিত।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র মারা যান মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের এই তরুণই আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক। ভাষার ক্ষেত্রেও যেমন, আদর্শের ক্ষেত্রেও তেমনি ভারতেন্দু প্রাচীন-অর্বাচীনের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা—সবই লিখেছেন, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রেই কৃতিত্ব এঁর সমধিক। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার ভারতেন্দু।

নাটকে একই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য আঙ্গিক ও সংস্কৃত রূপরীতির সংমিশ্রণ ঘটান। মাত্র ষোল বছর বয়েসে ইনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃত 'বিদ্যাসুন্দর'-এর হিন্দী অনুবাদ করেন। ব্যক্তিগত জীবনেও ভারতেন্দু ছিলেন অত্যন্ত উদারহৃদয়; দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পরম ভরসাস্থল।

বাংলায় যেমন 'বঙ্গদর্শন', হিন্দীতে তেমনি 'সরস্বতী'। ১৮৯৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। চার বছর পরে 'সরস্বতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী।

ভারতেন্দু খড়ীবোলীর মোটামুটি একটা আদর্শ (স্ট্যাণ্ডার্ড) স্থাপন করে-ছিলেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কালে এর প্রসার ছিল নিতান্তই গণ্ডিবদ্ধ। এই শতাব্দীর সূচনায় সাহিত্যের নানামুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-সম্প্রসারণের প্রয়োজনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। নতুন নতুন ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দাবলীর অভাবে লেখকরা ইংরেজি, বাংলা, মারাঠী ও উর্দু থেকে বেপরোয়াভাবে শব্দ আহরণ শুরু করেন। অনেক সময় ব্যাকরণ বা সঠিক বানান-উচ্চারণের দিকে পর্যন্ত নজর তাঁরা দিতেন না। ফলে হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসে মহাদুর্দিন।

হিন্দীকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করেন পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী। খড়ীবোলীকে পরিমার্জনা করে ইনিই তাকে সাহিত্যের বাহন করে তোলেন। 'সরস্বতী'র সম্পাদক হিশেবে প্রত্যেকটি রচনা দ্বিবেদীজী সংশোধন করতেন। এবং সংশোধিত রচনার একটি কপি পাঠিয়ে দিতেন সংশ্লিষ্ট লেখকের কাছে। এঁর সযত্ন ও সক্রিয় অনুশীলনের ফলেই ভারতেন্দুর খড়ীবোলী বর্তমান রূপ পেয়েছে। ইংরেজি গদ্যরীতিকে দ্বিবেদীজী আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করে-ছিলেন, সেই সঙ্গে সাহায্য নিয়েছিলেন বাংলা গদ্যভঙ্গির। প্রায় কুড়ি বছর ইনি 'সরস্বতী'র সম্পদনা করেন।

মৌলিক লেখক হিশেবে দ্বিবেদীজী অসাধারণ না হলেও, শক্তিশালী অনুবাদক হিশেবে অবশ্যই স্মরণীয়। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ও মারাঠি থেকে বহু বই ইনি হিন্দীতে অনুবাদ করেন।

কাব্যসাহিত্য

দ্বিবেদীজীই প্রথম ব্রজভাষার বদলে খড়ীবোলীতে কবিতা রচনায় কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি বলতেনঃ সাহিত্যের—গদ্য ও পদ্য দুই-ই—বাহন হিশেবে এমন একটি ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নেওয়া উচিত যাতে সেটা সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য হয়। ১৯০৯ সালে তিনি 'কবিতা কলাপ' নামে একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন। এতে তাঁর এবং সমসাময়িক চারজন শক্তিশালী কবি—মৈথিলীশরণ গুপ্ত, নাথুরাম শঙ্কর শর্মা, রায় দেবীপ্রসাদ পূর্ণ ও কামতাপ্রসাদ গুরুর কবিতা রয়েছে। খড়ীবোলীতেও যে সার্থক কবিতা রচনা সম্ভব, 'কবিতা কলাপ' তার প্রথম প্রমাণ। অবিশ্যি এইসব কবিতার ভাববস্তু ধর্মীয় বা পৌরাণিক।

ভারতেন্দু ও তাঁর অনুরাগীরা কাব্যে নতুন এক প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন সত্যি, কিন্তু ভাববস্তুর দিক দিয়ে পুরনো ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে তাঁরা পারেননি। দ্বিবেদীজীর যুগেই হিন্দী কাব্যসাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাত। গতানুগতিক কাব্যরীতি ও কাব্যবিষয়ের গণ্ডি ভেঙে এই প্রথম একদল কবি অগ্রসর হলেন নতুন পথে। কোন কোন সমালোচক এই যুগটাকে তাই ইংলণ্ডের রোমান্টিক কাব্য-পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের যুগের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু গতানুগতিকতা পরিহারের দিক দিয়ে একে কিছুটা রোমান্টিক বলা গেলেও, ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবিকুলের সেই অবাধ কল্পনা-বিস্তার, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগপ্রাবল্য বা প্যাশন ও প্রাণময়তার পরিচয় অনুপস্থিত এঁদের কাব্যে।

পণ্ডিত অযোধ্যা সিং উপাধ্যায় ও মৈথিলীশরণ গুপ্ত—এ-যুগের দুই শক্তিশালী কবি। পণ্ডিত উপাধ্যায় প্রথম দিকে খড়ীবোলীতে কবিতা রচনা শুরু করেন। তখন এঁর আদর্শ ছিল উর্দু কাব্যরীতি। কিন্তু এঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'প্রিয় প্রবাস' খড়ীবোলীতে রচিত হলেও সংস্কৃত কাব্যরীতির প্রভাবে আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রার পৌরাণিক কাহিনী 'প্রিয় প্রবাস'-এর উপজীব্য—কিন্তু কবি এখানে কোন-রকম অতিলৌকিক বা অবাস্তব ঘটনাকে প্রশ্রয় দেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে আদর্শ দেশনায়কের চরিত্র। ঐশ্বরিক লীলাভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে মানবীয় আবেগানুভূতি।

'সরস্বতী'র নিয়মিত লেখক হিশেবে মৈথিলীশরণ দ্বিবেদীজীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কিন্তু সে-প্রভাব এঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। দ্বিবেদীজীর যুগের ইনি শ্রেষ্ঠ কবি। তবে এঁর ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা দেয় পরবর্তী যুগে। হিন্দী কাব্যসাহিত্যে ছায়াবাদ-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ইনি।

প্রথম যুগে রচিত মৈথিলীশরণের 'ভারত-ভারতী' আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের একটি স্মরণীয়—হয়ত-বা স্মরণীয়তম—গ্রন্থ। হালীর 'মোসাদ্দেস'-এর সঙ্গে বইটি তুলনীয়। হালী তাঁর বইয়ে হা-হুতাশ করেছেন হৃতগৌরব মুসলিম মহিমার জন্যে, মৈথিলীশরণের হাহাকার ভারতের গৌরবময় অতীতের স্মরণে। পরাধীন ভারতের দুর্দশাই, বলা বাহুল্য, এই কাব্যের প্রেরণা। সমগ্র উত্তর-ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে 'ভারত-ভারতী'র ভূমিকা অসামান্য।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের সঙ্গেও মৈথিলীশরণের আত্মীয়তা অন্তরঙ্গ। 'মেঘনাদ-বধ'-এর সার্থক অনুবাদক হিশেবে ইনি খ্যাতনামা। প্রধানত বাংলা কাব্যের প্রেরণাতেই এঁর কবিজীবনের পরবর্তী বিকাশ। সমসাময়িক রাজনীতির প্রভাবে মৈথিলীশরণের কবিমানস প্রভাবান্বিত। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে ইনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারপন্থী। আধুনিক যুগ ও জীবন সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন। বর্তমানে রাষ্ট্রকবি হিশেবে পরিচিত।

ছায়াবাদের যুগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান, ভারতীয় রাজনীতির দ্রুত পট-পরিবর্তন, গান্ধী-আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসার, যন্ত্রযুগের জটিলতা বৃদ্ধি ও প্রথমসমরোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ভারতের প্রত্যেকটি অঞ্চলের সাহিত্যে কম-বেশি সংকট ঘনিয়ে আসে। পুরনো ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের অবসান আসন্ন, অথচ নতুনের কোন নিশানা নেই। ফলে এই সময়কার হিন্দী কবিরা হয়ে পড়েন একান্ত আত্মমুখী। বাস্তবের দিকে পিছন ফিরে নতুন এক কল্পস্বর্গ তাঁরা গড়ে তোলেন। এইভাবে আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যে ছায়াবাদের জন্ম। আগেকার কবিতা ছিল নিতান্তই বস্তুকেন্দ্রিক, এখন হল যারপরনাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

এই ছায়াবাদের যুগ (১৯২০-৩৫) আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধতম অধ্যায়—আগেই বলেছি। ছায়াবাদকে মিস্টিসিজ্‌ম বা রহস্যবাদ বা প্রতীকবাদ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। একদিকে ইউরোপীয় প্রতীকবাদী কবিকুল এবং রবীন্দ্রনাথ, অপরদিকে বিদ্যাপতি, কবীর ও সুরদাসের কাছ থেকে এযুগের কবিরা প্রেরণা লাভ করেন।

প্রেম ও প্রকৃতিই ছায়াবাদী কবিদের প্রধান উপজীব্য। অবিশ্যি, এ-ব্যাপারে পূর্বতন কবিদের সঙ্গে ছায়াবাদী কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য মৌলিক। এঁরা প্রেম বা প্রকৃতির অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ব্যক্তিমনে তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এঁদের মানসপরিক্রমা। প্রেম ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রহস্যনিবিড় অতীন্দ্রিয় এক পরিমণ্ডল নির্মাণেই এঁদের কাব্যের সার্থকতা।

ভাববস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের বহিরঙ্গের পরিবর্তনও অনিবার্য। খড়ীবোলী এতদিনে সুনির্দিষ্ট একটি রূপ পেয়েছিল, এ-যুগের কবিরা তাকে কাব্য-সুষমামণ্ডিত করে তোলেন। নতুন নতুন প্রতীক, চিত্রকল্প, উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে, কবিদৃষ্টির আশ্চর্য নবীনতায় ও গভীরতায় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সোচ্চার ঘোষণার ছায়াবাদী কবিরা কাব্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এক পরিবর্তনের সূচনা করেন।—এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবিশ্যি নিছক ব্যক্তি-বিলাস অর্থাৎ আত্মরোমন্থনে পর্যবসিত হয় শেষ পর্যন্ত।

এ-যুগের বিশিষ্ট কবি হিশেবে মৈথিলীশরণ গুপ্ত, জয়শঙ্কর 'প্রসাদ', নিরালা (সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী), সুমিত্রানন্দন পন্ত ও শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার নাম উল্লেখযোগ্য।

মৈথিলীশরণের 'সাকেত' ও 'যশোধরা'র মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট। 'সাকেত'-এর কাহিনী গৃহীত রামায়ণ থেকে। নায়িকা—সীতা নয়—উর্মিলা (রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র প্রভাব লক্ষ্যনীয়)। বুদ্ধ-জীবনের একটি অধ্যায় নিয়ে 'যশোধরা' রচিত। যশোধরার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ভারতীয় নারীর এক মহিমময় রূপ তুলে ধরেছেন। সিদ্ধার্থের গোপন গৃহত্যাগে যশোধরার দুঃখে সমগ্র নারীজাতির জন্যে কবির হৃদয় হাহাকার করে ওঠে :

অবলা জীবন হায় তুম্‌হারী য়হী কহানী
আঁচল মেঁ হায় দুধ আওর আঁখোঁ মেঁ পানী।

কিন্তু যশোধরার আপসোস ঃ

সিদ্ধি হেতু স্বামী গএ য়হ গৌরব কী বাত
পর চোরী চোরী গএ য়হী বড়া ব্যাঘাত।

—সিদ্ধি লাভের জন্যে স্বামী গিয়েছেন, এতো গৌরবের কথা। কিন্তু চোরের মত পালিয়ে গেলেন কেন? আমার ব্যথা সেইখানে।

সখি ওয়ে মুঝসে কহ কর যাতে
কহ, তো ক্যা মুঝকো ওয়ে পথ বাধা হী পাতে?

—উনি যদি আমায় বলে যেতেন, সখি, তুই-ই বল্, তাহলে কি আমি ওঁর পথের বাধা হতাম?

সাধনার শেষে সিদ্ধার্থ ফিরে এলেন, স্বামীর প্রতি তখনো যশোধরার অভিমান যায়নি।

ভগবান বুদ্ধ—অতি সাধারণ মানুষের মত—মান ভাঙাচ্ছেন অভিমানিনী সহধর্মিনীর ঃ

মানিনি মান তজো, লো তুমহারী বান
দানিনি আয়া স্বয়ং দ্বার পর যহ্ তব তত্রভবান।……
মানা দুর্বল হী থা গৌতম ছিপ কর গয়া নিদান……
যদি মিলে নির্দয়তা কী তো ক্ষমা করো প্রিয় জান।

—ওগো মানিনি, মান করে আর থেক না। আজ আমি তোমার দ্বারে ভিখারি, হে দানিনি, ভিক্ষে দাও।……মেনে নিচ্ছি, গৌতম দুর্বল ছিল—তাই সে চলে গিয়েছিল তোমায় না জানিয়ে। যদি নিষ্ঠুরতা করে থাকি, প্রিয় জেনে তুমি আমায় তাহলে ক্ষমা করো।

মানবিক আবেগে আশ্চর্যরকম সমৃদ্ধ এই কাব্যগ্রন্থখানি।

জয়শঙ্কর প্রসাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কামায়নী' মহাকাব্য বিশেষ। দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি দার্শনিক। কবির বক্তব্য ঃ মানুষের জীবনে যুক্তিবাদ নয়, বিশ্বাসের মূল্যই সবচেয়ে বেশি। একমাত্র বিশ্বাসই মানুষের বাসনা, জ্ঞানস্পৃহা ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম। বিশ্বাসের বলেই সমস্ত প্রতিকূলতা ও প্রতিরোধকে অস্বীকার করে মানুষের পক্ষে স্বর্গীয় সান্নিধ্য লাভ সম্ভব।

ছায়াবাদের যুগের, তথা আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি নিরালা। বাংলা দেশে (মহিষাদলে) এঁর জন্ম, বাংলাদেশে মানুষ।

বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সবিশেষ। বিখ্যাত সমালোচক পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লই বলেছেন, 'নিরালাজী পর বঙ্গভাষা কী কাব্যশৈলী কা প্রভাব, সমাস মেঁ গুম্ফিত পদবল্লরী, ক্রিয়াপদ কে লোপ আদি মেঁ স্পষ্ট ঝলকতা হৈ।'

যথা :

গন্ধ ব্যাকুল-কুল-উর-সর
লহর-কচ কর কমল-মুখ পর
হর্ষ অলি হর স্পর্শ-শর সর
গুঞ্জ বারংবার ! (রে কহ)
নিশা-প্রিয়-উর-শয়ন-সুখ-ধন
সার ইয়া কি অসার ? (রে কহ)

অথবা :

কব সে মৈঁ পথ দেখ রহী, প্রিয়
ঔর ন তুমহারে রেখ রহী, প্রিয়।
তোড় দিয়ে যব সব অবগুণ্ঠন
রহা এক কেবল সুখ লুণ্ঠন
তব ক্যোঁ ইতনা বিস্ময় কুণ্ঠন ?
অসময়-সময় ন করো থড়ী, প্রিয় ?

—কবে থেকে পথ চেয়ে আর কাল গুণে
বসেই আছি তোমার লাগি হায় প্রিয় !
টুটল যখন সকল অবগুণ্ঠন-ই
রইল যখন কেবল সুখের লুণ্ঠন-ই
তখন কেন বিস্ময়ের এই কুণ্ঠনে
কাল-অকালের বাছ-বিচারে চুপ, প্রিয় ?

(অনু : সুধাকর চট্টোপাধ্যায়)

এ-ধরনের ছন্দভঙ্গি হিন্দী কবিতায় আগে ছিল না। এ-ব্যাপারে নিরালা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী।

পুরনো মূল্যবোধের অস্বীকৃতিতে ও আঙ্গিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে নিরালাকে একদা প্রবল সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, আজো জের

তার মেটেনি। নিরালার কবিতা একই সঙ্গে সঙ্গীতপ্রাণ ও চিত্ররূপময়। প্রচলিত ছন্দশৃঙ্খলা ভেঙে হিন্দী কাব্যে ইনিই প্রথম গদ্যকবিতার প্রবর্তন করেন। এবং এঁর গদ্যকবিতা শুধু ছন্দমুক্তির নয়, মেজাজের দিক দিয়েও সার্থকতার স্বাক্ষর বহন করে ঃ

আজ ঠণ্ডক অধিক হৈ।
বাহর ওলে পড় চুকে হৈঁ,
এক হপ্তে পহলে পালা পড়া থা—
অড়হর কূল-কী-কূল মর চুকী থী,
হবা হাড়তক বেধ জাতী হৈ,
গেহুঁ কে পেড় এঁটে খড়ে হৈঁ,
খেতিহরোঁ মেঁ জান নহীঁ,
মনমারে দরবাজে কৌড়ে তাপ রহে হৈঁ
এক দুসরে সে গিরে গলে বাতেঁ করতে হুঁ,
কুহরা ছায়া হুয়া।

—আজ ঠাণ্ডা কিছু বেশি
বাইরে পড়েছে শিল
হাপ্তাখানেক আগে ঝরেছে বরফ
অড়রের কুল কে কূল গেছে মরে
হাওয়া হাড়ের ভিতর যাচ্ছে বিঁধে
গমের চাড়া তেবড়ে রয়েছে খাড়া
কিসানদের ফুর্তি নেই মনে
মনমরা—দরজায় আগুন পোয়াচ্ছে
এ ওর সাথে নিচুগলায় কইছে কথা
ছেয়েছে কুয়াশা।

(অনুঃ ঐ)

তবে অতিরিক্ত দার্শনিক মতবাদের—বিশেষ করে অদ্বৈতবাদের—প্রভাবে নিরালার কবিতা অনেক-সময় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। 'অনামিকা', 'পরিমল' 'গীতিকা' 'তুলসীদাস' ইত্যাদি এঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ।

নীরব সন্ধ্যা মেঁ প্রশান্ত
ডুবা হৈ সারা গ্রামপ্রান্ত
পত্রোঁকে আনত অধরোঁ পর সো গয়া নিখিল বন কা মর্মর
জ্যোঁ বীণা কে তারোঁ মেঁ স্বর।
খগ কূজন ভী হো রহা লীন, নির্জন গোপথ অব ধূলিহীন
ধূসর ভুজঙ্গ সা জিহ্বা ক্ষীণ।

—সুমিত্রানন্দন পন্তের কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি। পড়লেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পন্তজীর ওপর কি পরিমাণ। রবীন্দ্রনাথের ঋণ পন্তজীও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এঁর প্রথম কাব্য-সংকলন 'বীণা' রবীন্দ্রপ্রভাবে আচ্ছন্ন। পরে 'পল্লব'-এ এঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে-বেশি যুগসচেতন পন্ত। পন্তজীর ছায়াবাদের যুগের কবিতায় ছিল বস্তুজগৎ-নিরপেক্ষ দার্শনিকতার স্বাক্ষর, কিন্তু শেষদিকে এঁর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। 'গুঞ্জন'-এর মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন প্রথম সূচিত হয়—'যুগান্ত', 'যুগবাণী' ও 'গ্রাম্যা-'য় তা পূর্ণতা লাভ করে। খড়ীবোলীতে পন্তজী ব্রজভাষার মাধুর্য সঞ্চারিত করেন।

শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা শুধু ছায়াবাদী যুগের নন, আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠতম মহিলা কবি—আধুনিক হিন্দী-কাব্যজগতে মীরাবাঈ নামে পরিচিত। আর, পণ্ডিত শুক্লর মতে ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে এঁর আসন পুরোভাগে। একমাত্র এঁরই কবিতায় সমসাময়িক বাঙালি কবিদের কোন প্রভাব পড়েনি। তার কারণ, ইনি বাংলা জানেন না। সেজন্যে আপসোসেরও এঁর অবধি নেই। (মহাদেবী বর্মার কবিতা-সংগ্রহ: 'আধুনিক কবি' সিরিজের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

প্রাচীন হিন্দী ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য শ্রীমতী বর্মার প্রেরণার উৎস। একটি প্রেমবিদীর্ণ হৃদয়ের সুগভীর বেদনা ও ব্যর্থতার সুর এঁর সমগ্র কাব্যসাহিত্যে প্রবহমান:

কৌন আয়া থা, ন জানে স্বপ্ন মেঁ মুঝকো জগানে
যাদ্ মেঁ উন অঙ্গুলিয়োঁ কো হৈ মুঝে পর যুগ বিতানে
রাত কে উর মেঁ দিবস কী চাহ কা শর হুঁ।......

শূন্য মেরা জনম থা, অবসান হৈ মুঝকো সবেরা
প্রাণ আকুল কে লিয়ে সঙ্গী মিলা কেবল আঁধেরা,
মিলন কা মত নাম লে, মৈঁ বিরহ মে চির হুঁ
শলভ ! মৈঁ শাপময় বর হুঁ।

শ্রীমতী বর্মার কাব্যাদর্শে আশাবাদের স্বাক্ষর নেই—কিন্তু নৈরাজ্যবাদীও তাঁকে বলা যায় না। ব্যর্থতার মধ্যেই যেন এঁর কবিমন ও জীবন খুঁজে পেয়েছে পরম সার্থকতা। 'নীহার', রশ্মি', 'নীরজা,' 'সন্ধ্যাগীত' ও 'দীপশিখা' এঁর স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ।

পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদী ও পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্মা দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান লিখে এযুগে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারী চৌহানের 'ঝান্সী কী রাণী'-ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভগবতীচরণ বর্মা ও মোহন-লাল মাহাতো এ-সময়কার তিন শক্তিশালী কবি। তবে, ছায়াবাদী কবি এঁরা কেউই নন। বরং 'ভঁইসাগাড়ি'র মত বাস্তবধর্মী কবিতা লিখে ভগবতীচরণ বর্মাই প্রথম ছায়াবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

প্রগতিবাদের যুগ

ছায়াবাদী কবিদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দুর্গে তিরিশ দশকের শুরুতেই ফাটল ধরে, ১৯৩৪-৩৫ সালে এই যুগের অবসান হয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম, বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা বৃদ্ধি, মার্কসবাদ ও ফ্রয়েড-এ্যাডলার-য়ুং-এর মনোবিকলনতত্বের প্রসার, লাক্ষনৌ-কংগ্রেসে জওহরলালের নতুন নীতি, শ্রীঅরবিন্দ ও বের্গসেঁার দার্শনিক মতবাদের এবং সমসাময়িক বিদেশি ও বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে কবিমানস এসময় প্রচণ্ড ভাবে নাড়া খায়। ফলে আরেক যুগের অভ্যুদয়।

ছায়াবাদের পরবর্তী যুগকে দুটি ভাগে ভাগ করা চলে—প্রগতিবাদ, ও পরীক্ষাবাদ বা প্রতীকবাদ।

প্রগতিবাদী কবিরা মার্কসীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। পন্ত ও নিরালা—ছায়াবাদের যুগের এই দুজন বিশিষ্ট কবি প্রথমে প্রগতি আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমদিকে মার্কসবাদী কবি হিশেবে—কোন কোন

মহলে—পরিচিত হলেও পন্তজীর মার্কসবাদ শেষপর্যন্ত গান্ধী-বিবেকানন্দের উদার মানবিকতায় পরিণত হয়। এবং ১৯৪৪ সালের পরে তিনি আরো পিছু হটে ফের ছায়াবাদের যুগেই ফিরে গিয়েছেন—'স্বর্ণকিরণ,' 'স্বর্ণধূলি' ও 'উত্তরা' তার নিদর্শন। নিরালার মধ্যেও মৌলিক কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। তবে ছন্দোবৈচিত্র্যে, চমকপ্রদ উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে এবং অপ্রিয় সত্যের বিদ্রূপতীক্ষ্ণ উচ্চারণে সত্যিই ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এ-যুগের বামপন্থী শক্তিশালী কবি হিশেবে 'দিনকর', রাঙ্গেয় রাঘব, সুমন, ভারতভূষণ অগ্রবাল, সর্দার জাফরী (ইনি প্রধানত উর্দু কবি), কেদারনাথ অগ্রবাল, নাগার্জুন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সুমনের :

ঘর বাহর সব আগ লগ রহী
স্থলগ রহে বন উপবন
তন জলতা হৈ, মন জলতা হৈ
জলতা ধন জন জীবন।

অথবা, দিনকরের :

'দুধ দুধ!' ও বৎস! মন্দিরোঁ
মে বহরে পাষাণ যহাঁ হৈ।
'দুধ দুধ' তারে, বোলো, ইন
বাচ্চোঁকে ভগবান কহাঁ হৈ।......
হটো ব্যোম কে মেঘ পন্থ সে
স্বর্গ লুটনে হম আতে হৈঁ
'দুধ দুধ'! ও বৎস! তুমহারা
দুধ খোজনে হম জাতে হৈ।

মধ্যে এ-যুগের যন্ত্রণা ও নবজীবনের অঙ্গীকার সোচ্চার। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়েও আজকের কবিরা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। যথা কেদারনাথের :

রাজ করোজী রাজ করোজী দিল্লীকে দরবার মেঁ
গান্ধীবাদী আদর্শোঁ কে সন্তোঁ কো কিলকার মেঁ।
সুন্দর সুন্দর সপনে দেখো শাসন-শয়ন গার মেঁ
সোনে চাঁদী কী
খন্ খন্ মেঁ, কালে-চোরবাজার মেঁ।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় কবি অজ্ঞেয় (এস এইচ বাৎস্যায়ন—আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক)। বহির্জগৎ নয়, মানুষের অবচেতন মনই কাব্যের উপজীব্য এঁদের। প্রধানত প্রতীক বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে এঁরা নিজেদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন। শব্দ, ছন্দ ও আঙ্গিক সম্পর্কেও এঁদের দুঃসাহসিক পরীক্ষার অন্ত নেই। এঁরা বলেন : জীবন পরিবর্তনশীল, এবং কাব্যকলা যেহেতু জীবনমূল, অতএব তার পরিবর্তনও অনিবার্য। আজকের জীবন রুক্ষকঠোর, সামঞ্জস্যহীন, অর্থশূন্য, অসঙ্গতিতে পূর্ণ—অতএব কবিতাও এরকম হতে বাধ্য, হুবহু এই রকম। বাস্তবকে এঁরা পর্যবেক্ষণ করেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, কিন্তু অবচেতন মনে বাস্তবের জটিল প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলনকেই ভাষায়িত করেন কবিতায়। এঁদের গুরু এলিয়ট, পাউণ্ড, ফ্রয়েড। গিরিজাকুমার মাথুর, গজানন মুক্তিবোধ, প্রভাকর মাচবে, নেমিচন্দ্র জৈন ও শমসের বাহাদুর সিং এই গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কবি।

কথাসাহিত্য

হিন্দী কাব্যসাহিত্যের তুলনায় কথাসাহিত্য নিতান্তই অর্বাচীন। বছর তিরিশেক এর বয়েস মাত্র।

১৯২০ সাল পর্যন্ত হিন্দীতে উল্লেখযোগ্য কোন উপন্যাস রচিত হয়নি। ইংরেজি ও বাংলা উপন্যাসের অনুবাদই এই সময়কার মার্জিতরুচি পাঠকের মনের খিদে মিটিয়েছে। হিন্দীর প্রথম মৌলিক ঔপন্যাসিক হিশেবে অবিশ্যি দেবকীনন্দন ক্ষেত্রী ও কিশোরীলাল গোস্বামীর নাম করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্বল ভাষা, দুর্বলতর প্রকাশভঙ্গি এবং অবাস্তব ঘটনাবলীর সমাবেশে এঁদের রচনা আর-যাই-হোক সাহিত্য বাচ্য নয়। দেবকীনন্দন ক্ষেত্রীর 'চন্দ্রকান্তা সন্ততি' (চব্বিশখণ্ড) একদা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অধুনা অপাঠ্য। নাটকের দিক দিয়ে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রই প্রথম কিছুটা পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সাহায্য গ্রহণ করেন। তারপর পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর যুগেও কয়েকটি মন্দ-নয় নাটক রচিত হয়। কিন্তু শিল্পোত্তীর্ণ সার্থক নাটক সেগুলিকে বলা যায়না। প্রথম সার্থক নাট্যকার কবি-ঔপন্যাসিক জয়শঙ্কর প্রসাদ। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিশেবে তিনি পরিগণিত।

১৯২০ সালে মুন্সী প্রেমচাঁদের হিন্দী সাহিত্যে আবির্ভাব। এবং, শুধু হিন্দী উপন্যাসের স্রষ্টা নন, হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকও তিনি—'উপন্যাসসম্রাট' প্রেমচাঁদ।

সন-সময়ের হিশেবে প্রেমচাঁদ ছায়াবাদী যুগের লেখক। অর্থাৎ ছায়াবাদী সূচনা আর প্রেমচাঁদের আবির্ভাব সমসময়ে। মিল শুধু এইটুকু, অমিল কিন্তু আকাশ-পাতাল। সেদিন খ্যাতনামা প্রত্যেক কবি যখন যুগ-জীবনের জটিল দ্বন্দ্বকে পাশ কাটিয়ে অতীন্দ্রিয় এক রহস্যবাদের কল্পস্বর্গ নির্মাণে আত্মমগ্ন, প্রেমচাঁদ তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রুক্ষ-কঠোর বাস্তবের নিকরুণ চিত্র তুলে ধরলেন।

ছায়াবাদী যুগের কথাসাহিত্যে প্রেমচাঁদের প্রভাব স্পষ্ট। এ-যুগে তাই দুটি ধারার পাশাপাশি প্রবাহ প্রত্যক্ষ: কবিতায় রহস্যবাদ, কথাসাহিত্যে যাথার্থ্যবাদ, মানে বাস্তববাদ। এমন-কি, বিশিষ্ট ছায়াবাদী কবি জয়শঙ্কর প্রসাদকেও উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। জয়শঙ্কর প্রসাদ অবিশ্যি প্রেমচাঁদ-প্রভাবিত নন। দুজনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও মৌলিক। প্রথমজন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনন্যদৃষ্টি, দ্বিতীয়ের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজনীন।

কথাসাহিত্যের প্রথম যুগ

প্রেমচাঁদ, জয়শঙ্কর প্রসাদ, বিশ্বম্ভর-নাথ শর্মা 'কৌশিক,' বৃন্দাবনলাল বর্মা, পাণ্ডে বেচন শর্মা 'উগ্র' ও জৈনেন্দ্রকুমার এযুগের বিশিষ্ট শিল্পী।

হিন্দীতে লেখার আগে প্রেমচাঁদ উর্দুতে লিখতেন। এবং উর্দুতেও আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রেমচাঁদের উর্দু-হিন্দীর মধ্যে প্রভেদ অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ। সামান্য-কিছু অদল-বদলের সাহায্যেই ইনি নিজের বইয়ের ভাষান্তর সাধন করতেন। প্রেমচাঁদের হিন্দী উর্দুপ্রধান, জয়শঙ্করপ্রসাদের সংস্কৃত-বহুল। ভাষার দিক দিয়েও দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈসাদৃশ্য তাৎপর্যপূর্ণ।

হিন্দীতে প্রেমচাঁদের প্রথম উপন্যাস পণপ্রথা ও বারাঙ্গনা জীবনের শোচনীর ট্রাজেডী নিয়ে লেখা 'সেবাসদন'। এরপর তাঁর 'প্রেমাশ্রম', 'রঙ্গভূমি,' 'গবন', 'কর্মভূমি,' 'গোদান' প্রভৃতির উপন্যাস এবং 'কফন,' 'মানসরোবর,' 'প্রেম-পূর্ণিমা,' 'প্রেমপঞ্চমী' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দী উপন্যাসগুলিতেও তা পুরোমাত্রায় বর্তমান। অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

শুধু উপন্যাস নয়, হিন্দী সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোট গল্প রচয়িতাও প্রেমচাঁদ। বিশিষ্ট সমালোচকদের মত শিল্পী হিশেবে প্রেমচাঁদ উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পেই অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

জয়শঙ্করপ্রসাদের 'কঙ্কাল' ও 'তিতলী' সমাজ-সংস্কারমূলক উপন্যাস। ঘটনাপ্রধান। এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে, প্রথম বইটিতে বর্তমান সমাজের নগ্ন চিত্র আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক। জয়শঙ্করপ্রসাদকে এই জন্যে যাথার্থ্যবাদী কথাশিল্পী বলা হলেও আসলে ইনি আদর্শবাদী লেখক। চরিত্রানু-যায়ী সংলাপ প্রয়োগের দরুণ প্রেমচাঁদের গল্প-উপন্যাসে বাস্তব আবহ গড়ে ওঠে, জয়শঙ্করপ্রসাদের সব চরিত্রই নিজ নিজ শিক্ষাদীক্ষা ও পরিবেশ-পার্থক্য সত্বেও কথা বলে একই ভাষায়, একই ভঙ্গিতে। অধিকন্তু, কবি জয়শঙ্করপ্রসাদের উপস্থিতিও তাঁর গল্প-উপন্যাসে মাত্রাতিরিক্ত। 'ছায়া' ও 'আকাশ দীপ'-এ সংকলিত গল্পগুলি তো পুরোপুরি গীতিকবিতাধর্মী। এর একটি অসমাপ্ত উপন্যাস মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে—'ইরাবতী,' ঐতিহাসিক উপন্যাস।

কৌশিকজীর 'মা' ও 'ভিখারিণী' একদা পাঠকসাধারণের অকৃত্রিম সমাদর লাভ করেছিল। ইনি প্রেমচাঁদের সমধর্মী, তাঁরই মত সামাজিক-গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার। তবে প্রেমচাঁদের দৃষ্টির গভীরতা ও প্রসারতা কৌশিকজীর নেই। বৃন্দাবনলাল বর্মা কয়েকটি সামাজিক উপন্যাস লিখলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গড়কুণ্ডার' এঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। শুধু এঁর নয়, হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গড়কুণ্ডার'। বুন্দেলখণ্ডের রক্তাক্ত ইতিহাস বইটির উপজীব্য। বর্মাজীর আর-একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ঝাঁন্সী কী রাণী লক্ষ্মীবাঈ'। জনশ্রুতি, দশ বছরের একনিষ্ঠ সাধনায় বর্মাজী এই বই লেখেন।

ইতিহাস-আনুগত্য বজায় রেখেও যে সার্থক উপন্যাস রচনা সম্ভব—বর্মাজীর বইগুলি তার নিদর্শন।

এ-যুগে প্রেমচাঁদের পরেই যিনি সবচেয়ে-বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, তাঁর নাম পাণ্ডে বেচন শর্মা উগ্র। অমিত শক্তিধর লেখক, রচনাশৈলী অনুপম। সমাজের অন্ধকার দিকের, নেপথ্যজীবনের কুৎসিত নগ্ন চিত্র ইনি চরম দুঃসাহসের সঙ্গে তুলে ধরেন। অনেকে এঁকে লরেন্সের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এটা আংশিক সত্যি—লরেন্সের কবিদৃষ্টি ও বিশিষ্ট জীবনবোধের অধিকারী ইনি নন। উগ্রজীর লেখার স্বাদ তিক্ত, কটুকষায়। বাস্তববাদী, তবে সে-বাস্তববাদ ফটোগ্রাফিক। ফলে এঁর লেখা অনেক সময় নিছক পর্নোগ্রাফিতে পরিণত। অপ্রিয় সত্যের সুস্পষ্ট ঘোষণায় উগ্রজী একদা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। 'চন্দ্ হাসিনোকে খতুত' ও 'বুধুয়া কী বেটি' এঁর দুটি উল্লেখ-যোগ্য বই—প্রথমটি পত্রাকারে রচিত প্রেমের কাহিনী, দ্বিতীয়ের উপজীব্য এক অস্পৃশ্য বালিকার জীবন। 'দিল্লীকা দালাল' 'ঘণ্টা', 'চুম্বন', 'সরকার তুমহারি আঁখোমে' এঁর অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ।

হিন্দী সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের প্রবর্তক হিশেবে জৈনেন্দ্রকুমারের নাম স্মরণীয়। ঘটনার ঘনঘটার বদলে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের দিকেই ঝোঁক এঁর সমধিক। তার প্রমাণ 'পরখ', 'সুনীতা', 'ত্যাগপত্র'। বিশেষ করে, শেষোক্ত বইটি সাম্প্রতিককালে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দী সাহিত্যে 'গোদান'-এর পরেই 'ত্যাগপত্র'র স্থান বলে কোন কোন সমালোচক অভিমতও প্রকাশ করেছেন। বলতে নেই, এটা নিছক অতিশয়োক্তি। নায়িকা স্বামীকে ভালোবাসে না, তাই তার ঘর করতে নারাজ হল, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইল। ব্যর্থ হল। জীবনের ব্যর্থতা নয়, ব্যর্থ জীবনকে মুখ বুজে মেনে নেওয়ার মধ্যেই 'ত্যাগপত্র'র ট্রাজেডী। রচনাশৈলীর দিক দিয়ে 'ত্যাগপত্র' নিঃসন্দেহে একটি সার্থক সৃষ্টি, কিন্তু অস্পষ্ট লেখকের বক্তব্য। সমাজের চেয়ে ব্যক্তিকে জৈনেন্দ্রকুমার প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্যার মূল যে মানুষের সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি—লেখক হয় তা জানেন না, কিম্বা জেনেও মানেন না। প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের পক্ষে এর একটাও বাঞ্ছনীয় নয়।

'সুনীতা', 'কল্যাণী' ও দীর্ঘবিরতির পর সম্প্রতি-প্রকাশিত 'সুভদ্রা'—এঁর

অন্যান্য উপন্যাস। 'সুভদা'য় বৈপ্লবিক পরিবেশে এক বিপ্লবিনী ও ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবী নায়িকা শেষ পর্যন্ত পরিণত হল বিপ্লবী-প্রিয়ায়। বাস্তবতাবর্জিত নিছক এক রোমান্টিক কাহিনী ছাড়া আর-কিছু একে বলা চলে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম উল্লেখযোগ্য—ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী। যৌন অসন্তুষ্টি এঁর শিল্পসহায়। 'প্রেমপথ' ও 'পিপাসা'র উপজীব্য কর্তব্য ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব হলেও নারীদেহের দিকে, নারীর যৌন চেতনার বিশদ বর্ণনার দিকেই ঝোঁকটা শ্রীবাজপেয়ীর অত্যধিক। এঁর 'নিমন্ত্রণ'ও ব্যতিক্রম নয়, রাজনীতি-সমাজনীতির ভেজাল সত্বেও।

কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ

১৯৩৫-৩৬ সালে হিন্দী সাহিত্যে প্রগতিবাদী যুগের শুরু। কথাসাহিত্যে এ-সময় দুটি ধারার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়—তার ঐতিহাসিক পটভূমি ও হেতু বিশ্লেষণ প্রথমেই করা হয়েছে। প্রেমচাঁদের উত্তরাধিকারী হিশেবে একদল লেখক বাস্তবাদের দিকে ঝুঁকলেন। এ-বাস্তববাদের প্রকাশ অবশ্য বহুমুখী—সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ থেকে ফটোগ্রাফিক বাস্তববাদ। কিন্তু প্রেমচাঁদের মত প্রতিভার অধিকারী হওয়া দূরস্থান, এঁদের শিল্পদৃষ্টিও অনেকাংশে একপেশে। প্রেমচাঁদ সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে, তিনি *romanticized emotionalized, philosophized and in the end etherealized village life*—এ-অভিযোগ, হয়ত, কথঞ্চিৎ সত্যি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে রাখা দরকার—প্রেমচাঁদ কোন্ সময়ের ও কোন্ সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবেশের লেখক? কোন্ শ্রেণী থেকে তিনি উদ্ভূত? প্রেমচাঁদের জীবননিষ্ঠা তর্কাতীত, শিল্পবোধ জীবনমূল। কিন্তু এ-যুগের বাস্তববাদী লেখকরা মানসিক গঠনের দিক দিয়ে কিছু-পরিমাণে উৎকেন্দ্রিক, অনেক-পরিমাণে থিয়োরীসর্বস্ব। এঁদের নায়ক-নায়িকারা কতখানি রক্ত-মাংসের নরনারী, তাও ভাবনার বিষয়।

তবু, এই গোষ্ঠীর লেখকরা আর-যাই-হোন সমসাময়িক সমাজ-সংসারের দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও প্রগতিশীল সাহিত্যের লক্ষণ মিলবে

এঁদের রচনায়। যশপাল, উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক্‌, রামচন্দ্র তেওয়ারী, অমৃতলাল নাগর, নাগার্জুন প্রমুখ এই গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখক। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্বেও শক্তিশালী কথাশিল্পী হিশেবে ভগবতীচরণ বর্মার নামও স্মরণীয় এই সঙ্গে।

অন্যদিকে, জৈনেন্দ্রকুমারের ধারার জের টেনে আরেক দল লেখক মনোবিশ্লেষণ ও আঙ্গিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় কথাশিল্পী অজ্ঞেয় (শ্রী এস এইচ বাৎস্যায়ন) ও ইলাচাঁদ যোশী।

যশপাল নিঃসন্দেহে বর্তমান হিন্দী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। এক স্বতন্ত্র আসনের অধিকারী ইনি। এঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দিব্যা' অবশ্য আঙ্গিকের দিক দিয়ে তত সার্থক হয়নি, তবে বিষয়বস্তুর বিচারে 'দিব্যা' অভিনব—অজন্তার সমসাময়িক সমাজ-জীবনের চিত্র এই উপন্যাসে লেখক চিত্রিত করেছেন। 'দাদা কমরেড', 'পার্টি কমরেড' 'দেশদ্রোহী' ও 'মনুষ্য কে রূপ' যশপালে শক্তিমত্তার স্বাক্ষর বহন করে। লেখক স্পষ্টতই মার্কসীয় রাজনীতির সমর্থক। এই সমর্থন কখনো-সখনো স্থূল প্রচারকার্যের আকারেও দেখা দেয়, বাস্তবকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করবার জন্যে যৌনতার দিকেও অনেকসময় ইনি অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে থাকেন—এই দুটি ত্রুটি, মারাত্মক ত্রুটিই অবশ্য, সত্বেও ঘটনার কুশলী গ্রন্থনে, চরিত্রের জীবন্ততায়, পটভূমির বৈচিত্র্যে-বিশালতায়, এবং সুস্থ জীবনের অঙ্গীকারে যশপালের আসন জীবিত কথাশিল্পীদের পুরোভাগে।

উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক্‌ হিন্দী ও উর্দু উভয় ক্ষেত্রেই শক্তিমান লেখক হিশেবে স্বীকৃত। গল্প, উপন্যাস, একাঙ্কিকা—সবই লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল। তবে, মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিসিজম্ এখনো পুরোপুরি পরিহার করতে পারেননি। এঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গির্‌তী দীওয়ারেঁ' (পড়ন্ত দেওয়াল) এক নিম্নমধ্যবিত্ত পাঞ্জাবী যুবকের বিচিত্র জীবনাভিসারের কাহিনী। জীবিকা ও যৌন ক্ষুধার জটিল দ্বন্দ্বে নায়ক সদা উদ্‌ভ্রান্ত। লেখকের উদ্দেশ্য, সম্ভবত, প্রচলিত যৌন-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কিন্তু বস্তুত এই বইয়ে ঘটেছে মার্কস-ফ্রয়েডের গোঁজামিল। শিল্পসৃষ্টি হিশেবে বইটি কিন্তু মূল্যবান—কেউ কেউ একে ড্রেইজারের 'আমেরিকান ট্রাজেডী'র সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'গরম রাখ'।

ছায়াবাদী কাব্য-আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রথম যাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, ভগবতীচরণ বর্মা তাঁদের অন্যতম। এঁর 'ভঁইসাগাড়ি' একদিন বাস্তববাদী কবিদের মনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। কথাশিল্পী হিশেবেও বর্মাজী শক্তিধর। এঁর 'টেড়ে মেড়ে রাস্তে' আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের একটি উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাস। পিতা ও তিন পুত্র—এই চারিটি প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে এই বইয়ে রূপায়িত করেছেন। পিতা প্রাচীনপন্থী তালুকদার। তিন ছেলের একজন গান্ধীবাদী, একজন কমিউনিস্ট, আরেকজন সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু এ-ধরনের উপন্যাস রচনায় লেখকের দিক থেকে যে মতবাদ-নিরাসক্তির আবশ্যকতা অনিবার্য, এখানে তা অনুপস্থিত। গান্ধীবাদীর চরিত্র সৃষ্টি সার্থক, সন্ত্রাসবাদী বড়ো-বেশি রোমান্টিক—কমিউনিস্টদের প্রতি লেখকের গাত্রজ্বালা সুস্পষ্ট।

'আখিরী দাঁও' বর্মাজীর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ। স্বামীর নির্যাতনে অতীষ্ট এক গ্রাম্যবধূ কূলত্যাগ করল পরপুরুষের সাথে। এল বোম্বাই। অতঃপর, যথারীতি, প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা ও মেয়েটির অথৈ জলে পতন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল গ্রামের একটি যুবকের সঙ্গে। সে আশ্রয় দিল মেয়েটিকে, বিয়ে না করুক স্ত্রীর মর্যাদাও দিল। সুখী হল মেয়েটি। কিন্তু কী-যে মতিভ্রম মেয়েমানুষের! নামল সিনেমায়। অর্থ এল যশ এল, আর সেই সাথে ভাঙন ধরল সুখের নীড়ে। আর, তাজ্জব হয়ে মেয়েটি দ্যাখে—তার অভিনয় প্রতিভার নয়, দেহের অনুরাগী-ভক্ত সবাই। সুখপাঠ্য—এ ছাড়া বইটি সম্পর্কে আর কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা চলে না। অনেকের মতে বর্মাজীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চিত্রলেখা'। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এক রাজনর্তকীর কাহিনী। আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেইস'-এর সঙ্গে বইটির সাদৃশ্য চোখ এড়ায় না।

রামচন্দ্র তেওয়ারীর 'সাগর সরিতা ঔর আকাল' ও অমৃতলাল নাগরের 'মহাকাল' বাংলার দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে লেখা। বীভৎস ও মর্মান্তিক বাস্তবের যথাযথ প্রতিফলনের দিক দিয়ে 'মহাকাল'-এর স্থান প্রথমোক্ত বইয়ের উপরে হলেও বইটি শেষ করার পর পাঠকের মন ডুবে যায় গভীর হতাশায়। সমগ্র জীবনের প্রতিই সে তখন আস্থা হারিয়ে বসে। সেই হিশেবে 'সাগর সরিতা ঔর আকাল'-এর দাম বেশি। এতে শুধু ভাঙনের অবিকল চিত্রই নেই, এই ভাঙনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়াসও স্পষ্ট।

নাগার্জুন তাঁর 'বালচনামা'র উত্তর-বিহারের কৃষকজীবনকে তুলে ধরেছেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এ একটি বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী উপন্যাস।

অপর গোষ্ঠীর অগ্রণী লেখক অজ্ঞেয়র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শেখর—এক জীবনী'। আত্মজীবনমূলক কাহিনী ইতিমধ্যে দুটি খণ্ড বেরিয়েছে, তৃতীয়টি প্রকাশিতব্য। রচনাশৈলী ও আঙ্গিকের কুশলী প্রয়োগের মাপকাঠিতে অজ্ঞেয় বর্তমান হিন্দী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। বাইরের ঘটনাবলী নয়, তার মানসিক প্রতিক্রিয়াই লেখকের উপজীব্য। এর 'নদীকে দ্বীপ'ও অনুরাগী মহলে যথারীতি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। 'পরম্পরা' এঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

ইলাচাঁদ যোশী পুরোপুরি ফ্রয়েড-প্রভাবিত লেখক। শুধু প্রভাবিত নন, ফ্রয়েডের অন্ধ ভক্ত। 'নির্বাসিতা' এঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—নায়ক এক মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভারতীয় সাহিত্যে, সম্ভবত, এই প্রথম আণবিক বোমা আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়াকে উপন্যাসের উপজীব্য করা হয়েছে। এঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসই যৌন অবদমনের ফলে উদ্ভূত মানসিক বিকারের পটভূমিকায় রচিত। 'সন্ন্যাসী', 'পর্দে কী রানী'এবং 'প্রেত ঔর ছায়া' যোশীর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'প্রেত ঔর ছায়া'র নায়ক বাপের কাছ থেকে যখন জানল যে সে তাঁর বৈধ সন্তান নয়—ভেঙে পড়ল তার মানসিক ভারসাম্য, অস্বাভাবিক এক হীনমন্যতাবোধে ও গ্লানিতে মন তার ভরে গেল। গ্রন্থের শেষে পিতার উক্তি অযথার্থ প্রমাণিত হওয়ায় সে ফের হয়ে উঠল সহজ স্বাভাবিক মানুষ। 'পর্দে কী রাণী'-তে মানুষের জন্মগত সংস্কারের সঙ্গে অর্জিত শিক্ষার সংঘাতকে তুলে ধরা হয়েছে। নায়িকা শিক্ষিতা, মার্জিত-রুচি, সকলের স্নেহপ্রীতির পাত্রী। কিন্তু যে-মুহূর্তে জানা গেল যে এক গণিকার সন্তান সে, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল পরিস্থিতি। জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখকের নৈপুণ্য অনস্বীকার্য।

ডাঃ দেবরাজ ও ধরমবীর ভারতীও এই গোষ্ঠীর শক্তিমান লেখক। প্রুশ্ত, হাক্সলে, জয়েস, সাত্র এঁদের গুরুস্থানীয়। শহুরে শিক্ষিত মহলের সাহিত্যিক এঁরা।

এ-যুগের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিশেবে রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিশেষ করে, রাহুলজীর 'ভোলগা সে গঙ্গা' ও দ্বিবেদীজীর 'বাণভট্ট কি আত্মকথা' আধুনিক হিন্দী

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সমাজবিবর্তনের ইতিহাসকে মনোজ্ঞ কাহিনীর আকারে তুলে ধরা হয়েছে প্রথম বইটিতে। সমাজ সচেতন কথাশিল্পী ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ ঐতিহাসিকের আশ্চর্য মিতালীর উজ্জ্বল এক উদাহরণ এই বই। দ্বিবেদীর উপন্যাস সুপরিচিত সংস্কৃত কবি বাণভট্টকে নিয়ে রচিত। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে ও ধ্যানধারণার প্রকাশে লেখক এখানে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু হিন্দী নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাসের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

এ-ছাড়াও স্বল্প-খ্যাত প্রতিশ্রুতিবান লেখক হিশেবে রাঙ্গেয় রাঘব, নরোত্তমপ্রসাদ নাগর, অমৃত রায় (প্রেমচাঁদের পুত্র), অঞ্চল, বিষ্ণু প্রভাকর প্রভৃতি এবং লেখিকা হিশেবে উষাদেবী মিত্রা, কুমারী কাঞ্চনলতা সর্বরওয়ান, সুভদ্রা-কুমারী চৌহান ও সুমিত্রাকুমারী সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।

মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে হিন্দী কথাসাহিত্য যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে নিশ্চয় তা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু একটা মারাত্মক দুর্বলতা অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়ঃ কারণে-অকারণে নিজ নিজ মতবাদের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা। তারা যেন আগে থেকেই একটা বক্তব্য তৈরী করে রাখেন, তারপর যেনতেন প্রকারেন সেটাকে তুলে ধরতে পারলেই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন।—এ অভিযোগ আমার নয়, বিখ্যাত হিন্দী সমালোচক পান্নালাল পদুমলাল বক্সির।

নাট্যসাহিত্য

গল্প-উপন্যাসের তুলনায় নাট্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি কম। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের যুগে ভারতেন্দু স্বয়ং এবং শ্রীনিবাস দাস ও রাধাকৃষ্ণ দাস মৌলিক নাটক লিখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ এবং ইংরেজি নাটকের অক্ষম অনুকরণে রচিত নাটকগুলিই সেদিন অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাবে ও নিছক-ব্যবসায়ী পার্শি থিয়েটার কোম্পানীগুলির হাতে নাটক মঞ্চস্থ করার একচেটিয়া অধিকার থাকায় হিন্দী নাট্যসাহিত্য যুগের সঙ্গে এগিয়ে চলতে পারেনি।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জয়শঙ্কর প্রসাদ। 'রাজ্যশ্রী,' 'অজাতশত্রু,' 'স্কন্দগুপ্ত' 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি এঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। ইতিহাসই জয়শঙ্কর প্রসাদের নাটকের উপজীব্য। ঐতিহাসিক পরিবেশ-নির্মাণে, চরিত্র-চিত্রণে এবং বাইরের ঘটনাবলীর সঙ্গে কুশীলবদের মানসিক দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য বিধানে প্রসাদজী প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার। তবে এঁর নাটকে ঘটনার শ্লথগতি ও সংলাপের দৈর্ঘ্য অনেক সময় ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। দৃষ্টিভঙ্গির কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

হরিকৃষ্ণ প্রেমী (ঐতিহাসিক নাটক 'রক্ষাবন্ধন,' 'স্বপ্নভঙ্গ,'), গোবিন্দবল্লভ পন্থ ('রাজমুকুট,' 'বরমালা'), ও বেচন শর্মা উগ্র ('মহাত্মা ইসা') প্রসাদজীর যুগের বিশিষ্ট নাট্যকার। হিন্দী সাহিত্যে ইবসেন-শ'র অনুকরণে প্রথম নাটক রচনার কৃতিত্ব লক্ষীনারায়ণ মিশ্রর। একাঙ্কিকায় রামকুমার বর্মা ও সুদর্শন শক্তির পরিচয় দেন। তবে সার্থক সামাজিক নাটক ছায়াবাদের যুগে লেখা হয়নি।

কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে জয়শঙ্কর প্রসাদের মত শক্তিধর নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া না গেলেও এযুগের নাট্যকাররা শুধু অতীত ইতিহাসকে উপজীব্য করেই লেখেননি, সমসাময়িক ও সামাজিক রাষ্ট্রিক সমস্যাবলীও তাঁরা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এর প্রধান কৃতিত্ব গণনাট্য সঙ্ঘ ও বিভিন্ন অঞ্চলের অপেশাদার নাট্যসমিতিগুলির।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত উপেন্দ্রনাথ আশ্‌কের 'তুফান সে পহ্‌লে' সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ হিন্দী নাটক হিশেবে পরিগণিত। শেঠ গোবিন্দ দাস ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক অনেক লিখেছেন, খ্যাতিমানও হয়েছেন—কিন্তু আঙ্গিকগত ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার এঁকে বলা যায় না। উদয়শঙ্কর ভাট জয়শঙ্কর প্রসাদের পদাঙ্ক অনুসারী। পুরাণ ও ইতিহাসই এঁর উপজীব্য। প্রসাদজীর দোষগুণ এঁর মধ্যেও সমভাবে বর্তমান।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় একাঙ্কিকার সমৃদ্ধি আশাতীত। আসলে, আধুনিক হিন্দী নাট্যসাহিত্য বলতে একাঙ্কিকাই বোঝায়। এই প্রসঙ্গে রামকুমার বর্মা ('পৃথ্বীরাজ কি আঁখে' 'রেশমী টাই'), শেঠ গোবিন্দদাস ('সপ্তরশ্মি', 'পঞ্চভূত'), উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক্ ('দেওতা কি ছাঁয়ামেঁ'), বৃন্দাবনলাল বর্মা ('তুফানো কে বীচ'), ভুবনেশ্বর প্রসাদ ও বিষ্ণু প্রভাকরের নাম সবিশেষ স্মরণীয়।

অন্যান্য ছায়াবাদের যুগ আধুনিক হিন্দী কাব্য ও কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধতম অধ্যায়, কিন্তু সে-তুলনায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য সৃষ্টি এ-যুগে হয়নি। এ-যুগের একটি নতুন অবদান কাব্যকথিকা। রবীন্দ্রনাথ ও হুইটম্যানের অনুসরণে রচিত রায় কৃষ্ণদাসের 'সাধনা' ও 'ছায়াপথ,' বিয়োগ হরির 'আর্তনাদ' ও চতুরসেন শাস্ত্রীর 'অন্তস্তল'-এর নাম এই প্রসঙ্গে করা যায়। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল, বাবু শ্যামসুন্দর দাস, লালা ভগবান দীন, পণ্ডিত অযোধ্যা সিং প্রমুখ লেখকরা ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র ও প্রাচীন কবিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন—কিন্তু আধুনিক সমালোচনারীতির পরিচয় এঁদের সকলের মধ্যে নেই। ছায়াবাদী কাব্য ও কাব্যআঙ্গিক সংক্রান্ত আলোচনায় পণ্ডিত সুমিত্রানন্দন পন্ত, জয়শঙ্কর প্রসাদ ও নিরালাজীর নাম স্মরণীয়।

অতি-আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে শক্তিমান প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিশেবে সীয়ারাম শরণ গুপ্ত, গুলাব রায়, পান্নালাল পদুমলাল বক্সি, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, বনারসীদাস চতুর্বেদী, রামকৃষ্ণ বেণীপুরী, ডাঃ রামবিলাস শর্মা ও অজ্ঞেয়র আসন পুরোভাগে। গবেষণামূলক সাহিত্যে অধ্যাপক বিশ্বনাথ প্রসাদ মিশ্র, পণ্ডিত চন্দ্রাবলী পাণ্ডে, ডাঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত ও দীনদয়াল গুপ্ত এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণে ডাঃ কেশরীনারায়ণ শুক্ল শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

মৈথিলী

মৈথিলী উত্তর-বিহারের তথা দক্ষিণ-বিহারের—অংশত ভাগলপুর, মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগনার—মাতৃভাষা। এবং নেপালের মাতৃভাষা ও সরকারি ভাষার মর্যাদাও মৈথিলী একদা লাভ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই, খাস মিথিলায় কথ্যভাষা হিশেবে প্রচলিত থাকলেও বিশেষ-কোন সাহিত্যিক কৌলীন্য মৈথিলীর ছিল না। যদিচ ঋগ্বেদের ঋষিদের যুগ থেকেই সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিশেবে মিথিলার নাম প্রখ্যাত, তবু অতীতে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই চর্চা করতেন সংস্কৃতের। আর সংস্কৃত কিনা দেবভাষা, তাই জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ সেদিন সংস্কৃত-চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এই অন্ত্যজদের মধ্যেও কিন্তু বিদগ্ধ জনের অভাব ঘটেনি। প্রধানত তাঁদেরই সাধনায় মৈথিলী সাহিত্যের সূত্রপাত। কোন কোন সংস্কৃত পণ্ডিতও অবশ্য মাতৃভাষার এক-আধটু চর্চা করতেন। তবে সেটা তাঁরা করতেন নিছক অবসর-বিনোদনের উদ্দেশ্যে। অতএব জনান্তিকে। তবু মৈথিলী সাহিত্যে এঁদের দানও নগণ্য নয়।

সংস্কৃতের এই রকম প্রবলপ্রতাপ প্রাধান্য সত্বেও প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যের, বিশেষ করে, মৈথিলী কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি রীতিমত বিস্ময়কর। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার কবিকুলের ওপর তার প্রভাব অপরিমেয়। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পরিচয় বাঙালির কাছে নিষ্প্রয়োজন। চণ্ডীদাসের ওপর বিদ্যাপতির প্রভাবের কথা বিদ্বজ্জনবিদিত। বিদ্যাপতির কবিতা পাঠে চৈতন্যদেবের ভাববিহ্বলতার কথা কে জানেন! ডাঃ সুনীতি চাটুয্যের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

Bengali Scholars would come back home after finishing their studies in Mithila not only with Sanskrit in their head, but also with Maithili songs on their lips—Songs of Vidyapati, and also probably by his predecessors and his successors. These were adopted by Bengali people.······The

Maithili lyric similarly naturalised itself in Assam and in Orissa in the 15th century. (4th All-India Oriental Conference Proceedings).

প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্য মূলত সংস্কৃত প্রভাবান্বিত। প্রথমদিকে মৈথিলী, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে নাটক রচিত হত। প্রেম ও ভক্তিই ছিল কাব্যের প্রধান, শুধু প্রধান নয় একমাত্র সুর। বাস্তব-নিরপেক্ষ এই সাহিত্য-ঐতিহ্য মিথিলায় নিজস্ব একটি ভাবপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার ছোঁয়ায় নবজাগৃতির সূচনা। কিন্তু অতীতের ভাবপরিমণ্ডল থেকে মৈথিলী সাহিত্যের মুক্তি আজও সম্পূর্ণ হয়নি।

বিদেহরাজ জনক থেকে দ্বারবঙ্গ-রাজ (দ্বারভাঙ্গা)—অর্থাৎ বরাবর রাজদরবারই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। অবিশ্যি রাজদরবারে কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেরই চর্চা হত। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ (রাজত্বকাল ১৮৮০—৯৮) নিজে সংস্কৃতিবান পুরুষ ছিলেন, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীলও। তিনি ও তাঁর অনুজ স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর সর্বপ্রথম মিথিলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। প্রধানত এঁদেরই অকৃত্রিম প্রেরণায় ও সক্রিয় সহায়তায় মৈথিলী সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হল। চন্দা ঝা, মুরলীধর ঝা, পরমেশ্বর ঝা, জীবন ঝা, রঘুনন্দন দাস, স্যর গঙ্গানাথ ঝা, বিন্ধ্যনাথ ঝা, গণনাথ ঝা প্রমুখ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শক্তিধর লেখকদের আবির্ভাব ঘটল। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজনকে সাহিত্যে দিকপাল বললেও অত্যুক্তি হয় না। মৈথিলী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মিথিলায় ও মিথিলার বাইরে স্থাপিত হল কয়েকটি সংস্কৃতিকেন্দ্র। তার মধ্যে কাশী, দ্বারবঙ্গ, জয়পুর ও আজমীঢ়ের কেন্দ্রগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি কেন্দ্র থেকে একটি করে সাহিত্য-পত্রিকার প্রকাশনও শুরু হল নতুন আন্দোলনের মুখপত্র হিশেবে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকেই মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করে এলেও, এমন-কি মাতৃভাষার উন্নতির জন্যে মহারাজাধিরাজ স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর প্রদত্ত প্রচুর অর্থের অপব্যবহার করলেও—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এ-ব্যাপারে তার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলী ভাষার জন্যে একটি 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে স্বতন্ত্র ভাষা হিশেবে মৈথিলী এম-এ'র

পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়। আধুনিক যুগে মৈথিলী সাহিত্যের আত্মবিকাশে স্তর আশুতোষ, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ডাঃ স্থনীতি চাটুয্যের দান অশেষ—মৈথিলীরাই একথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে থাকেন। কলকাতাতেই প্রথম এক উন্নততর ধরনের মৈথিলী লিপি আবিষ্কৃত ও কয়েকটি মূল্যবান প্রাচীন সাহিত্যের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে প্রাচীনতম মৈথিলী গদ্যসাহিত্য জ্যোতিশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনারত্নাকর'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ স্থনীতি চাটুয্যে ও পণ্ডিত বাবুয়াজী মিশ্র গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

অধুনা বাংলা, হিন্দী আদি অন্যান্য উত্তর-ভারতীয় সাহিত্যের মত আধুনিক মৈথিলী সাহিত্য সমৃদ্ধ না হলেও, সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অগ্রগতির স্বাক্ষর স্পষ্ট।

কাব্যসাহিত্য

আধুনিক কাব্যসাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন চন্দা ঝা—এই শতাব্দীর শুরুতে। কবি, সঙ্গীতশিল্পী ও সংস্কৃতবিদ পণ্ডিত হিশেবে চন্দা ঝা নিজস্ব একটি যুগের স্রষ্টা। 'মিথিলীভাষা-রামায়ণ' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। আঙ্গিক ও রচনাশৈলীতে সংস্কৃতের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু ভাষা সহজ সরল অনাড়ম্বর। মৈথিলীভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রথম প্রকাশ এই বইটিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষার মাধুর্যে ও ছন্দের ঝঙ্কারে বইটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এবং আজও, প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও, সে-জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ। 'চন্দ্রপদ্যাবলির' কবি হিশেবেও ইনি স্মরণীয়। এঁর 'মহেশবাণী' সহস্রাধিক ভক্তিমূলক গীতি-কবিতার সংকলন। মিথিলার ঘরে ঘরে এগুলি গীত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে 'ভক্তি' কবি হিশেবে চন্দা ঝার স্থান বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পাশে।

হর্ষনাথ ঝা, জীবন ঝা, মুন্সী রঘুনন্দন দাস, লালদাস, সীতারাম ঝা, বিন্ধ্যনাথ ঝা, গণনাথ ঝা, যদুনাথ ঝা, ছেদী ঝা ও গঙ্গাধর মিশ্র এযুগের অন্যান্য শক্তিশালী কবি। মুন্সী রঘুনন্দন দাসের 'সুভদ্রাহরণ' তেরটি সর্গে সমাপ্ত এক মহাকাব্য—

আধুনিক মৈথিলী কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কাঠামো, রচনাশৈলী বর্ণনাভঙ্গি সবই ঐতিহ্য-অনুকারী—কিন্তু মিথিলার মাটি ও মেজাজের সঙ্গে মিল তার অন্তরঙ্গ। মুন্সীজীর খণ্ডকাব্য 'বীর-বালক'-এর নামও উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে। অভিমন্যুর জীবনকে ভিত্তি করে এত যে বীররসের সৃষ্টি তিনি করেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষেই সম্ভব। লালদাস প্রধানত পৌরাণিক কথা-কাহিনীগুলিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যেই কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এঁর রচনায় কাব্যশক্তির বিশেষ পরিচয় না থাকলেও প্রথম যুগের অন্যতম জনপ্রিয় কবি তিনি নিঃসন্দেহে। এঁর 'পতিব্রতাচার', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'চণ্ডীচরিত', 'সাবিত্রী-সত্যবান কথা', 'মৈথিলী-রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ ও নারীসমাজে আজও সাগ্রহে পঠিত হয়ে থাকে। এঁরই সমধর্মী লেখক গুণবন্ত লালদাস। তবে ইনি অধিকতর কাব্যশক্তির অধিকারী। বিন্ধ্যনাথ ঝা ও গণনাথ ঝা মূলত লীরিক কবি—অতীন্দ্রিয় প্রেম ও ভগবৎভক্তিই প্রধান উপজীব্য এঁদের কাব্যের। এযুগের কবিরা কাব্যক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও সার্থক কবিতার স্রষ্টা সকলেই।

কাব্যসাহিত্যে নতুন পথের পথিকৃৎ ভুবনেশ্বর সিংহ। পুরনো চিন্তাধারা, রচনাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গির গতানুগতিকতাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন: যে-কোন বিষয় ও যে-কোন ভাবকে আশ্রয় করে সার্থক কবিতা রচনা সম্ভব। এবং কাব্যক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির দামই সবচেয়ে বেশি। নিজের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বিভূতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা তিনি বার করেন। ভুবনেশ্বর ঐতিহ্য-বিরোধী ছিলেন না, এমন-কি পূর্বসূরীদের অনুসরণে বহু ভক্তিমূলক কবিতাও তিনি রচনা করেছেন—তবে সমসাময়িক সমাজ-মানসে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল, ভুবনেশ্বর সিংহই প্রথম তাকে রূপায়িত করে তোলেন। সেই হিশেবে অতি-আধুনিক কবিদের পুরোভাগে এঁর আসন।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সীতারাম ঝা। এঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ শক্তি রয়েছে, কাব্যের অলঙ্কারিক দিকের ওপর মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের বদলে ভাষার লালিত্য ও সারল্যের প্রতিই ইনি বেশি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। তবে এঁর অধিকাংশ কবিতাই ছোট ছোট। মৈথিলী কাব্যসাহিত্যে আজো যখন মহাকাব্য-খণ্ডকাব্যের যুগ চলেছে তখন সীতারাম

ঝার মত একজন প্রতিভাধর কবি খণ্ড কবিতার গণ্ডিতেই আবদ্ধ—ব্যাপারটা বিস্ময়ের বই কি! অনুপ মিশ্র মৌলিক কবিতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারলেও 'মেঘনাথ বধ'-এর অনুবাদক হিশেবে স্মরণীয়নাম। বদ্রীনাথ ঝা বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং কাব্যক্ষেত্রে সংস্কৃত রীতির অনুসারী। বাইশ সর্গে সমাপ্ত 'একাবলী পরিণয়' মহাকাব্য এঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ইশানাথ ঝা কবি ও নাট্যকার। দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক এবং একমাত্র ইনিই ভাব ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতির শৃঙ্খল ভেঙে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। অনেকের মতে, সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ইশানাথ ঝা সর্বশ্রেষ্ঠ। 'মাল্য' এঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন।

এযুগের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিবান কবি হিশেবে কাশীকান্ত মিশ্র, কাঞ্চীনাথ ঝা, বৈদ্যনাথ মিশ্র, চন্দ্রনাথ মিশ্র প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। এঁদেরই সম্মিলিত প্রয়াসে মৈথিলী কাব্যসাহিত্য আজ নতুন পথে মোড় নিচ্ছে।

কথাসাহিত্য

বাংলা ও হিন্দীর অনুবাদের মধ্য দিয়ে মৈথিলীসাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব এবং শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের অনুবাদ ইতিমধ্যে হয়েছে। বিশেষ করে, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'আনন্দমঠ' ও রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'-র অনুবাদ ছিল প্রথম যুগের লেখকদের প্রেরণার উৎস।

প্রথম যুগের উপন্যাস হিশেবে জীবন মিশ্রের 'রামেশ্বর', ছেদী ঝার 'উর্মিলা' ও পুণ্যানন্দ ঝার 'মিথিলাদর্পণ'-এর নাম করা যেতে পারে। প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কাঞ্চীনাথ ঝার 'চন্দ্রগ্রহণ।' উপন্যাসের বদলে একে বরং বড় গল্প বলাই ভালো। চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে আগত এক হিন্দু তরুণীর মুসলমান গুণ্ডা কর্তৃক অপহরণ ও তার উদ্ধারের কাহিনী। বর্তমানে বইটির কোন আকর্ষণ না থাকলেও একদা মৌলিক সৃষ্টি হিশেবে 'চন্দ্রগ্রহণ'ই মৈথিলী সাহিত্যিকদের উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্লটের মৌলিকত্ব ও চরিত্র-চিত্রণের স্বাভাবিকতায় মৈথিলী সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস গঙ্গানন্দ সিংহের 'আগিলাহি' (চঞ্চলা তরুণী)। কালীচরণ ঝার 'নবরাত্র' নতুন ধরনের উপন্যাস হিশেবে চিহ্নিত। জমাটবাঁধা কোন

কাহিনী নেই, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে কয়েকটি লোকের অবান্তর কার্যকলাপই এর উপজীব্য। বক্তব্য ব্যঙ্গাত্মক। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। রচনার গুণে আগাগোড়া পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত থাকে। হরিনন্দন ঠাকুরের 'মাধবী-মাধব' দুটি তরুণ তরুণীর প্রেমজ বিবাহের মিলনান্ত কাহিনী। আধুনিক বাঙালি পাঠকের কাছে এটা হয়ত নিতান্তই গতানুগতিক মনে হতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে রাখা দরকার যে, মৈথিলী সমাজে প্রেমজ বিবাহ এক অচিন্তিত ও অভূতপূর্ব ব্যাপার—সেদিনও ছিল, আজও আছে।

আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী অধ্যাপক হরিমোহন ঝা। এঁর 'কন্যাদান' ও 'দ্বিরাগমন' প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষের কৌতুককর কাহিনী। দুটি বইয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। প্রথমটিতে লেখক মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও দ্বিতীয়টিতে বিকৃত শিক্ষাদীক্ষার কুফল বর্ণনা করেছেন। রচনার সুর হাল্কা হলেও বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।—বিশেষ করে, মিথিলার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। গঙ্গাপতি সিংহের 'সুশীলা' এক বালবিধবার ব্যর্থবঞ্চিত জীবনের বেদনাময় কাহিনী। যোগানন্দ ঝা 'ভলমানুষ'-এর মধ্যে দিয়ে উচ্চবিত্ত সমাজের কুলীনপ্রথার উপর তীব্র কষাঘাত করেছেন। শারদানন্দা ঝা 'জয়বার'-এ দরিদ্র ব্রাহ্মণসমাজের জীবনযাত্রার বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন।

এযুগের অন্যান্য শক্তিমান ঔপন্যাসিক হিশেবে বৈদ্যনাথ মিশ্র ('পারো'), উপেন্দ্র ঝা ('কুমার'), জনার্দন ঝা ('দ্বিরাগমন রহস্য') প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাসের তুলনায় ছোট গল্পের সমৃদ্ধি এবং লেখকের সংখ্যা অনেক বেশি। বাস্তব জীবনের সঙ্গে গল্প লেখকদের যোগাযোগও ঔপন্যাসিকদের তুলনায় নিবিড়তর। ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে বর্তমান মিথিলার সমাজজীবনের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় এবং সাহিত্যে সমাজচৈতন্যের পরিচয় ছোট গল্পেই অধিকতর স্পষ্ট। আঙ্গিকগত উৎকর্ষ বিধানেও ছোট গল্পলেখকরা তৎপর। আধুনিক ছোট গল্পে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবও কিছুটা পড়েছে, তবে তা সরাসরি আসেনি, এসেছে বাংলা ও হিন্দী কথাসাহিত্যের মাধ্যমে।

অধ্যাপক হরিমোহন ঝার 'প্রণম্যদেবতা' একটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন। হাল্কা হাসি ও ব্যঙ্গের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারই লেখকের উদ্দেশ্য। প্রগতিশীল মৈথিলী ছোট গল্পমাত্রই কম-বেশি সংস্কারবাদী ভাবধারার অনুপ্রাণিত।

মিথিলার সামাজিক পরিবেশে এই মনোভাব নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। তন্ত্রনাথ ঝা, হরিনন্দন ঠাকুর, জলেশ্বর সিংহ, যদুনন্দন শর্মা, গিরিধর ঝা, বুদ্ধিধারী সিংহ, গঙ্গানন্দ সিংহ, উপেন্দ্রনাথ ঝা, 'অমর' 'প্রবাসী,' মোহন ঝা, উমানাথ ঝা ও অধ্যাপক অমরনাথ ঠাকুর শক্তিমান ছোট গল্পলেখক হিশেবে খ্যাতিমান।

ভানুনাথ ঝা—সর্বপ্রাচীন নাট্যকার। এঁর 'প্রভাবতীহরণ' মৈথিলী ও সংস্কৃতের সংমিশ্রণে রচিত। প্রথম যুগের সব নাটকই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সংমিশ্রণে রচিত হত। বিশুদ্ধ মৈথিলীভাষায় প্রথম নাটক রচনা করেন জীবন ঝা। মিথিলার সমাজজীবনই ছিল এঁর নাটকের উপজীব্য। পরবর্তী যুগে মুন্সী রঘুনন্দন দাসের 'মিথিলা-নাটক' অশেষ জনপ্রিয়তা ও মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করে। এর সাহিত্যমূল্য অবশ্য খুব বেশি নয়। মিথিলার গৌরবময় অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবনতির চিত্র রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে নাটকটিতে। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ঈশানাথ ঝার বিবাহান্ত প্রহসন 'চিনি-ক লাড্ডু'র নাম উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রনাথ ঝা কয়েকটি সুখপাঠ্য একাঙ্কিকা রচনা করেছেন। তবে জনরঞ্জন বা আদর্শের সোচ্চার প্রচারের দিকে নাট্যকাররা এত বেশি নিবদ্ধদৃষ্টি যে সত্যিকারের আধুনিক নাট্যসাহিত্য বলতে আজো বিশেষ কিছু গড়ে ওঠেনি।

অন্যান্য

মৈথিলী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার সময় একটি কথা মনে রাখা দরকার—উত্তর-বিহার আজও কৃষিজীবী এলাকা। যন্ত্রসভ্যতার ঢেউ সেখানে এখনও ভালোরকম পৌঁছায়নি। ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার কিছুটা বিস্তার ঘটেছে বটে, কিন্তু নিতান্তই সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে। লেখকগোষ্ঠীর মানসজগতেও কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেনি। ফলে অতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পরীতি ও সমালোচনা পদ্ধতির সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন আধুনিক মৈথিলী কাব্য, কথা ও প্রবন্ধসাহিত্য মিলবে না। মৈথিলী সাহিত্যে বর্তমানে আত্মবিকাশের ও আত্ম-আবিষ্কারের পর্যায় চলেছে—নতুন নতুন পথ নির্মাণের নয়।

দর্শনতত্ত্ব, অলঙ্কারশাস্ত্র, ধর্ম, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ আধুনিককালে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ স্তর গঙ্গাধর ঝার 'বেদান্ত দীপক'। বইটিতে গ্রন্থকার বেদান্তের মূল সূত্রগুলি সাধারণ পাঠকের জন্যে সহজ ও সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন। ক্ষেমধারী সিংহের 'সাংখ্য-খদ্যোতিকা'-ও একই ধরনের গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ উমেশ মিশ্রের 'প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়', রামচন্দ্র মিশ্রের 'চন্দ্রাভরণ', ঋদ্ধিনাথ ঝার 'বিশ্বভূষণ,' সীতারাম ঝার 'ছন্দালঙ্কার মঞ্জুষা,' বেদানন্দ ঝার 'অলঙ্কারবোধ,' তারাচরণ ঝার 'প্রাচীন ও অর্বাচীন বিদ্বান,' শশিনাথ চৌধুরীর 'মিথিলাদর্শন,' রাসবিহারীলাল দাসের 'মিথিলাদর্পণ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি মৈথিলী প্রবন্ধসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিশেবে পরিগণিত। ক্ষেমধারী সিংহ তাঁর 'মনোবিজ্ঞান'-এ পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন। মিথিলার রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যাবে ভেষনাথ ঝার 'ব্যবহারবিজ্ঞান'-এ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ডাঃ সুধাকর ঝা, ডাঃ সুভদ্রা ঝা, শিবনন্দন ঠাকুর, জয়াকান্ত মিশ্র, উমেশ মিশ্র ও রমানাথ ঝার নাম স্মরণীয়। বিদ্যাপতি সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দাসের 'বিদ্যাপতি কাব্যলোক' ও উমেশ মিশ্রের 'বিদ্যাপতি ঠাকুর'-এর নাম করা যেতে পারে। এযুগের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হিশেবে মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা, গঙ্গাপতি সিংহ, সুরেন্দ্র ঝা, লক্ষ্মীপতি সিংহ, বলদেব মিশ্র ও ত্রিলোচন ঝা সুপ্রতিষ্ঠিত।

নতুন নতুন গ্রন্থ রচনার সঙ্গে চলেছে লুপ্তোদ্ধার অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের পুনঃ প্রকাশের কাজ। অনুবাদ শাখায় বিদেশি সাহিত্য থেকে অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা কয়েকটি মাত্র। অনুবাদের প্রধান উৎস সংস্কৃত। তারপরেই বাংলা। তারপর হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা।

ওড়িআ

সারলা দাসের 'মহাভারত', বলরাম দাসের 'রামায়ণ', জগন্নাথ দাসের 'ভাগবত', দীনকৃষ্ণ দাসের 'রসকল্লোল', উপেন্দ্র ভঞ্জর 'প্রেম-সুধানিধি', 'বৈদেহীশ বিলাস', ভক্তচরণ দাসের 'মথুরা-মঙ্গল', কবিসূর্য ব্রহ্ম ও গোপালকৃষ্ণের চম্পূ ও সঙ্গীতাবলী, অভিমন্যু সামন্তসিংহারের 'বিদগ্ধ চিন্তামণি' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রাচীন ওড়িআ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপেন্দ্র ভঞ্জর জনপ্রিয়তা। তিনিই প্রথম পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া লৌকিক বিষয় নিয়েও কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক উপেন্দ্র ভঞ্জ——'ভঞ্জ কবি' নামে পরিচিত। ভঞ্জ কবি ওড়িআ গান ও কাব্যের রাজা :

> উপইন্দ্র বীরবর টেকি বেনি বাহাকু।
> ভুমিতলে কবিপণে ন গণই কাহাকু॥
> জয়দেব দীনকৃষ্ণ পদে মোর শরণ
> আউ সবু কবিঙ্কর মাথে বাম চরণ॥

এটা অসার আস্ফালন মাত্র নয়। আজও 'ভঞ্জ কবি'-র যে জনপ্রিয়তা, তাতে করে এ-অহমিকা তাঁর মুখে নিশ্চয় শোভা পায়।

চৈতন্যদেবের প্রভাব বাংলার মত ওড়িশার সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও নতুন এক অধ্যায় যোজনা করে। দীনকৃষ্ণ, অভিমন্যু, ভক্তচরণ, কবিসূর্য, গোপালকৃষ্ণ প্রমুখ কবিরা কাব্য রচনা করেন চৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে। অবিশ্যি, উৎকলীয় ছন্দালঙ্কার ও শৈলীর স্বাতন্ত্র্য তাঁদের রচনায় পুরোপুরি বিরাজমান।

সারলা দাস, বলরাম দাস ও জগন্নাথ দাস প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি। জগন্নাথ দাসের 'ভাগবত' উৎকলের ঘরে ঘরে পঠিত ও পূজিত। প্রায়-প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে 'ভাগবত-গৃহ'—ভাগবত পঠন ও শ্রবণ গ্রামবাসীদের এক পবিত্র অনুষ্ঠান। সারলা দাসের 'মহাভারত'-এর মধ্যে তৎকালীন ওড়িআ সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত—'যাহা সারলা ভারতে নাই তাহা ওড়িশাতেও নাই'। মহাভারতের মূল কথাবস্তু ছাড়াও বহু কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ কবি এতে

করেছেন। বাংলাতেও বইটি অনূদিত হয়েছিল, আজ পাওয়া যায় কিনা সঠিক জানিনে।

প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের অত্যাশ্চর্য সমৃদ্ধির ফলে প্রাক-ইংরেজ যুগেই ওড়িআ গদ্য গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, ব্রজনাথ বড়জেনার 'চতুরবিনোদ' গল্পগ্রন্থে যে-গদ্যরীতির নিদর্শন রয়েছে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও তা মিলবে না:

'ক্রমে ক্রমে দিবা শেষ হুঅন্তে পশ্চিমদিগ অরুণ বর্ণ দিশিলা। মনে হেলা, সন্ধ্যারাণী রঙ্গিনী শাড়ী পরিধান করি ধীরে ধীরে বিবাহ মণ্ডপরু আসুছন্তি কি ?

ব্রজনাথের 'সমরতরঙ্গ' কাব্য বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাহিনী—ওড়িআ সৈন্যদের সঙ্গে মারাঠা সৈন্যদের যুদ্ধবর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী কবি-লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

১৮০৩ সালে ওড়িশায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ মিশনারিদের প্রথম পদার্পণ ঘটে ১৮২২ সালে। নিছক ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্য হলেও আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যের বিকাশে অনস্বীকার্য এই মিশনারিদের দান। এঁরাই প্রথম ওড়িশায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন, ছেলেমেয়েদের জন্যে নতুন ধরনের ইশকুল গড়ে তোলেন—এঁদেরই প্রেরণায় 'উৎকল ভাষা পুনরুদ্দীপন সভা', 'উৎকলোল্লাসিনী সভা' ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সংস্থার জন্ম হয়। প্রথম ওড়িআ ব্যাকরণ 'উৎকল-ভাষার্থাভিধান'-এর প্রণেতা রেভারেণ্ড সাটন। এ-ব্যাপারে তিনি অবিশ্যি জনৈক দেশীয় পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম ওড়িআ সংবাদপত্র 'জ্ঞানারুণ'—তারও সম্পাদক লেসি নামে জনৈক পাদ্রীসাহেব। দ্বিতীয় পত্রিকা 'অরুণোদয়'—এরও প্রধান উৎসাহদাতা ছিল খৃশ্চান ভার্নাকুলার সোসাইটি।

এরপর 'উৎকল দর্পণ', 'নব সংবাদ', 'সাম্যবাদী', 'উৎকল-বন্ধু', 'মুকুর', 'উৎকল-সাহিত্য' ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয়। এর মধ্যে ব্রজসুন্দর দাস সম্পাদিত 'মুকুর' ও বিশ্বনাথ কর সম্পাদিত 'উৎকল সাহিত্য'র আসন সর্বাগ্রে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে উদ্ভূত নতুন ভাবধারার ধারক-বাহক ছিল এই পত্রিকা দুটি। সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক ব্রজসুন্দর দাস ও বিশ্বনাথ কর। কোন রচনা সম্পর্কে এঁদের রায় লেখকরা বিনা দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিতেন। 'উৎকল সাহিত্য' প্রথম সংখ্যাতেই ঘোষণা করে:

'পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবের এ দেশর সকল বিভাগরে যেপরি পরিবর্তন উপস্থিত হোইঅছি, সাহিত্য সম্বন্ধরে মধ্য সেইপরি ঘটিঅছি। এ পরিবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়—মনুষ্য সমাজ এক ভাব এক অবস্থারে চিরদিন রহি ন পারে। জীবন্ত সমাজ পক্ষরে এহা অসহনীয়।'

রায়-রাও-সেনাপতি

আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যের স্রষ্টা হিশেবে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য : রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও ও ফকিরমোহন সেনাপতি। গদ্য-পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই এঁদের দান থাকলেও প্রথম দুজন প্রধানত কবি ও শেষের জন কথাসাহিত্যিক হিশেবেই সুপরিচিত।

আধুনিক যুগের প্রথম কবি রাধানাথ রায়—কবিসম্রাট রাধানাথ। ওড়িশা-প্রবাসী বাঙালি ইনি। সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িআ তিনটি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল অন্তরঙ্গ। বাংলাতেই রাধানাথের কবি-জীবন শুরু, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'লেখাবলী' এঁর প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ। বইটি সে-সময় নবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালি কবিদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে রাধানাথ ওড়িআ ভাষায় কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

রাধানাথকে বলা হয়ে থাকে প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। ওড়িশার নয়নমনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে সত্যিই তিনি অনেক সার্থক-সুন্দর কবিতা লিখেছেন। যেমন—'চিলিকা'। কিন্তু এটা রাধানাথের অন্যতম পরিচয়, প্রধানতম নয়। ওড়িআ কাব্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তক হিশেবেই স্মরণীয় এঁর নাম। 'কেদার-গৌরী', 'চন্দ্রভাগা', 'নন্দিকেশ্বরী' প্রভৃতি কাহিনী-কবিতা, 'বেণী-সংহার' ও 'দরবার' কাব্য এবং অসমাপ্ত মহাকাব্য 'মহাযাত্রা' এঁর অসামান্য কবিকীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। 'মহাযাত্রা'য় রাধানাথই প্রথম ওড়িআ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন :

> পঙ্কজবাসিনি দেবি, উৎকল ভারতি,
> সারলে, কি কলে, কহ কুরু চূড়ামণি,
> শুনিলে যে কালে বীর বার্তাহর মুখে
> প্রভাসে যাদবক্ষয়……

মহাযাত্রা পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পুরাতন কাহিনী। কিন্তু অতিপুরাতন এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে একদিকে কবি যেমন ভারতের গৌরবময় অতীতকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই আভাষ দিয়েছেন অন্ধকার ভবিষ্যতের। পঞ্চপাণ্ডব দিব্য চোখে দেখতে পেলেন—যাবতীয় সৎ গুণ ভারত থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে, নেমে এসেছে কলিযুগের অভিশাপ :

> সেহি দেশ, সেহি গিরি, সেহি নদনদী,
> নগর, নগরী, তীর্থ, আশ্রমাদি করি,
> সর্বে থিবে পূর্বপরি। মানবে কেবল
> নামকু মানব রহি পশুঠারু হীন
> হোই থিবে যুগধর্মে ভারত মণ্ডলে।……

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন :

> এ শস্যশ্যামলা ধরা পরহাতে দেই
> পর পদানত কি হেবে আর্যসুতে ?

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন সত্যিই বলেছেন—যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিদেব যে জবাব দিলেন "তাহা পাশ্চাত্যরচিত ভারত-ইতিহাসের পাঠকের উত্তর"। 'মহাযাত্রা'র মধ্যে দেশপ্রেমের যে প্রকাশ দেখা গেল ওড়িআ সাহিত্যে তা অভূতপূর্ব। 'দরবার'-এ সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের প্রতি কবির বিদ্রূপ দ্বিধাহীন।

রাধানাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা রাধানাথ। অতি পরিচিত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করলেও প্রকারান্তরে তাঁর মধ্যে পরাধীন ভারতের মর্মন্তুদ চিত্রই ফুটে উঠেছে। তবে, নতুন কোন পথের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত রাধানাথ দিতে পারেননি—আধ্যাত্মিক অবনতিকেই ইনি ভারতের দুর্গতির একমাত্র কারণ হিশেবে ঘোষণা করেছিলেন।

মধুসূদন রাও গদ্য রচনা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করেন। 'প্রবন্ধমালা' এবং বিদেশি কাহিনীর ছায়াবলম্বনে রচিত 'প্রণয়র অদ্ভুত পরিণাম'-এর নাম উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে। কিন্তু মধুসূদন প্রধানত পরিচিত 'ভক্ত-কবি' হিশেবে। ওড়িআ ভাষায় ইনিই প্রথম সার্থক গীতিকবিতা রচনা করেন। প্রথম শিশু-পাঠ্য কবিতা ও চতুর্দশপদাবলীর রচয়িতাও মধুসূদন।

মধুসূদন রাও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন, তাই তাঁর ভক্তিমূলক গান ও কবিতায় সত্যদিদৃক্ষু এক কবিমনের পরিচয়ই অধিকতর স্পষ্ট। রাধানাথ সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে সত্যের উপলব্ধি করতেন, আর মধুসূদনের কাছে ছিল সত্যই সৌন্দর্য। দেশপ্রেম মধুসূদনের কাব্যের আর-একটি বিশিষ্ট লক্ষণ :

এহি কি সে পুণ্যভূমি ভুবন বিদিত
সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি আর্য-গৌরবর ?
এহি কি ভারত, যার মহিমা সঙ্গীত
গম্ভীর-ঝঙ্কারে পূর্ণ দিগ দিগন্তর ?......
এহি কি সে বসুধার সমুজ্জ্বল মণি ?
এহি কি অমৃতময়ী মৃত্যুঞ্জয় সন্তান-জননী ?

'বসন্তগাথা' ও 'কুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ, বিশেষ করে 'রুশীপ্রণ দেবাতরণ' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটির জন্যে মধুসূদন অমর হয়ে থাকবেন ওড়িআ কাব্যে।

রাধানাথ রায়ের 'ইতালীয় যুবা' গল্পটি আধুনিক ওড়িআ কথাসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হলেও, আধুনিক ওড়িআ কথাসাহিত্যের জনক ফকিরমোহন সেনাপতি। অবিশ্যি ওড়িআ সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক কে, তা নিয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান। কেউ কেউ 'পদ্মমালী'র লেখক উমেশচন্দ্র সরকারকে, আবার-কেউ 'বিবাসিনী'র লেখক রামশঙ্কর রায়কে এই সম্মান দিয়ে থাকেন। তবে, প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক যে ফকিরমোহন, দ্বিমত নেই সে-বিষয়ে। রাধানাথ, মধুসূদন ও ফকিরমোহন—তিনজন সমসাময়িক ও বন্ধুস্থানীয় এবং ওড়িআ সাহিত্যে নতুন ভাবগঙ্গার ভগীরথ হিশেবে এই ত্রয়ীর নাম একত্র স্মরণীয়।

তবু, এরই মধ্যে ফকিরমোহন বিশেষ একটি মর্যাদার দাবিদার। রাধানাথ ও মধুসূদন দুজনেই সমাজসচেতন লেখক হলেও—প্রত্যক্ষভাবে তৎকালীন সমাজজীবনকে এঁরা সাহিত্যের উপজীব্য করেননি। প্রচলিত কাহিনী-কাঠামোকেই নতুন বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কবি হিশেবে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমার্গের পথ। এর এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম ফকিরমোহন। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরাসরি ইনি সংস্কারমূলক অভিযান শুরু করেন। প্লটের জন্যে কখনো ভাবতেন না। সাধারণ নর-নারীই এঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের কুশীলব। তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র ইনি রেখায়িত করেছেন সাহিত্যে।

দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে ফকিরমোহনের পরিচয় ছিল সুগভীর। আর ছিল শিল্পীসুলভ অন্তর্দৃষ্টি, নিচুতলার মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি। জমিদার-কিষান বিরোধের পটভূমিকায় রচিত এঁর 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' ওড়িআ কথাসাহিত্যের অবিস্মরণীয় একটি উপন্যাস। কিভাবে জমিদারের নির্মম শোষণে এক চাষী-দম্পতি সর্বহারা হল, তারই বিষাদান্ত কাহিনী। এখানে অতি পুরনো ও ক্রমবর্ধমান একটি সমস্যার প্রতি ফকিরমোহন প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জীবন্ত চরিত্র-চিত্রণেও ফকিরমোহনের দক্ষতা অসামান্য। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাকে ইনিই প্রথম সাহিত্যে ব্যবহার করেন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে। রচনাশৈলী নিরলঙ্কার।

ফকিরমোহনের প্রথম বই 'রাজপুত্রর ইতিহাস'। অর্থাভাবে বইটি তিনি প্রকাশ করতে পারেননি। এঁর অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ হিশেবে 'মামু', 'লছমা' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' উপন্যাস ; 'গল্পস্বল্প' (দুই খণ্ড), 'অবসর বাসরে', 'পুষ্পমাল্য' ও 'বৌদ্ধাবতার' কাব্যগ্রন্থ এবং 'উৎকল ভ্রমণ'-এর নাম উল্লেখ্য। 'মামু' প্রতারক মামার কীর্তিকাহিনী। 'লছমা' ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ রয়েছে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার কঠোর সমালোচনা। ওড়িআ সাহিত্যে ইনিই প্রথম আত্মজীবনী লেখেন—'আত্মজীবনচরিত'। অনুবাদক হিশেবেও ফকিরমোহন খ্যাতিমান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতের অনুবাদ এঁর একটি স্মরণীয় কীর্তি। বাংলা সাহিত্যের কাছে ফকিরমোহনও, আরো-অনেকের মত, বিশেষভাবে ঋণী। বঙ্কিমের প্রভাব তাঁর ওপরে কী মাত্রায় ছিল, নিম্নোক্ত উধৃতি তার প্রমাণ :

"...আশ্বিন কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল।...লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল তারপর কে ভিক্ষা দেয়? গোরু বেচিল লাঙ্গল-যোয়াল বেচিল, জোতজমা বেচিল।...খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল।... ('আনন্দমঠ')

"...কার্তিক মাস আরম্ভরু লোকে অত্যন্ত নিরাশ হোই পড়িলে। ধান গাছ গুড়িক শুখি কুটাপরি হোই গলাণি।...দুআর দুআর বুলি বুলি ভিক মাগুথান্তি। কাহা ঘরে চাউল অছি যে ভিক দেব?...চাষী লোক অবস্থানুসারে প্রথমে কংসা পিত্তল, গোরু গাই, সুনা রূপা যাহা ঘরে যাহা থিলা বিকি বিকি মাঘ ফগুণ যাএ দান্ত কামুড়ি ঘরে পড়ি রহিলে।...তেন্তুলি গছরে কঅঁলিয়া পত্র বাহারিবারু গোটাএ গোটাএ দশ কড়িএ জণ লেখাএঁ চঢ়ি মাঙ্কড় পরি পত্র সবু খুণ্টি খাউথান্তি।" ('আত্মচরিত : উৎকলর ভীষণ দুর্ভিক্ষ।')

রাধানাথ, মধুসূদন ও ফকিরমোহন যে-ধারার সূত্রপাত করেন, পরবর্তী যুগের লেখকরা তারই অনুসারী। এঁদের মধ্যে কথাসাহিত্যে সর্বাগ্রে নাম উল্লেখযোগ্য গোপালচন্দ্র প্রহরাজের। এঁর রচনাশৈলী অত্যন্ত সহজ, সরল। পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার দুরূহ ক্ষমতায় ইনি ছিলেন পারঙ্গম। বিশেষ করে, হাস্যরসাত্মক রচনায় এঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সাংঘাতকে উপজীব্য করে 'ভাগবত টুঙ্গিরে সন্ধ্যা'য় (চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যা) ইনি যে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন তা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীসুলভ। কাহিনী-গ্রন্থনে মুন্সিয়ানা ও মানব-চরিত্র সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে এই উপন্যাসে। 'বাই মহান্তি পাঞ্জি' ও 'ননাঙ্কা বস্তানী' এঁর আরও দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এক লক্ষ চুরাশি হাজার শব্দ সম্বলিত এক ভাষাকোষের সম্পাদক ও সংকলক হিশেবেও উল্লেখযোগ্য এঁর নাম।

কবি গঙ্গাধর মেহের ও চিন্তামণি মহান্তি পুরোপুরি রাধানাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। গঙ্গাধরের 'কীচক বধ', 'প্রণয়বল্লরী' ও 'তপস্বিনী' এবং চিন্তামণির 'সুভদ্রা', 'বিশ্বচিত্র' ও 'বিক্রমাদিত্য' স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ। এঁদের সমসাময়িক নন্দকিশোর বল—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এতদিন কবিরা কাব্য বিষয় হিশেবে প্রধানত বেছে নিতেন হয় পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক কাহিনী, এবং কাব্য-শরীরের অলঙ্করণের ওপরেও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করতেন বড়-বেশি। নন্দকিশোর বল দেখালেন, সাধারণ বিষয় নিয়ে সাধারণ ভাষাতেও সার্থক কবিতা রচনা সম্ভব। ইনিই প্রথম ওড়িশার পল্লীজীবন নিয়ে কবিতা লেখেন, পল্লীর দৈনন্দিন জীবন-চিত্র তুলে ধরেন কবিতার মধ্যে দিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে 'পল্লীচিত্র'র নাম করা যায়। আটটি সর্গে একটি গ্রামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র কবি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা', 'বসন্ত-কোকিল' ও 'নির্ঝরিণী' নন্দকিশোরের অন্যান্য গ্রন্থ।

জাতীয়তাবোধ আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ। রাধানাথ রায়ের যুগ থেকেই তার প্রকাশ দেখা গেলেও, এতদিন সেটা সুস্পষ্ট কোন বাস্তব রূপ নিতে পারেনি। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত কবিতার মাধ্যমে কবিরা এটা প্রকাশ করতে চেয়েছেন মাত্র। সযত্নে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন সমসাময়িক দেশ ও সমাজকে। কিন্তু ভারতের মুক্তি-আন্দোলন দানা বেঁধে

ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কবি-সাহিত্যিকরাও ক্রমে মাটির কাছাকাছি নেমে এলেন। জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ককে নিবিড়তর করে তুললেন।

এ-পথের অগ্রনায়ক উৎকলমণি পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র। আধুনিক ওড়িআ গদ্য ও পদ্যসাহিত্যে এঁদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। গোপবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'সত্যবাদী বিদ্যালয়' সাহিত্য-চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। বর্তমান ওড়িশার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গোপবন্ধু। দেশনেতা, কবি, সাংবাদিক ও অনুপম গদ্য-লেখক হিশেবে গোপবন্ধু এক অনন্য আসনের অধিকারী। ওড়িশার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি ইনি। কারাগারে রচিত এঁর 'বন্দীর আত্মকথা' ও 'কারা-কবিতা' এবং কোনার্ক মন্দির নির্মাণে এক বালকের আত্মাহুতির পটভূমিকায় প্রণীত 'ধর্মপদ' আজও পাঠকমনে আলোড়নের সৃষ্টি করে।

নীলকণ্ঠ দাস ও গোদাবরীশ মিশ্র গোপবন্ধুর দুই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, সমধর্মীও। নীলকণ্ঠ বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি ও সমালোচক। শব্দযোজনা, ছন্দোবৈচিত্র্য ও উপমার অভিনবত্বের দিক দিয়ে এঁর 'কোনার্কে' ও 'প্রণয়িনী'র নাম উল্লেখ-যোগ্য। 'নবভারত' নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকাও ইনি বার করেছিলেন। তদানীন্তনকালে 'নবভারত' সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার মর্যাদা পেয়েছিল। নীলকণ্ঠের 'আর্য-জীবন' ও 'ভগবৎগীতা' ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে ওড়িআ ভাষায় মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ হিশেবে সমাদৃত। 'আলেখিকা', 'কিশলয়', 'কলিকা'র কবি গোদাবরীশ মিশ্রের কবিতা ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে গতানুগতিক হলেও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। শক্তিশালী নাট্যকার হিশেবেও ইনি খ্যাত।

গাথা ও বর্ণনামূলক কবিতায় পদ্মচরণ পট্টনায়ক এবং ব্যঙ্গাত্মক-কবিতা ও গীতিকার হিশেবে লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্রের নাম স্মরণীয়। এই সময় এক মহিলা সাহিত্যিক প্রভূত খ্যাতির অধিকারিণী হন—কুন্তলাকুমারী সাবৎ। এঁর দেশ-প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থ 'আহ্বান' রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়। 'আহ্বান' ছাড়াও 'স্ফুলিঙ্গ', 'অঞ্জলি', 'অর্চনা' ও 'প্রেমচিন্তামণি' কাব্যগ্রন্থ এবং উপন্যাস 'রঘু অরক্ষিত' এঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি। ইনি মারা যান অকালে।

সবুজ আন্দোলন

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ওড়িশার সাহিত্য-আন্দোলন এক নতুন পথে মোড় নেয়। যুদ্ধোত্তর বিদেশি সাহিত্য, রবীন্দ্র-কাব্য ও প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'র প্রভাবে একদল ওড়িআ লেখক প্রভাবান্বিত হন। নিছক ভাবাবেগের বদলে যুক্তি-বুদ্ধির মানদণ্ডে সর্ববিধ সমস্যার বিচার এ-যুগের লেখকদের বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক। কাব্য-আঙ্গিক, কথাবস্তু ও রচনাশৈলীর পরিবর্তন সাধনে এঁরা সবিশেষ তৎপর হন। কিন্তু পুরনো মূল্যবোধ ও ধ্যানধারনাকে বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকেও এঁরা মুখ ফিরিয়ে বসেন। ফলে প্রাচীন-পন্থীদের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি এঁদের হতে হয়।

এই দলের লেখকদের পুরোভাগে ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, হরিহর মহাপত্র ও হরিশচন্দ্র বড়াল। খ্যাতনামা সম্পাদক বিশ্বনাথ কর তাঁর 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় এঁদের বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথমে এঁরা 'সবুজ কবিতা' নামে একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশ করেন। 'সবুজ সাহিত্য সমিতি' নামে নতুন একটি সাহিত্য সংস্থাও গড়ে ওঠে এঁদের নেতৃত্বে। এই গোষ্ঠীর ন'জন লেখক মিলে একটি বারোয়ারি উপন্যাস লেখেন—'বাসন্তী'। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায়। সমিতির মুখপত্র ছিল 'যুগবাণী'। প্রাচীনপন্থীরা যাই বলুন, আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যে সবুজ গোষ্ঠীর লেখকদের দান বড় কম নয়। অতি আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যের পূর্বসূরী এঁরা।

এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে কালিন্দীচরণ ও বৈকুণ্ঠ পট্টনায়ক ছাড়া আর সকলেই হয় এখন লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, নয় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সাহিত্যাদর্শের। কালিন্দীচরণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মাটির মনীষ' অতি সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে এক অসাধারণ স্বষ্টি—দৈনন্দিন জীবনের নিখুঁত চিত্র। কথাসাহিত্যে কালিন্দীচরণ ফকিরমোহনের সার্থক উত্তরাধিকারী। 'মাটির মনীষ' আধুনিক ওড়িআ কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এঁর অন্যান্য গ্রন্থ—উপন্যাস 'লোহার মনীষ', 'মুক্তাগড়ের ক্ষুধা,' 'অমর চিতা', গল্পগ্রন্থ 'দ্বাদশী,' 'সাগরিকা', কাব্যগ্রন্থ 'ক্ষণিক সত্য,' 'মনে নাহিঁ', 'মহাদীপ' ইত্যাদি।

জীবনবাদী কবি কালিন্দীচরণ :

এ দেহকু রখিবাকু ধরি
লোড়া যাহা সে মোর ধরম
তাহা বিনে অছি কেউঁ আত্মা
আউ কেউঁ দেবতা পরম ?

নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক হিশেবেও কালিন্দীচরণ খ্যাতিমান। এঁর আধুনিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ-সংকলন 'নেতৃত্ব ও নেতৃত্ব' এবং সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'সাহিত্যিকা' লেখকের চিন্তাশীল বিদগ্ধ মনের স্বাক্ষর বহন করে।

অন্নদাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হওয়ার আগেই ওড়িআ সাহিত্যে কবি ও অনুবাদক হিশেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। সবুজ সমিতির ইনি ছিলেন মস্তিষ্ক, মধ্যমণি। আপসোসের কথা, এঁর ওড়িআ রচনাবলী আজো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অন্নদাশঙ্করের 'সমর ও সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধ উৎকল সাহিত্য সমাজ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিল। মধুসূদন রাওয়ের 'বসন্ত গাথা' কাব্যগ্রন্থের সমালোচক হিশেবে একদা ইনি প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই, বাংলার মত, ওড়িআতেও ইনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

আধুনিক কাব্যসাহিত্য

সবুজ গোষ্ঠীর লেখকদের অনুজ-স্থানীয় শচী রাউত রায়—কবি এবং কথাশিল্পী। এঁর দেশপ্রেমমূলক কাহিনী-কবিতা 'বাজী রাউত'-এর হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'দি বোটমান বয়' এক সময় দেশব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এঁর 'পাণ্ডুলিপি' কাব্য-সংগ্রহ প্রগতিশীল ওড়িআ কাব্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। শচী রাউতই প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

কহ ই শ্রমিক কবি
দেখ ভাই থরে দুই আঁখি মেলি পীড়িত মানবছবি।...
চকর, চাতক, জোছনা কথাত বহুত হোইছি শুনা
বিরহ নিশিরে ব্যথার লোতক অনেক হেলাত বুণা

কোকিল কূজন গুঞ্জিলত বহ কুহুম আরামে বসি
কেতে তরুণীঙ্ক চপললীলারে পরাণ উঠিলা হসি।…

কবিতায় নতুন নতুন আঙ্গিকের অন্যতম প্রয়োগকর্তা ইনি। এঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে 'মাটির তাজ' ও 'মশানীর ফুল' সমধিক জনপ্রিয়। দুঃখের বিষয়, অধুনা শচী রাউতের লেখায় সেই ধারালো দীপ্তি আর দেখা যায় না। অথচ তাঁর মত কবির কাছ থেকে অনেক-কিছুই প্রত্যাশা করা গিয়েছিল।

অন্যান্য আধুনিক ওড়িআ কবিদের মধ্যে রাধামোহন গড়নায়ক, গোদাবরীশ মহাপাত্র, নিত্যানন্দ মহাপাত্র, কুঞ্জবিহারী দাস, মনমোহন মিশ্র, অনন্ত পট্টনায়ক ও ডাঃ মায়াধর মানসিংহের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা রাধামোহনের বৈশিষ্ট্য, এই দিক দিয়ে ইনি শচী রাউতের সমধর্মী। ডাঃ মায়াধর মানসিংহ মুখ্যত প্রেমের কবি। ছন্দ, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে এঁর 'ধূপ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনোহরণ করে। একদল অনুকারকের পর্যন্ত সৃষ্টি হয়। কিন্তু মিষ্টিমধুর প্রেমের কবিতায় ইনি যতখানি সার্থক, অন্য ধরনের কবিতায় তত নন। তার প্রমাণ 'মাটিবাণী'। অনন্ত পট্টনায়ক ও মনমোহন মিশ্র বামপন্থী রাজনীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত—জনগণের কবি নামে পরিচিত।

গোদাবরীশ জাতীয়তাবাদী কবি ও কথাশিল্পী। স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় রাজা ও সামন্তবাদী শাসনের বিলোপে রচিত এঁর 'মুকুটর পরাজয়' থেকে অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উধৃত করা যেতে পারে:

পাষাণ যুগর গড়জাত গড়
বিলাসনগর তল
বন্ধ কিরাত কুটীরবন্ধ
হেলা আজি সমতল
পতিত তাপিত দীন পদানত
আহত যাত্রী শুণ
বর্বরতার চরম সমাধি
হেলা এঠি সমাপণ
গিরিকন্দরে দেবমন্দিরে
ঘন অন্ধারে কহ
হেলা এতে কালে কৌপীন পাখে
মুকুটর পরাজয়।

জ্ঞানীন্দ্র বর্মা, বিনোদচন্দ্র নায়ক, চিন্তামণি বেহেরা, যতুনাথদাস মহাপাত্র, জানকী মহান্তি ও বিনোদ রাউত রায় প্রমুখের নাম অতি আধুনিক কবি হিশেবে উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি কলকাতা থেকে 'কবিতা' নামে একটি ওড়িআ পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে—উপরোক্ত কবিরা এর নিয়মিত লেখক। অতি আধুনিক ওড়িআ কাব্য আন্দোলনের মুখপত্র হিশেবে 'কবিতা' পরিগণিত। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, মনে হয়, বিনোদচন্দ্র। 'নীল চন্দ্রর উপত্যকা এঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা :

অবলুপ্ত শতাব্দীর এক হেমন্তর গভীর নিশারে
কক্ষভ্রষ্ট তারকার অবনীলিম আলোককণা
ঝরিপড়ি
নাঙ্গা পর্বতর শীর্ষশিখে
পাতি দেউথিলা তুষারর শুভ্র আস্তরণ।
তলে
আউ তলে
ইউকেলিপ্‌টস্‌র ঘনীভূত ছায়া
তার তলে জনহীন উপত্যকা
জনহীন·········বিস্তীর্ণ তু—ষা— র
তার তলে রাজে
চন্দ্রর সমাধিস্তূপ
চতুর্দিগে নিস্তব্ধ গম্ভীর······

কথা সাহিত্য

গোদাবরীশ মহাপাত্র, গোপীনাথ মহান্তি, কান্নুচরণ মহান্তি, উপেন্দ্রকিশোর দাস, বৈষ্ণবচরণ দাস, গোবিন্দচন্দ্র ত্রিপাঠী, রাজকিশোর রায়, রাজকিশোর পট্টনায়ক, সুরেন্দ্রনাথ মহান্তি, কমলাকান্ত দাস, উদয়নাথ যড়ঙ্গী ও নিত্যানন্দ মহাপাত্র আধুনিক যুগের শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক।

ছোট গল্পে গোদাবরীশ মহাপাত্র অদ্বিতীয়। দরিদ্র, নিরন্ন ও অসহায়দের বাস্তব-জীবন-চিত্র ইনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। এঁর গল্প বলার ভঙ্গিটিও বড় হৃদয়গ্রাহী। কান্নুচরণ মহান্তির গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক—জনপ্রিয়ও ইনি সবচেয়ে বেশি। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের'

পটভূমিকায় রচিত এঁর 'হা অন্ন' এবং আদিবাসীদের জীবনায়ন হিশেবে গোপীনাথ মহান্তির 'পরজা' (প্রজা) এ-যুগের স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। কান্থচরণ ও গোপীনাথ সহোদর—জীবননিষ্ঠ লেখক দুজনেই। তবে, দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক নয়, সংস্কারবাদী। মনস্তত্ত্বমূলক গল্প-উপন্যাসে অনন্তপ্রসাদ পাণ্ডা, রাজকিশোর রায় ও নিত্যানন্দ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার রামশঙ্কর রায়, নাটকের নাম 'কাঞ্চীকাবেরী', রচনাকাল ১৮৮০ সাল। 'কাঞ্চীকাবেরী' ঐতিহাসিক নাটক। রামশঙ্করের উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক 'কাঞ্চনমালি', প্রহসন 'বুঢ়াবর'। এক অস্পৃশ্য বালিকার সঙ্গে জনৈক উচ্চবর্ণের হিন্দু যুবকের প্রেম ও পরিণয়ের পটভূমিকায় 'কাঞ্চনমালি' রচিত। এর সাহিত্য-মূল্য খুব বেশি নয়।

আধুনিক যুগের প্রথম সার্থক নাটক গোদাবরীশ মিশ্রের 'পুরুষোত্তম দেব'। 'কাঞ্চীকাবেরী'র কাহিনী নিয়েই নাটকটি লেখা। আধুনিক নাটকের অন্যতম স্রষ্টা হিশেবে ভিকারীচরণ পট্টনায়কের নামও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভিকারীচরণ বা রামশঙ্করের নাটক মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। সে-সৌভাগ্য অর্জন করে অশ্বিনীকুমার ঘোষের নাটকগুলি। অশ্বিনীকুমারের প্রধান উপজীব্য ইতিহাস। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব এঁর নাটকে প্রকট।

সমসাময়িক সমাজ ও সমস্যা নিয়ে প্রথম নাটক লেখেন কালিচরণ পট্টনায়ক। এঁর 'ভাত' একসময় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জমিদারী সমস্যার একটি বাস্তব চিত্র লেখক এই নাটকে তুলে ধরেছেন। অবিশ্যি, শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয় কংগ্রেসি আদর্শে জমিদারের হৃদয় পরিবর্তনে। 'রক্তমাটি' এঁর আরেকটি জনপ্রিয় নাটক—নায়ক বিপ্লবী কবি, নতুন সমাজ নির্মাণের অভিযানে সঙ্গিনী হিশেবে গ্রহণ করল এক অন্ত্যজ বালিকাকে। সাহিত্য-স্বষ্টি হিশেবে 'ভাত'-এর আসন 'রক্তমাটি'র ওপরে। এঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'অতিবড়ী জগন্নাথ দাস'—প্রাচীন কবি জগন্নাথ দাসের জীবন নিয়ে রচিত। রামচন্দ্র মিশ্রের 'ঘর-সংসার' সাম্প্রতিক কালের একটি জনপ্রিয় নাটক।

এঁরা ছাড়াও আধুনিককালে ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক, মনোরঞ্জন দাস ও অদ্বৈতচরণ মহান্তি নাটক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমানে কটকে দুটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ রয়েছে। তাছাড়া আছে ভ্রাম্যমান একটি নাটুকে দল।

অন্যান্য কাব্য ও কথাসাহিত্যের তুলনায় সাহিত্যের অন্যান্য দিক দরিদ্র। বিদেশি ভাষা থেকে দূরের কথা, বাংলা থেকে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। ইদানীং অবিশ্যি অনুবাদের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তবে তার বেশির ভাগ গ্রন্থই রাজনীতিবিষয়ক। কৃতী অনুবাদক হিশেবে গোদাবরীশ মিশ্র, উদয়নাথ ষড়ঙ্গী ও সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর নাম করা যায়। বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন প্রভাসচন্দ্র শৎপথী। আরও দুজন কুশলী অনুবাদক—নারায়ণচন্দ্র মহান্তি ও সুনন্দ কর। সমালোচনা সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক তারিণীচরণ রথ ও গোপীনাথ নন্দ। সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিশেবে পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র, পণ্ডিত সর্বনারায়ণ দাস, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও অধ্যাপক গৌরীকুমার ব্রহ্মার নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি মূল্যবান ভূমিকা ও টীকা সহযোগে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যগুলির সঙ্গে আধুনিক নাতিশিক্ষিত পাঠকসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিছন্দচরণ পট্টনায়কের দানও অনস্বীকার্য। অধ্যাপক গিরিজাশঙ্কর রায়ের 'সাহিত্য-সন্দর্ভ' এবং ডাঃ মায়াধর মানসিংহের 'কবি ও কবিতা' ও 'ওড়িশা সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। প্যারীমোহন আচার্য, কৃপাসিন্ধু মিশ্র, জগবন্ধু সিংহ, চিন্তামণি আচার্য, সত্যনারায়ণ রাজগুরু, পরমানন্দ আচার্য, কেদারনাথ মহাপাত্র, কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী ও হরেকৃষ্ণ মহতাব—ইতিহাস লেখক ও গবেষক। এঁদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মহতাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিক নেতা হিশেবেই ইনি সমধিক পরিচিত, কিন্তু কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক হিশেবেও যে শ্রীমহতাব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সেটা হয়ত অনেকেরই অজানা। 'প্রতিভা', 'অব্যাপার' ও 'টাউটর' উপন্যাস, 'চারি চক্ষু' ও 'আত্মদান' কাব্যগ্রন্থ এবং 'ওড়িশা ইতিহাস', 'দশ বর্ষর ইতিহাস' ও 'পলাশী অবসানে' ইত্যাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখক হিশেবে হরেকৃষ্ণ মহতাব ওড়িশার সাহিত্যেতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করে থাকবেন।

অসমীয়া

"Assamese prose literature developed to a stage in the far distant sixteenth century, which no other literature of the world reached except the writings of Hooker and Latimer in England.··· The *Katha Gita* shows clearly that Assamese literature developed to a standard in the sixteenth century which the Bengali language reached only in the time of Iswar Chandra and Bankim Chandra.

এই উক্তি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। গদ্যসাহিত্য সম্পর্কেই যখন এটা প্রযোজ্য, প্রাচীন পদ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা অনুমেয় সহজেই।

অসমীয়া পদ্যসাহিত্যের জন্ম ষষ্ঠ বা সপ্তম—কারো কারো মতে সপ্তম থেকে নবম—শতাব্দীতে। সেটা অভিহিত হয়ে থাকে অসমীয়া সাহিত্যের 'গীতি যুগ' নামে। ঘুমপাড়ানী গান, গাথা কবিতা, বারমাসী গীত, বিহুগীত, ডাকের বচন ইত্যাদি এ-যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। দ্বিতীয় যুগ 'মন্ত্র আরু ভণিতার যুগ'—লিখিত সাহিত্যের জন্ম এই যুগে। এর পরের যুগ প্রাক-বৈষ্ণব যুগ। এই যুগের শুরু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। কবি হেম সরস্বতী, মাধব কন্দলী ও পীতাম্বর দ্বিজ এ-যুগের খ্যাতনামা লেখক। হেম সরস্বতীর 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পুরাণ, রামায়ণ ইত্যাদির অনুবাদে সমৃদ্ধ এ-যুগের সাহিত্য। শঙ্করদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব যুগের শুরু হয়—প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের সমৃদ্ধতম অধ্যায় এই বৈষ্ণব যুগ।

শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। রামানুজের বৈষ্ণববাদকে আশ্রয় করে ইনি বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সমাজ এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যেও অনুভূত হয় নতুন প্রাণের স্পন্দন। শুধু সমাজ-সংস্কারক নন, কবি, নাট্যকার, সুরকার ও ভাগবতের কুশলী অনুবাদক হিশেবেও শঙ্করদেব স্মরণীয়নাম।

শঙ্করদেবের পরবর্তী যুগকে বলা হয়ে থাকে বিস্তারের যুগ—এই যুগের প্রধান অবদান 'বুরঞ্জী সাহিত্য'। অহমরাজ ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের বংশেতিহাস নিয়ে রচিত এই সাহিত্য। ইতিহাস বুরঞ্জী সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হলেও এর সাহিত্যমূল্য কিন্তু বড় কম নয়। আধুনিক অসমীয়া গদ্যের বিকাশে 'বুরঞ্জী সাহিত্য'র ভূমিকা যথেষ্ট। 'বুরঞ্জী সাহিত্য'কে ভিত্তি করে আধুনিক যুগে বহু নাটক, উপন্যাস, জীবনচরিত ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হয় ১৮২৬ সালে এবং এই বছরকেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের জন্মকাল বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের গোড়ার দিকে অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য যথোচিত সরকারি অনুগ্রহ লাভ দূরে থাকুক, রীতিমত উপেক্ষিতই হয়েছিল। কারণ এর বহুবিধ। তবে প্রধানতম কারণ, মনে হয়, সরকারি শাসনযন্ত্রে বাঙালি-প্রাধান্য। বাঙালিদেরই পরামর্শে ১৮৩৬ সালে আসামের সরকারি ভাষা হিশেবে বাংলাকে গ্রহণ করা হয়। শুধু অফিস-আদালতে নয়, শিক্ষারও মাধ্যম হয়ে ওঠে বাংলা।

বিদেশি সরকার নিজেদের স্বার্থের খাতিরে অসমীয়া ভাষাকে বাতিল করলেও বিদেশি মিশনারিরা কিন্তু নিজেদের গরজেই অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে হলে তাদের মাতৃভাষার আশ্রয় ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই মিশনারিদের উদ্যোগে প্রাক-ইংরেজ যুগে—১৮১০ সালে—'নিউ টেস্টামেন্ট' এবং ১৮৩৩ সালে বাইবেলের পূর্ণাঙ্গ অসমীয়া অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য হেতু এই অনুবাদের আসল উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে। বই দুটি মোটেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

হাল তবু মিশনারিরা ছাড়লেন না, বাংলা সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও না। অসমীয়া ভাষার প্রতি তাঁদের এই মমতার মূল কারণ যাই হোক, এর অকৃত্রিমতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যের মত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যেরও জন্ম বিদেশি মিশনারিদের হাতে। ১৮৪৬ সালে শিবসাগর থেকে একদল মার্কিন মিশনারি 'অরুণোদয় সংবাদপত্র' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-

বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই ছিল পত্রিকাটির বিঘোষিত উদ্দেশ্য। 'অরুণোদয়' অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা। কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকাটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় 'অরুণোদয়'কে কেন্দ্র করে মাতৃভাষার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে গড়ে তোলেন এক প্রবল আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন 'আসামের রাজা রামমোহন' আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তারই ফলে ১৮৭২ সালে সরকারি ভাষা হিশেবে বাংলা যায় বাতিল হয়ে।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বড়ুয়া ও হেমচন্দ্র বড়ুয়া—এ-যুগের তিন প্রতিভাধর পুরুষ, শক্তিশালী লেখক। নতুন শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত, সামাজিক-ধর্মীয় সর্ববিধ কুসংস্কারের ঘোরতর বিরোধী।

স্বল্পায়ু আনন্দরাম প্রধানত সংস্কারক হিশেবে পরিচিত হলেও প্রবন্ধ-সাহিত্যেও দান এঁর যথেষ্ট রয়েছে। হেমচন্দ্র সব্যসাচী লেখক। বিশেষ করে, ব্যাঙ্গাত্মক নাটক-প্রহসন রচনায় ও টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে এঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। হেমচন্দ্রের 'কানিয়ার কীর্তন' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক—আফিঙ সেবনের কুফল এতে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন নাটক ও প্রহসনের মধ্যে দিয়ে ইনি সামাজিক দুর্নীতি ও ভণ্ডামীকে তীব্র কষাঘাত করেছেন। 'হেমকোষ' অভিধান এঁর আর-এক অক্ষয় কীর্তি। গুণাভিরাম হেমচন্দ্রের বন্ধু, কিন্তু এঁর মেজাজ আলাদা। ইনি ছিলেন মানবতাবাদী দরদী লেখক। গুণাভিরাম-রচিত আনন্দরামের জীবনী সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে গুণাভিরামই পাশ্চাত্য রীতিতে ইতিহাস ও জীবনী রচনার সূত্রপাত করেন। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে লিখিত এঁর 'রামনবমী' নাটকটির সমাদর আজও হ্রাস পায়নি। 'আসামবন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও ইনি বার করেছিলেন। সমসাময়িক তরুণ লেখকদের অগ্রজ-স্থানীয় ছিলেন গুণাভিরাম।

বাংলা ভাষার প্রতি অসমীয়াদের বিরাগ ছিল প্রথম থেকেই। এ-বিরাগ অভিমানপ্রসূত। কারণ, মাতৃভাষার অবিসংবাদী মর্যাদা ব্যাহত করে জোর-জবরদস্তি তাদের ওপর বাংলা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাই দেখি বাংলা-বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরূপতা

দূরে যাক, বাংলা সাহিত্যই ছিল তাঁদের প্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলার এই ঋণ অসমীয়ারাও স্বীকার করেন মুক্তকণ্ঠে :

"......পশ্চিমীয়া লিখা আমার দেশলৈ নিজরি আহে ঘাই কৈ ইংরাজী ভবায় জরিয়তে। কাজেই নতুন ধরণর এই লিখাই প্রতিভাবান বাঙ্গালী লিখক সকলকো উদ্বুদ্ধ করিলে। আমার দেশত প্রভাব আছে বংলারো, ইংরাজীরো।" (১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ)।

'জোনাকি'-যুগ

বাংলা সাহিত্যের দ্বারা আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য কিভাবে ও কি-পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল, 'জোনাকি'-যুগ সম্পর্কে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। 'অরুণোদয়'-পরবর্তী যুগে যে-সব পত্র-পত্রিকা অসমীয়া সাহিত্যে নতুন যুগ নির্মাণে সহায়তা করে তার মধ্যে 'আসাম-বিলাসিনী', 'আসাম-দীপক', 'আসাম-দর্পণ', 'আসাম-বন্ধু' ও 'জোনাকি'র নাম উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে। আবার, এদের মধ্যে সর্বাগ্রে আসন 'জোনাকি'র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ, বাংলা সাহিত্যের সে-এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কলকাতা তখন সংস্কৃতিকেন্দ্র সারা ভারতের। কলকাতার কলেজে পড়তে এসে কয়েকজন অসমীয়া তরুণ নতুন বাংলা আর ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন—কলকাতা থেকে তাঁরা বার করলেন অসমীয়া পত্রিকা 'জোনাকি'। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে নবজাগৃতির স্রষ্টা এই 'জোনাকি'।

প্রচলিত ধ্যানধারণার স্থানে নতুন জীবনদর্শন ও নতুন মূল্যবোধের রূপায়ণে 'জোনাকি' সাহিত্যজগতে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে। এতদিন সাহিত্য যেন বিপরীতমুখী দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ছিল—প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য ও নতুন খৃশ্চান সাহিত্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংমিশ্রনের মধ্যে দিয়ে 'জোনাকি' আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও আসামের তরুণ সম্প্রদায় পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে নতুন এক সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই প্রথম সাহিত্যকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করার প্রয়াস দেখা গেল, সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতার প্রতিবাদ ও সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তির বাণী ঘোষিত হল। দেশে নতুন করে একটি সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক শ্রেণী গড়ে উঠল।

'জোনাকি'র প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে তিনজনের নাম স্মরণীয়ঃ লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র গোস্বামী।

সাহিত্যের হেন শাখা নেই লক্ষ্মীনাথের প্রতিভার স্বাক্ষর যাতে অনুপস্থিত। আসামের সাহিত্য-সম্রাট নামে পরিচিত ইনি। দর্পণের মত আসাম-জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিফলিত এঁর সাহিত্যে। সনেট, গীতিকবিতা, গাথাকাব্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক-প্রহসন-রসরচনা, প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনা—এককথায় সাহিত্যের সর্বদিকে লক্ষ্মীনাথ ছিলেন অবাধলেখনী। জীবনের অধিকাংশ সময় হাওড়া ও সম্বলপুরে অতিবাহিত করেও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মাতৃভূমির সেবা করে গিয়েছেন আজীবন। 'চিন্তাহরণের সংসার চিত্র,' 'দণ্ডিনাথের ফুল', 'সাধনা,' 'সুরভি,' 'কৃপাবর বড়ুয়ার ওভতনি,' 'কদমকলি' ও 'পদ্মকুমারী' লক্ষ্মীনাথের বিশিষ্ট গ্রন্থ। এঁর 'অ মোর অপোনর দেশ' আসামের জাতীয় সঙ্গীত হিশেবে পরিগণিত ঃ

অ মোর আপোনর দেশ
অ মোর চিকুনী দেশ
এ নেথন সুরলা, এ নেখন সুফলা
এ নেখন মরমর দেশ।
অ মোর সুরীয়া মাত
অসমর সুরদী মাত
পৃথিবীর কত বিচারি নোপোয়া
জনমটো করিলেও পাত।
অ মোর ওপজা ঠাই
অ মোর অসমী আই
চাই লওঁ এবার মুখনি তোমার
হেপাহ মোর পলোয়া নাই।
অ মোর অপোনর দেশ……

ছন্দোমধুর মনোরম গীতিকবিতা রচনাতেও ইনি ছিলেন পারঙ্গম ঃ

কি কাম দীঘল মেঘ বরনীয়া সাগরর টউ চুলি
প্রেম পগলার হৃদয় তরণী বুরি পায় গই তলি
মৃণাল দুবাহু কি কাম সাধিব মত্ত প্রণয়ীর ডোল
মিহি মউমাত বিয়াধর বাঁহী বাখি করি মুঠভোল।

ব্যাঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে লক্ষ্মীনাথের 'অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

আমার নাই কি? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে,......অসমীয়া শেক্সপিয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব বম আছে, অসমীয়া মার্টিন লুথার আছে।...বিলাতত টেমচ্ আমার দিখৌ, বিলাতত জাহাজ আমার খেলনাও।...সেই বারে পাহরে যে অসমত ভুঁইকপ আছে। আকৌ কয় অসমীয়ার টকা নাই—অসমীয়া মানুহ মৌন মূর্খ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিন্তচর্চা বঢ়াই অনর্থর গুটি সিঁচিলব কারণ অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।

লক্ষ্মীনাথ প্রমুখ 'জোনাকি'-গোষ্ঠীর লেখকরা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় তাঁদের সাহিত্যিক মানস গঠন করেছিলেন সত্যি, তাই বলে বিদেশের ব্যর্থ অনুকরণের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় কখনো দেননি। প্রাচীনের অর্থহীন কুসংস্কার ও অর্বাচীনের মুখোশ-আঁটা আধুনিকতাকে তাঁরা সমভাবেই আক্রমণ করেছেন। নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় এঁরা ছিলেন উদ্বুদ্ধ। ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপার্স'-এর অনুসরণে লিখিত লক্ষ্মীনাথের 'কৃপাবর বড়ুয়ার ওভতনি'র নামও স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা মূলত রোমান্টিক কবি। এঁর কবিতাবলী ভাবসম্পদে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনই সাবলীল তার প্রকাশভঙ্গি। শব্দযোজনার নিপুণতায় ও ছন্দোমাধুর্যে এঁর কবিতা বৈষ্ণব কবিদের কথা মনে করিয়ে দেয় :

গলত হীরক খোপাত মাণিক হাঁহিত মুকুতাপান্তি
নীলোৎপল হাতে, চরণর পাশে শঙ্কর ধবল কান্তি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত প্রকৃতির মধ্যেও চন্দ্রকুমার প্রাণময় এক সত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন। শুধু চন্দ্রকুমার কেন, এই গোষ্ঠীর সব কবিরই এ একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা, ইংলণ্ডের রোমান্টিক কাব্য-পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের অনুসারী ছিলেন এঁরা। দেবতার স্তুতির বদলে চন্দ্রকুমার মানুষকে বসিয়েছিলেন দেবতার আসনে। এঁর 'তেজিমলা' কাব্যে মানুষেরই জয়গান ঘোষিত। আর, মানুষকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবেসেছিলেন মাতৃভূমিকে, মাতৃভূমির দুর্দশায় মন তাঁর আর্তনাদ করে উঠেছিল :

কি আছে তোমার অসমীয়া ভাই
ধন মান জ্ঞান পেলালা কত

কি দি পূজিবা জগতীচৰণ
নিচিন্ত: উপায় খ্ৰী হল গত।

চন্দ্রকুমারের রচনার পরিমাণ খুব বেশি নয়, প্রাচুর্যের চেয়ে গভীরতার দিকেই এঁর দৃষ্টি ছিল সমধিক। 'জেনাকি'র ইনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ।

হেমচন্দ্র গোস্বামী আমৃত্যু মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। অসমীয়া সাহিত্যে অবদান তাঁর অসামান্য—সার্থক গীতিকবিতা ও সনেট রচয়িতা, অনুপম গদ্যের স্রষ্টা। রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক হিশেবে সাহিত্যে এঁর আবির্ভাব ঘটলেও পরবর্তীকালে সাহিত্য-সংক্রান্ত গবেষণাতেই ইনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী'র প্রণেতা এবং হেমবড়ুয়ার অক্ষয় কীর্তি 'হেমকোষ'-এর সুযোগ্য সম্পাদক হিশেবে এঁর নাম স্থায়ী হয়ে থাকবে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত। লেখকের বিপুল পাণ্ডিত্য, নিপুণ সমালোচনা প্রতিভা, অসীম ধৈর্য ও অপরিসীম পরিশ্রমের স্বাক্ষর এই বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায়। প্রাচীন পুঁথিসাহিত্য সম্পর্কেও ইনি প্রচুর গবেষণা করেন। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে হেমচন্দ্র-সংগৃহীত বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

আধুনিক কাব্যসাহিত্য

'জোনাকি' যে নতুন সাহিত্যাদর্শ তুলে ধরে, পরবর্তী যুগের লেখকরা তারই অনুগামী। 'জোনাকি'র পরে যে-সব পত্রিকা নতুন সাহিত্য-আন্দোলনে সহায়তা করেছিল তাদের মধ্যে 'বহ্নি', 'আলোচনী', 'অসমীয়া', 'আহ্বান', 'জয়ন্তী' ইত্যাদির নাম করা যায়।

ভোলানাথ দাস এই সময়কার এক শক্তিশালী কবি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রভাবে ইনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। মধুসূদনের মত দৈববাদের বিরোধিতায় ও ব্যক্তি-মহিমার উচ্চকণ্ঠ ঘোষণায় এবং হেমচন্দ্রের মত অকৃত্রিম

দেশপ্রেমের বেদনার্ত প্রকাশে এঁর কবিতা হৃদয়গ্রাহী। মধুসূদনের ছন্দোরীতিও ইনি গ্রহণ করেছিলেন :

সে হি রামায়ণ গীত
গাইবে বাঞ্ছিছো আমি মূঢ় অকিঞ্চন
অমিত্র অক্ষর ছন্দে হে মাতঃ বাগদেবি
যে ছন্দে গাইলা—বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে—অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি।

হেমচন্দ্রের 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়'-এর প্রেরণায় লিখলেন :

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত
আসাম কেবল আজিও ঘৃণিত।...
নাই বিদ্যাগুণ শিল্পে অনিপুণ
নামমাত্র কৃষি বাণিজ্য নাই
নাই উদারতা নাই সহিষ্ণুতা
নাহিক মমতা পরোপকারিতা।...
আছে অহিফেন চিরদরিদ্রতা।...
ছি ছি অসমীয়া, উঠা উঠ' উঠা
চির নিদ্রা এড়ি মেলা চক্ষু দুটা।৮

এ-যুগের আরেকজন শক্তিধর কবি রঘুনাথ চৌধুরী—বর্তমান আসামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণতম কবি। মূলত প্রকৃতিপ্রেমিক, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মন্ত্রশিষ্য—'বিহগী কবি' নামে পরিচিত। 'কেতেকী', 'সাদরী' 'দহিকতরা' ইত্যাদির স্রষ্টা হিশেবে ইনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'কেতেকী' লীরিকধর্মী দীর্ঘকবিতা—ইংরেজি 'নাইটএঙ্গেল'-এর সার্থক অসমীয়া সংস্করণ। এঁর আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'গিরিমল্লিকা' :

অয়ি অনবগুণ্ঠিতা ফুল্লশিখরিণী
রঞ্জি মণিকিঁণকার হরিত মেখলা,
আছা শোভি শুভ্রবেশে। করি সুরভিত
লোহিত্যর তীরভূমি শ্যামল বননি।...
যেতিয়া পিছলি পরে মৃদু হিল্লোলত
বুকুর আঁচল, লাজতেই কুচি-মুচি

তলমূৰ কৰি কোন ঋষি তনয়ক
যাচিছিলা যৌবনৰ সৌন্দৰ্য মাধুৰী
নিদাঘৰ দহনত দুখ পোৱা বুলি
আল ধৰিছিল কোন তাপস কুমাৰী······

শ্রীচৌধুরী প্রকৃতিপ্রেমিক, অতীন্দ্রিয়বাদী, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ঘোরতর বিরোধী ও আর্যসভ্যতার পুনরুজ্জীবনবাদী হলেও দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল নয়। উনিশশতকীয় উদার মানবিকতার পূজারী ইনি। 'জন আরু জোনাকি' কবিতায় কবি বলছেন: 'জানি জীবন আমার ক্ষণস্থায়ী, শক্তি সামান্য—তবু নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমি চাইনে। বিবেকের আলোয় পথ চিনে চিনে প্রফুল্ল মনে আমি এগিয়ে যাব কর্তব্যের দিকে। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবমাননাকর জীবনের চেয়ে অনেক মগিমময় এই জীবন। কারণ যত দুঃখ আর যত দুর্দশাই থাকুক তবু এতে রয়েছে স্বাধীনতা······আমার সামান্য শক্তি দিয়ে আমি সেবা করে যাব সমগ্র মানবজাতির।'

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম থেকেও দূরে সরে ইনি থাকেন নি। সমাজ-সংস্কারমূলক অন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, এবং ১৯২১ সালের করবন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্যে এক বৎসর কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছিলেন। তবে, রাজনীতির জটিল ঘোরপ্যাঁচের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অক্ষম হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সাময়িক ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংশ্রব পরিহার করেন। কিন্তু যে-রাজনীতি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি, তার আকর্ষণ সৎ শিল্পী কখনো অস্বীকার করতে পারেন না। তাই আজ আবার এঁকে গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা যাচ্ছে।

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী এ-সময়কার শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কবি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অম্বিকাগিরি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উত্তেজনাময়ী দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখে সারা দেশে ইনি একদা প্রবল আলোড়নের সঞ্চার করেন। 'তুমি' এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। দুর্গেশ্বর শর্মার কবিতাবলী অতিরিক্ত দার্শনিক ভাবাপন্ন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখে হিতেশ্বর বারবড়ুয়া ও চন্দ্রধর বড়ুয়া এ-যুগে খ্যাতি অর্জন করেন। তবে প্রথমোক্ত জন অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সার্থক সনেট-শিল্পী হিশেবে।

তিরিশ দশকে অসমীয়া সাহিত্যে কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটে। কাব্যক্ষেত্রে নতুন সুর, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আভাষ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যতীন্দ্রনাথ দুয়ারা। 'ওমর খৈয়াম'-এর অনুবাদ করে পরিচিত হন 'ওমর খৈয়ামে'র কবি নামে। কিন্তু, শুধু কৃতি অনুবাদক ইনি নন, মৌলিক কবিপ্রতিভারও অধিকারী। অসমীয়া সাহিত্যে প্রথম সার্থক গদ্যকবিতার স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ। এঁর গীতিকবিতাও অনুপম :

কপি থকা ওঁঠ দুটি নোয়ারে.ফুটাব
যাওঁ বোলা বিদায়র বাণী
দুগালে বাগরি যায় চকুলো দুধারি
মাগে মাথো শেষর মেলানি
যাও বোলা বিদায়র বাণী ॥···

'আপোন সুর', 'কথাকবিতা' এঁর স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ। রহস্যবাদী কবি হিশেবে নলিনীবালা দেবী ও ধর্মেশ্বরী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। নলিনীবালা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত। এঁর 'সপোনর সুর' ও 'সন্ধিয়ার সুর'-এ অতীন্দ্রিয়-আকুতির আবেগাকুল বেদনা অনুরণিত। প্রেমের কবিতা লিখে এ-যুগে খ্যাতিমান হন গনেশচন্দ্র গগৈ। বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি ছিলেন গগৈ, অকালে মারা না গেলে হয়ত-বা শ্রেষ্ঠতমের সম্মান লাভ করতেন। এঁর 'পাপরী' কাব্যগ্রন্থে যেমন নতুন নতুন ও অভিনব রূপকল্পের সন্ধান মেলে অন্যত্র তা দুর্লভ।

এ-সময়কার কবিতার আর-একটি প্রধান লক্ষণ দেশপ্রেম। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রভাবে একদল কবি সবিশেষ অনুপ্রাণিত হন, তাঁদের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে সারা দেশ। এই কবিদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শৈলধর রাজকোয়া ও বিনন্দচন্দ্র বড়ুয়া।

শৈলধরের 'পাষাণ প্রতিমা' কবিতাটি বিখ্যাত :

উঠ'াহে ফুলরা, উঠ'াহে চতলা, উঠ'া দেববালা স্বরূপ ধরি,
পূর্ণ হল আজি শতেক বছর আরু কতকাল থাকিবা পরি ?

কোন সরগর পারিজাত ফুল
কারনো শাপত হেরুবালা কুল
চির অচেতন ফুলর চতলা পাষাণ প্রতিমা অপোন ভুলি,
নিষ্ফুট সুরেরে পিজান থলত চির বিষাদর রাগিণী তুলি ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসামের সমাজজীবনে মহা সংকটের সৃষ্টি করে। সেই সংকটের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও অর্থনৈতিক কারণে বইপত্রের প্রকাশ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ থেকে লেখকরা বঞ্চিত হন। তাই তেমন উল্লেখযোগ্য কোন নতুন কবিপ্রতিভার সন্ধান অতিআধুনিক অসমীয়া কাব্যে মিলবে না। তবু এঁদের ভেতর অমূল্য বড়ুয়ার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পরিতাপের বিষয়, কলকাতায় ষোলই অগাস্টের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় আসামের এই তরুণ কবির শোচনীয় জীবনাবসান ঘটে। 'বেদুইন'-এর কবি আবদুল মালিকের ওপর প্রথমে অনেক আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু ইদানীং তিনি কাব্য-রসিকদের নিরাশ করেছেন। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা প্রতিশ্রুতিবান কবি, সুরকার ও নৃত্যশিল্পী—কিন্তু অসাধারণ কিছু নন। 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'য় বহু আধুনিক কবির সাক্ষাৎ মেলে সত্যি, পুঁজিবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম ইত্যাদি যুগসম্ভব সমস্যাবলী নিয়ে রচিত কবিতাও তাতে প্রচুর রয়েছে, নতুন নতুন কাব্যআঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত নেই—রসোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা কিন্তু নিতান্তই নগণ্য। বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক কবিতা লিখতে হলে যে কাব্যের কতকগুলি প্রাথমিক দাবি মেটাতে হয়—মেটাতেই হয়—অতিআধুনিক কবিরা আজো সে-সম্পর্কে পুরোপুরি ওকীবহাল হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয় না।

আধুনিক কথাসাহিত্য

আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রথম উপন্যাস লেখেন লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, সে-কথা উল্লেখ করেছি আগেই। এঁর উপন্যাসের নাম 'পদ্মকুমারী'। উপন্যাস হিশেবে 'পদ্মকুমারী' তত সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কথাশিল্পী লক্ষ্মীনাথের চেয়ে কবি লক্ষ্মীনাথের পরিচয়ই 'পদ্মকুমারী'তে অধিকতর স্পষ্ট।

লক্ষীনাথের সমসাময়িক খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক পদ্মনাথ গোহাঞী বড়ুয়া। এঁর 'ভানুমতী' সে-সময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতার কাছে বইটির দাম থাকলেও আজকের পাঠকের কাছে এর তেমন-কোন আবেদন নেই। পদ্মনাথেরই প্রায়-সমকালীন লেখক রজনীকান্ত বরদলৈ। এঁকেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হিশেবে গণ্য করা যায়। স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে ইনি প্রভাবিত ছিলেন। 'মিরিঝিয়রী' ও 'মনোমতী' এঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে বিখ্যাত। 'মিরিঝিয়রী'তে প্রকৃতির পটভূমিকায় দুটি উপজাতীয় তরুণ-তরুণীর প্রেমের যে বিয়োগান্ত কাহিনী লেখক তুলে ধরেছেন, তা সার্থক রোমান্সের পর্যায়ে উন্নীত। 'মনোমতী' বর্মী অভিযানের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যর্থ প্রতিরোধের মহিমময় কাহিনী। মূলত 'মনোমতী'ও রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত। তবে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ঐতিহাসিক ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলার দুরূহ ক্ষমতা ছিল রজনীকান্তর।

পরবর্তীকালে যাঁরা ঔপন্যাসিক হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে দৈবচন্দ্র তালুকদার ও দণ্ডীনাথ কলিতার আসন সকলের আগে। সমসাময়িক-সমাজজীবন উপজীব্য এঁদের উপন্যাসের। বিশেষ করে, স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টিতে দুজনেই এঁরা পারদর্শী। কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পই এ-যুগে অধিকতর সমৃদ্ধি অর্জন করে। শরৎচন্দ্র গোস্বামী, লক্ষীধর শর্মা, রমা দাস, বীণা বড়ুয়া প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বেণুধর রাজকোয়া কয়েকটি সামাজিক ও অতুলচন্দ্র হাজারিকা অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক লিখেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন 'শোণিত কুয়রী'র লেখক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। এঁর আরেকটি বিখ্যাত নাটক 'লভিতা'—সামন্ততন্ত্রের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে এই নাটকে। প্রথম অসমীয়া সবাক চলচিত্র 'জয়মতী'র প্রযোজক-পরিচালক জ্যোতিপ্রসাদ। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নিজে চা-বাগানের মালিক হয়েও গণ-সংস্কৃতিতে ছিলেন একান্ত আস্থাবান, আসামে গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা। লোকসঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন করে সঙ্গীতক্ষেত্রে ইনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। প্রগতিশীল কবি, নাট্যকার, সাংবাদিক, চিত্রপরিচালক ও

সুরকার জ্যোতিপ্রসাদের অকাল বিয়োগ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অপরিসীম ক্ষতি করেছে।

সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে মিত্রদেব মহান্ত ও রোমান্টিক নাটক-রচনায় কীর্তিনাথ বরদলৈর নাম করা যায়। সংস্কৃত ও কয়েকটি ইংরেজি নাটকের অনুবাদেও আধুনিক নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ।

কিন্তু রজনীকান্তর উপন্যাস এবং হেমবড়ুয়া ও গুণাভিরামের নাটকের মধ্যে একদা ভাবী অসমীয়া কথাসাহিত্যের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তা পুরোপুরি সফল হয়ে উঠতে পারেনি—উপরি-উক্ত লেখক-লেখিকাদের দান স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতেই হবে। এঁরা মোটামুটি গল্প বলে গিয়েছেন, মোটামুটি জীবন্ত চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু যুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গি, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং আঙ্গিকগত কলানৈপুণ্যের সুষ্ঠু পরিচয় দিতে কেউই পারেন নি। তাই বিদগ্ধজনের মনের খিদে মেটেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কথাসাহিত্যে এক নতুন যুগের উন্মেষ দেখা যায়। মুহম্মদ পীয়ারের 'সংগ্রাম' ও 'হেরোয়া স্বর্গ,' রাধিকামোহন গোস্বামীর 'চকনাইয়া' ও নবকান্ত বড়ুয়ার 'কপিলিপারিরা সাধু'-কে সত্যিকারের আধুনিক উপন্যাসের নিদর্শন হিশেবে গ্রহণ করা চলে। আজকের সমাজজীবন ও সমস্যাবলী এই লেখকরা আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকসমাজের বাস্তবধর্মী জীবনচিত্র হিশেবে শেষোক্ত বইটির নাম উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্পে আধুনিক কালে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন আবদুল মালিক, যোগেশ দাস, কেশব মহান্ত, মানেক দাস ও বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গভীর মানবতাবোধ এঁদের রচনার প্রাণ-প্রেরণা। সৌরভ চালিয়ার গল্পে একটি রুচিমার্জিত সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় মেলে। তবে, আঙ্গিক সম্পর্কে সেই পুরনো অভিযোগ প্রযোজ্য আজও। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে নজর যত তীক্ষ্ণ তার সুচারু শিল্পায়নের প্রতি যত্নবান তত কথাশিল্পীরা নন।

গল্প-উপন্যাসের মত নাটকের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে আগেকার পৌরাণিক নাটকগুলির কদর আর নেই। দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী সমস্যামূলক সামাজিক নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রবীণ বড়ুয়া ও সারদা বরদলৈ। প্রবীণ ফুকনের ঐতিহাসিক

নাটক 'মনিরাম দেওয়ান' আধুনিক অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের এক স্মরণীয় অবদান বলে গণ্য। হাস্যরসাত্মক নাটকের অভাব কথঞ্চিৎ মিটিয়েছেন কুমুদ বড়ুয়া।

অন্যান্য

অসমীয়া গদ্যসাহিত্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, ভট্টদেবের 'কথাগীতা' ষোড়শ শতাব্দীর অসমীয়া গদ্যের অপরূপ নিদর্শন। অসমীয়া গদ্যের জন্ম অবিশ্যি ষোড়শ শতাব্দীরও আগে।

আধুনিক কালে প্রবন্ধসাহিত্যে সাহিত্যরসাশ্রিত গদ্যের প্রবর্তক সত্যনাথ বরা। তারপর অনেক লেখকই সত্যনাথের গদ্যরীতির অনুসরণ করেছেন। এ-যুগের বিশিষ্ট গদ্যলেখকদের মধ্যে ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি, উপেন্দ্রনাথ লেখারু ও ডিম্বেশ্বর নেওগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসামের ইতিহাস এবং অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন ডাঃ সূর্যকুমার ভূঞা ও ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি। হরমোহন দাস, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, রাজমোহন নাথ, কেশব নারায়ণ দত্ত, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রৈলোক্য গোস্বামী, তীর্থনাথ শর্মা, বেণুধর শর্মা, কালীরাম মেধী, মহেশ্বর নেওগ, হরিনারায়ণ দত্ত বড়ুয়া প্রমুখ এ-যুগের অন্যন্য কৃতি গদ্যলেখক। বহু মুসলমান লেখকের দানেও আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে মওলবী মফিজউদ্দীন হাজারিকা, খান বাহাদুর আতোয়ার রহমান, খান বাহাদুর ফৈজুদ্দিন অহ্‌মদ ও ডাঃ মহিদুল ইসলাম বরার নাম করা যায়। অসমীয়া সাহিত্যে ফার্সীর প্রভাব সম্পর্কে ডাঃ বরার গবেষণা অতিশয় মূল্যবান।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কারণে সুবিপুল প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিককালে অসমীয়া সাহিত্যের যথোচিত বিকাশ ঘটেনি। পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ বলে পুস্তক-প্রকাশনও লাভজনক ব্যবসা হিশেবে গড়ে ওঠেনি। কিছুদিন আগেও তাই অধিকাংশ লেখককে নিজেদের খরচে নিজেদের বই প্রকাশ করতে হত। গরিব লেখকদের বই অপ্রকাশিতই থেকে যেত। রাজনীতির প্রতি জনসাধারণের যে-পরিমাণ আগ্রহ ফুটে উঠেছিল, সাহিত্যের প্রতি তদনুরূপ নয়। অধুনা পট-পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে আজ নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

তামিল

'মাদ্রাজী ভাষা'র কথা প্রায়ই আমরা শুনে থাকি, কিন্তু 'মাদ্রাজী ভাষা'য় কথা বলতে এযাবৎ কাকেও শোনা যায়নি, মাদ্রাজের অধিবাসীদেরও নয়। কারণ, তা অসম্ভব। যেমন অসম্ভব সুইটজারল্যাণ্ডের কোন বাসিন্দার সুইস ভাষায় কথা বলা।

কারণ সুইসের মতই মাদ্রাজী বলে কোন ভাষার অস্তিত্বই নেই।

মাদ্রাজ অঞ্চলের তথা দক্ষিণ-ভারতের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রাবিড় ভাষীরা ভারতে আসে খৃস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে। ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা আর্য সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। মোহেন-জো-দড়ো ও হড়াপ্পায় দ্রাবিড় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আজও আর্যজনের বিস্ময় উদ্রেক করে।

উপভাষাগুলির কথা বাদ দিলে প্রধান চারটি দ্রাবিড় ভাষা হল : তামিল, মালয়ালম, কানাড়া ও তেলুগু। এর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ তামিল। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে তামিল অন্যতম। সংস্কৃতের মতই এর ধ্রুপদী সাহিত্য সমৃদ্ধ, কিন্তু সংস্কৃতের মত তামিল আজ 'মৃত' ভাষায় পরিণত নয়। অধিকন্তু, দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র তামিলই এখন পর্যন্ত 'জাত' বজায় রেখে চলতে সক্ষম—একটি মাত্রও সংস্কৃত বা আর্য শব্দ ব্যবহার না করেও বিশুদ্ধ তামিলে বাক্য গঠন সম্ভব। এমন অফুরান প্রাণশক্তির পরিচয় পৃথিবীর ভাষা-ইতিহাসে আর দেখা যায়না।

মাদুরা, (মদুরা), ত্রিচিনোপল্লী (তিরুচ্চিরাপ্‌পল্লি বা ত্রিশিরপুরম), তাঞ্জোর (তঞ্জাউর), মহাবলীপুরম ও রামেশ্বরম তামিলনাদের অতীত শিল্প-সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর আজো বহন করছে। তিরুক্কুরল, সিলপ্‌পধিকারম, মনিমেকলৈ, বলৈয়াপতি, কুণ্ডলকেশী ও কাম্বারামায়ণমের মধ্যে প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের যে নিদর্শন মেলে সত্যিই তা বিস্ময়কর। তিরুক্কুরল ২২০০ বছর আগে রচিত—এর স্রষ্টা তিরুবল্লুবরকে উপনিষদের ঋষির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। এর আগের এবং পরের বহু গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তিরুক্কুরলের জনপ্রিয়তা আজো অব্যাহত। সংস্কৃত, লাতিন, ফরাসি,

ইংরেজ, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে। এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিশেবে এটি পরিগণিত। বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কবি বেদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন বলে তিরুক্কুরল 'তামিলবেদ' নামে পরিচিত। বইটি তিন ভাগে বিভক্ত: ধর্ম, অর্থ, কাম। সবধর্মের মানুষের কাছে এর আবেদন সমান। নীতিকাব্য, কিন্তু গীতিকাব্যের রসমাধুর্যে ভরপুর:

যদি না বাদল নামত আকাশ বেয়ে
ক্ষুধিত দেবতা ফিরত প্রসাদ চেয়ে।

* * *

বেণুবীণা-রব ভালো কে গো মনে গোনো
শিশুর কাকলি বুঝি শোননি কখনো!

* * *

নিলাজ হৃদয়ের কেমন কাজ
সুতোয় বাঁধা যেন পুতুল-নাচ।

* * *

চোখে-চোখে-রাখা কথা থাকলে
কি হবে না-ই যদি ডাকলে!

* * *

চাষী তার মৃত্তিকাতে যদি না তাকায়
প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে মাটি গায়ে মাটিই মাখায়।

(অনু: সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

কোন কোন সমালোচকের মতে কাম্বারামায়ণমের স্রষ্টা কম্বনের আসন বাল্মীকির ওপরে—ওপরে যদি না-ও হয় পাশে নিশ্চয়। কাম্বারামায়ণম রচিত একাদশ শতাব্দীতে—কিন্তু নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচশ বছর তামিল সাহিত্যে কম্বন-যুগ নামে পরিচিত।

অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতার বিকাশ ইংরেজ-আগমনে, তামিল সাহিত্যে তারও আগে। ১৬৭৭ সালে এক স্পেনীয় পাদ্রী—গন্‌জালভেজ—প্রথম তামিলী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে গদ্যের সুপ্রচুর নিদর্শন থাকলেও আধুনিক যুগে গদ্যের প্রচলন শুরু হয় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে। আধুনিক তামিল গদ্যের প্রথম লেখক তত্ত্ববোধস্বামী (আসল নাম রেভ্‌রেণ্ড রবার্ট দি বোচিলি, ১৬০৬ থেকে ১৬৫৬ সাল পর্যন্ত ইনি ভারতে

ছিলেন)। এ-যুগের আর-একজন শক্তিশালী গদ্যলেখক বিরম মুনী (আসল নাম ফাদার বেসচি)। বিরম মুনীর তামিল ব্যাকরণ ও 'ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড'-এর অনুকরণে রচিত উপন্যাসটির নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষায় প্রথম বীজগণিতের বই লেখেন ডক্টর ক্যারল ; এবং শরীরতত্ত্ব, অস্ত্রবিদ্যা ও জ্যোতিষ সম্পর্কে ডক্টর এস এফ গ্রীন, জ্যামিতি ডেভিড সলোমন। প্রথম তামিল সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতাও বিদেশি ধর্মপ্রচারকরা—'তামিল পত্রিকা' (১৮৩৯)। আধুনিক তামিল সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণে বিদেশি ধর্মপ্রচারকদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব জেগে উঠে। এই সময় বেদনায়কম পিল্লে ও গোপাল কৃষ্ণ ভারতীর মত কয়েকজন প্রতিভাধর লেখক মাতৃভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদাকে তুলে ধরার মহান আদর্শে ব্রতী হন। তাঁদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন আরো-অনেকে, তার মধ্যে নব্যশিক্ষিতের সংখ্যাও নগন্য নয়। সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী, সুন্দরম পিল্লে, দামোদর পিল্লে, রাজম আয়ার প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রীই প্রথম অনুভব করেন যে, কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে সহজ একটা আত্মীয়তা গড়ে তোলা দরকার, দরকার আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাসাদি নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন। নাটকের অভাব দূর করার জন্যে শেকসপীয়রের আঙ্গিকের অনুকরণে 'মানবিজয়ম' আর 'কলাবতী' দুটি পদ্য নাটকও ইনি রচনা করেন। সুন্দরম পিল্লের 'মনোন্‌মণীয়ম' নাটক সূর্যনারায়নেরই পদাঙ্কনুসরণ। নাটক হিশেবে উল্লেখযোগ্য না হলেও কাব্য হিশেবে বইটি উৎকৃষ্ট।

প্রস্তুতিকালকে বাদ দিলে আধুনিক তামিল সাহিত্য মোটামুটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত : সূচনাকাল, ভারতী-যুগ, ভারতী-উত্তর যুগ। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তিলকের অভ্যুদয় পর্যন্ত সূচনাকালের বিস্তৃতি। প্রধানত ধর্মকে আশ্রয় করেই এ সময় সাহিত্যের নতুন বিকাশ। আরুমুগ নাবলর এই সময় সহজ সরল গদ্যে 'রামায়নম,' 'ভারতন্,' 'পেরিয়াপুরাণম' ইত্যাদি প্রণয়ন করেন। আধুনিক তামিল সাহিত্যের প্রথম রোমান্স বেদনায়কম পিল্লের 'প্রতাপ মুদলিয়ার

চরিত্রম' ও প্রথম উপন্যাস রাজম আয়ারের 'কমলম্বল চরিত্রম' এ-যুগের রচনা। এবং 'মানবিজয়ম', 'কলাবতী', 'মনোন্‌মণীয়ম'-ও। প্রথম তামিল দৈনিক 'স্বদেশমিত্রম্‌'-এর প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ সালে, ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে সাথে। 'স্বদেশমিত্রম্‌'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সুব্রহ্মণ্য আয়ার কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতাদেরও অন্যতম।

কাব্যসাহিত্য

আধুনিক তামিল সাহিত্যে নবজাগৃতির স্রষ্টা কবি সুব্রহ্‌মণ্য ভারতী। বিদেশি শিল্পসভ্যতার প্রেরণায় নয়, বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে নতুন পথের দিশারী করে তোলে।

বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক—রাজনৈতিক ভারতের আগ্নেয় অভ্যুত্থানের যুগ। তামিল সাহিত্যে ভারতীর কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত হল জাতির মর্মবাণী। যুগযুগান্তের ঐতিহ্য ভেঙে সাহিত্যে ধর্মের সিংহাসনে দেশ-প্রেমকে অভিষিক্ত করলেন তিনি। শুধু বক্তব্যের নয়, সেই সঙ্গে আঙ্গিকেরও ঘটল বৈপ্লবিক রূপান্তর। ভাষাকে তিনি গড়ে তুললেন নতুন করে। নতুন নতুন ছন্দ, চিত্রকল্প, ভাব ও কল্পনার সাহায্যে এবং জনপ্রিয় শব্দাবলীর প্রয়োগে তামিল সাহিত্যের চেহারাই দিলেন পাল্টে। অথচ ভারতী বেঁচে ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর।

জনমনে তখন প্রবল হতাশা। ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা। দেশপ্রেমিক কবি একদিকে যেমন দেশের জনতাকে শোনালেন আশার বাণী, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কষাঘাত করলেন 'দেশি সাহেব'দের :

অন্ধ কখনো পায় রাজত্ব ?
ঐহিক সুখ আর গৌরব ?
নপুংসক কখনো পারে জীবনকে
উপভোগ করতে ?

আর স্বাধীন ভারতের যে ছবি জনতার সামনে তুলে ধরলেন একটি গানের মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে তা ফুটে উঠেছে :

খুশি মনে সবাই নাচছে গাইছে
সাধের স্বাধীনতা এসেছে আজ

কাজের জয়গান গাইছে সকলে
আর ভৎর্সনা করছে তাদের
যারা কাজ করেনা—
শুধু খায়দায় আর মজা লোটে।

ভারত সুন্দর কাব্যে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছবি:

জয় হোক সমগ্র ভারতের
ত্রিশ কোটি মানুষের এক সঙ্ঘের জয় হোক।
সকলের সমান দাবি এই সঙ্ঘের ওপর
সকলেই আমরা ভারতবাসী
আমাদের সকলেরই এতে সমান অধিকার
সমান মর্যাদা।
একজাতি একপ্রাণ আমরা।
সারা ভারতের শাসক আমরা।
হ্যাঁ, সবাই আমরা ভারতের শাসক।
একের গ্রাস অন্যে কাড়বে
এ আর চলবে না—
একের দুঃখ অন্যে দেখবে
এ আর চলবে না—
এ আর চলবে না আমাদের মধ্যে।

অনেকক্ষেত্রে ভারতী অবশ্য ধর্মীয় কাঠামোকে আশ্রয় করেন, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন লৌকিক জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। দুঃশাসনের রক্তে বেণীবন্ধনের অতিপুরাতন কাহিনী নিয়ে রচিত এঁর 'পাঞ্চালী শপদম' একদা সারা দেশে এমন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল যে সরকারি কোপ এড়াবার জন্যে কবিকে পণ্ডিচেরী গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

'পাঞ্চালী শপদম'-এ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে কবি বলেছেন—যখন কোন পুজারী ব্রাহ্মণ তার নারায়ণ শিলা বিক্রি করে দেয়, চৌকিদার যখন তার আশ্রিত বাড়িটিকে বন্ধক রাখে, আমরা ধিক্কার দেই। তেমনি হাজার নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত যুধিষ্ঠির কিনা দেশকে বাজি রেখে হেরে গেল—এ অত্যন্ত হেয় কাজ। ছি! ছি! ছি!

দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তার দুধারে পুরবাসীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে শুধু। তাদের নিষ্ক্রিয়তায় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছেন কবি ঃ

পুরবাসীদের ক্ষুদ্রতার কথা কী আর বলব !
ভীরু কাপুরুষের দল !
ওই হিংস্র পশুর মত রাজকুমারকে
পায়ের তলায় দলিতমথিত করে
স্বর্ণলতাসম দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে পৌঁছে দেবার বদলে
সারিবদ্ধ গাছের মত দাঁড়িয়ে
ওরা কিনা বিলাপ করছে !
পুরুষত্বহীন এই ক্রন্দনে
কারো কি কোন সাহায্য হয় ?

বলা বাহুল্য, বর্তমান ভারতের ছবিই ফুটে উঠেছে 'পাঞ্চালী শপদম'-এ। যুধিষ্ঠির—যুধিষ্ঠিরদের—সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্বের কথাও স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে।

ভারতী নিজে অভিজাত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামিকে তিনি বরদাশ্‌ত্‌ করতেন না। ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, ঐশ্বরিক ধাপ্পায় নয় ঃ

মূঢ়রাই শুধু বলে ঃ
মৃত্যুর পরে মানুষের ঘটে অক্ষয় বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি।
প্রেতবাক্যের মত শাস্ত্র তাদের মিথ্যা এই স্তোক দেয়।
হে আমার মহাশঙ্খ !
বজ্রনির্ঘোষে তুমি ঘোষণা কর—
এই জঘন্য মিথ্যার পিছনে মানুষ যেন ঘুরে না মরে।

শুধু বিদেশি শাসন নয়, স্বদেশি সামাজিক দুর্নীতি ও অসাম্যের বিরুদ্ধেও কবি ভারতী উদ্যতলেখনী। এক প্রবন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—'এখন থেকে আমাদের নীতি হল—যদি একজন মানুষও উপবাসী থাকে তাহলে সমগ্র পৃথিবীকে আমরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করব।'

কোন কোন মহল ভারতীকে অধ্যাত্মবাদী বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী কবি বলে চিত্রিত করবার প্রয়াস পান। ভারতী অধ্যাত্মবাদী অবশ্যই, তবে

এ-অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিরোধ নেই প্রগতিবাদের। এ-অধ্যাত্মবাদ বাস্তবকে অস্বীকারের অজুহাত নয়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অভিযোগও অতিবাম-বিপ্লবী মনোভাবপ্রসূত। যে-কবি প্রথম মহাযুদ্ধে শক্তিমদমত্ত জার্মানির কাছে শিশু বেলজিয়ামের পরাজয়ে সুদূর ভারত থেকেও বেলজিয়ান গণশক্তিকে এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন :

হেরে গিয়েও তুমি তুলে ধরেছ
ন্যায়ের নিশান……
শক্তিমান শত্রুর মুখোমুখি তুমি দাঁড়িয়েছ
বীরের মত,
তুমি বলহীন, কিন্তু কৃতিত্বে গরীয়ান
হে বেলজিয়াম,
তোমার জয় হোক !

রুশবিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসানে আনন্দে গেয়ে উঠেছিলেন :

মহাকালী পরাশক্তির কৃপাদৃষ্টি পড়েছে
রাশিয়ার ওপর,
যুগবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড বেগে।
ঘৃণ্য শোষকের দল হাহাকার করতে করতে
হল ধরাশায়ী।

তাঁর সম্পর্কে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অভিযোগ ?

ব্রাহ্মণ হলেও ধর্মের দিক দিয়ে ভারতী ছিলেন সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। খৃস্ট ও আল্লাহ্‌কে নিয়েও তিনি ভাবগম্ভীর কবিতা রচনা করেছেন। আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ করে একটি কবিতায় তিনি বলছেন :

যে জন মূঢ় মিথ্যাচারী দুষ্ট তামসিক
সজ্জনেরে এড়িয়ে চলে যে মহা দাম্ভিক
করাল কালের ভয়ে তারা ত্রস্ত ভীত হলে
তুমিও প্রভু রাখ তাদের তোমার চরণতলে।

(অনু : চিত্ত মাইতী)

পরিতাপের বিষয়, জীবিতকালে ভারতী তাঁর যথাযথ মর্যাদা পাননি। মান্যগণ্য সমালোচকপ্রবররা তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কবি হিশেবে স্বীকার

করেননি। যেহেতু, ভারতীর কবিতা পড়ে জনসাধারণ উদ্দীপিত উজ্জীবিত হয়েছে, দলে দলে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—অতএব তাঁর কবিতার বিশুদ্ধতা রইল কোথায়!—যুক্তিটা সম্ভবত এই। কিন্তু পরবর্তী যুগ ভারতীর প্রকৃত মূল্য বোঝে, মৃত্যুর পর ভারতী তাঁর যোগ্য মর্যাদা লাভ করেন। আজ ভারতী তামিলনাদের জাতীয় কবি হিশেবে পূজিত। ভারতীর জন্মদিন আজ জাতীয় উৎসবে পরিণত। এত্তিয়াপুরমে (এট্টয়্যাপুরম) ভারতীর স্মৃতিমন্দির শিল্পী-সাহিত্যিকদের আজ পরমতীর্থ। জনসাধারণ তাঁকে আজ দেবতা বলে মনে করে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারতী সম্পর্কে একদা বলেছিলেন—He is entitled by his genius and his work to rank among those who have transcended all limitations of race, language and continent and have become the universal possession of mankind—এর মধ্যে অতিরঞ্জন নেই একবিন্দু। বিখ্যাত তামিল পণ্ডিত, বেদের অনুবাদক শ্রী এম আর জম্বুনাথনের মতে—ভারতীর মত কবির আবির্ভাব কোন দেশে হাজার বছরেও একজন হয় কিনা সন্দেহ।

'কোকিল', 'কান্নান পাট্টু' (কৃষ্ণগীতি) ইত্যাদি ভারতীর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। বিশেষ করে 'কান্নান পাট্টু'। নিজের আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণকে কবি এখানে স্নেহময়ী জননী হিশেবে চিত্রিত করেছেন। ভারতীর প্রকৃতিপ্রেম ও ভগবৎভক্তি অঙ্গাঙ্গী হয়ে মিশে গিয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। কবি বলছেন—শিশুকে মা খেলনা দিয়ে ভোলান, কিন্তু সে-খেলনা নিতান্তই নশ্বর। সে-খেলনার মোহে সন্তানের মন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়, ভূমার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু জননীকানাই বিশ্বপ্রকৃতিরূপ যে খেলনা সৃষ্টি করেছেন তা অবিনশ্বর। ব্রহ্মরূপিণী জননীকানাই জীবসন্তানের মন ভোলাবার জন্যে, তার মনের সর্বাঙ্গীন মুক্তি সাধনের জন্যে এই পাহাড়-নদী-বন-উপবন চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারা ইত্যাদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মহৎ বস্তুগুলি সৃষ্টি করেছেন :

> য়ুল্ল য়ুল্লত্তে বিট্টাদে-অম্মং
>
> য়ুয়িরেন্নুং মূলৈয়িনিল্ য়ুণবন্নুং পান্ ;
>
> বল্লমুর বৈত্তেনক্কে-এণ্ড্রন্
>
> বায়িনিক্কেডিডূট টুমোর-বৈয়্যমুডৈয়াল

কহ:নমুং পেরুক্টৈয়াল্-এট্রে
কট্টি নিবৈবান্ এমুং তন্ কৈয়িলপৈত্তু
মগ্রেমুং তন্ মডিয়িল্বৈত্ত-পল
মায়মুরুং কবৈ শোল্লি মন কলিপ্পল।

—আমার মা'র (কৃষ্ণের) প্রাণরূপ স্তনের জ্ঞানরূপী দুধ যতই পান করি, তৃপ্তি কখনো হয় না। তিনিই সব কিছু আমার জন্যে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সবকিছু সযতনে আমার মুখের কাছে তুলে ধরেন। কৃষ্ণ নামে তিনি পরিচিত। আদিগন্ত আকাশ-হাত দিয়ে আমায় আলিঙ্গন করে, অসীম পৃথিবীরূপী কোলে আমায় শুইয়ে কত-না মনমনোহর গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে আমার মন ভোলান তিনি।

তিণ্ড্রিড প্পণ্ডং পলিং-চেবি
তেবিহয়ক্কেট্ক নল্লহিহলুং
এণ্ড্র স্বপ্পবহদক্কে' অরি-
কডৈয় মেটাস্তোবহ্মবল কোড়ুত্তান।

—খাবার জন্যে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য, শ্রবণের জন্যে শ্রুতিমধুর ভালো ভালো গান, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবার জন্যে বন্ধুবান্ধব—এ সবই তাঁর দান।

'কান্নান পাট্টু' ভারতীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ নিঃসন্দেহ।

শুধু কবি নন, সঙ্গীতশিল্পী, অনুপম গদ্যের স্রষ্টা এবং গীতার অনুবাদক হিশেবেও ভারতীর নাম স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয়ের কয়েকটি গল্পের অনুবাদ করেছিলেন, নিজেও লিখেছিলেন কয়েকটি। 'চন্দ্রিকা' নামে একটি উপন্যাসও শুরু করেন, শেষ করে যেতে পারেননি। সাংবাদিক হিশেবেও ভারতী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথমে ছিলেন 'স্বদেশমিত্রম্'-এর সহকারি সম্পাদক, পরে হন 'ইন্দিয়া'র সম্পাদক।

ধর্মের স্থানে দেশপ্রেমকে, দেবতার আসনে মানুষকে অভিষিক্ত করে ভারতী যে-নতুন যুগের সূচনা করেন, আজকের কবিরা পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কবিমণি দেশি কবিনায়কম পিল্লৈ ও নামক্কল রামলিঙ্গম পিল্লের নাম। কবি হিশেবে কবিমণি রামলিঙ্গমের চেয়ে অধিকতর প্রতিভাবান হলেও জনপ্রিয়তায় রামলিঙ্গম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' এর মত তামিলনাদে এঁর 'চরকা'র

জনপ্রিয়তা। গান্ধিজীর মন্ত্রশিষ্য, 'গান্ধিকবি' নামে পরিচিত। মাদ্রাজের রাজকবির সম্মানও ইনি লাভ করেছিলেন। এঁর কাব্যগ্রন্থ 'শঙ্খলি' ('শঙ্খধ্বনি'—দেশপ্রেমমূলক কবিতার সংকলন) ও কাব্যোপন্যাস 'অবন্নুম-অবল্লুম' ['সে (He) ও সে (She)'] পাঠকসমাজে সবিশেষ জনপ্রিয়। তবে এঁর কবিতা বড়-বেশি উপদেশমূলক। কবিমণি দেশি কবিনায়কম রামলিঙ্গমের চেয়ে স্থিতধী, মিতভাষী। ভারতীর উত্তরসাধক হলেও প্রকৃতপক্ষে ইনি ধ্রুপদী ধারার অনুসারী। গীতিকবিতা, বর্ণনামূলক কবিতা, ব্যঙ্গাত্মক কবিতা—সবেতেই কুশলী শিল্পী। আর্নল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' ও ওমর খৈয়ামের অনুবাদক হিশেবেও খ্যাতিমান। রাজকবির সম্মান প্রথমে সরকার এঁকেই দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রামলিঙ্গমের জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করে স্বেচ্ছায় ইনি নিজের দাবি পরিত্যাগ করেন। রাজনীতিকে কবিমণি সযত্নে পরিহার করে চলেন, তাই বলে সমাজ সম্পর্কে উদাসীন নন :

মন্ত্র পড়ে কখনো চাষাবাদ হয় ?
যে মেহনৎ করে
জমির মালিক সে-ই।

এ-সত্য উচ্চারণে পরাঙ্মুখ নন। রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে কবি সচেতন। সাধারণ মানুষের মতই যুদ্ধকে তিনি মনে করেন মানবজাতির অভিশাপ বলে। তাই সাধারণের ভাষায় সাধারণ মানুষের মনের কথাটি প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর কবিতায় :

যুদ্ধ শেষ হোক। আবাদ বাড়ুক।
জিনিসপত্রের দাম কমুক।
সব মানুষ
ভাই ভাই হোক।

'মলরুম-মালৈয়ুম' ('ফুল-মালা') এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

ভারতী দাসন বিপ্লবী কবি। কবি ভারতীর অনুগত ভক্ত। তবে, প্রথমে আস্তিক থাকলেও এখন ইনি নাস্তিক—তামিলনাদের প্রথম নাস্তিক কবি ভারতী দাসন। একটি গানে ইনি বলেছেন :

ধর্মনায়ের যাত্রীদল
তোরা হলি বলির পশু
মূর্খতারই শিকার তোরা।

যুধিষ্টির বা রাম এঁর আদর্শ পুরুষ নন, ইনি প্রশস্তি গেয়েছেন দুর্যোধন ও রাবণের। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্গাতা, স্বাধীন ব্যক্তিপ্রেমের সমর্থক ও প্রচারক। ভারতী দাসন বিশ্বাস করেন :

প্রেমে পড়া আর প্রেম পাওয়াই
জীবের স্বভাব
প্রেম কখনো বাধা মানেনা।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারতী দাসন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক। ধনসাম্যবাদের প্রচারে অনেক গান লিখেছেন—সে-গান কোথাও অগ্নিবর্ষী, কোথাও-বা অশ্রুসজল। যুদ্ধ-বিরোধী ও বিশ্বশান্তির কবি ভারতী দাসন। এবং প্রকৃতিপ্রেমিক হিশেবেও এক বিশেষ মর্যাদার দাবিদার।

বর্তমান কালের আরেক শক্তিশালী কবি কম্ব দাসন। জীবনবাদী প্রেমিক কবি। 'এসো সাকী ঢালো সুরা' জাতীয় কবিতায় যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি 'ধান-কোটা চাষী মেয়েদের গান,' 'ফসল-কাটা কিসানদের গান', 'জেলেদের গান' ইত্যাদিতেও এঁর ক্ষমতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। ছন্দের ওপর দখলও অসাধারণ। নতুন নতুন ও অভিনব আঙ্গিকের উদ্ভাবনে সুরভি (জে তঙ্গবেলু) বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। কোথমঙ্গলম সুব্বু লেখেন গাঁয়ের কিসানের ভাষায়, সবকিছু দেখেন কিসানের চোখ দিয়ে। এঁর 'গান্দি মহান কদৈ' ('মহাত্মা গান্ধীর কথা') ও 'ভারতী চরিতম' ('ভারতী জীবনী') জনপ্রিয় কাব্য। যোগী শুদ্ধানন্দ ভারতী ও এম পেরিয়াস্বামী থুরন পুরনো রীতিতে কাব্যরচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন। যোগী শুদ্ধানন্দের মহাকাব্য 'ভারত-শক্তি' এক স্মরণীয় কবিকীর্তি। অবিশ্যি কবিত্বের চেয়ে এঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিই সমধিক।

কথাসাহিত্য

আধুনিক তামিল সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বেদনায়কম পিল্লৈ, উপন্যাসের নাম 'প্রতাপ মুদলিয়ার চরিত্রম'। কিন্তু উপন্যাস হিশেবে এ এক অসফল প্রয়াস, তাই একে রোমান্সের পর্যায়ে ফেলাই সঙ্গত। তবে, লেখকের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে তারিফযোগ্য। সত্যিকারের প্রথম সার্থক তামিল উপন্যাস রাজম আয়ারের

'কমলম্বল চরিত্রম'। বইটিতে লেখক গ্রামীণ ব্রাহ্মণ-সমাজের একটি পারিবারিক চিত্র হৃদয়গ্রাহী ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে, অতএব হাজার দুঃখদুর্দৈবেও মানুষের মতিভ্রম ঘটা বাঞ্ছনীয় নয়—লেখকের মোটামুটি বক্তব্য এই। উপন্যাসটি 'বিবেক চিন্তামণি' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সময়েই পাঠকসমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করে—আজো এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। রাজম আয়ার ইংরেজিতেও একটি উপন্যাস লিখেছিলেন—*Vasudeva Sastri or True Greatness.*

রাজম আয়ারের সমকালীন দুই শক্তিমান ঔপন্যাসিক এ মাধবৈয়া ও নটেশ শাস্ত্রী। মাধবৈয়ার 'পদ্মাবতী চরিত্রম' ও 'বিজয়মার্তণ্ডন্' এবং নটেশ শাস্ত্রীর 'জটাবল্লভর' এযুগের স্মরণীয় সৃষ্টি। মাধবৈয়া গ্রামীণ ও নাগরিক দুই জীবনেরই চিত্র অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় দেন।

আর্নি কুপ্পুস্বামী মুদলিয়ার একদা পাঠকমহলে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিলেন, কিন্তু মৌলিক ঔপন্যাসিক ইনি নন। এঁর সব বই-ই ইংরেজি কেচ্ছাপ্রধান রোমান্টিক উপন্যাসের অনুবাদ বা অনুকরণ মাত্র। রেনল্ড্‌স্ সাহেবই ছিলেন এঁর প্রেরণার প্রধান উৎস। কুপ্পুস্বামীর সমধর্মী লেখক জে আর রঙ্গরাজু ও বড়ুবুর দুরৈস্বামী আয়েঙ্গার। রঙ্গরাজুর 'চন্দ্রকান্ত', 'মোহন সুন্দরম' ও 'বিজয়রঙ্গম' এবং আয়েঙ্গারের 'সৌন্দর কোকিলম,' 'কুম্বকনম বকিল' ('কুম্বকনের উকিল') জনপ্রিয় উপন্যাস।

কিসান সমস্যার ওপর উপন্যাস লেখবার প্রথম চেষ্টা করেন এস বেঙ্কটরমনী। এঁর প্রথম বই 'মুরুগন্'। দ্বিতীয় উপন্যাস জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা 'দেশভক্তন কন্দন্'। তামিল সাহিত্যিকের চেয়ে বেঙ্কটরমনীর বড় পরিচয় ইংরেজি কবি ও কথাশিল্পী হিশেবে।

মনস্তত্ত্বমূলক পারিবারিক উপন্যাসে খ্যাতি অর্জন করেছেন শ্রীমতী কোদা নায়েকী। এঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় সত্তরটি, এখনো লিখছেন। তবে, প্রথমদিকে এঁর লেখায় যে দীপ্তি ছিল, ইদানীং সেটা অনুপস্থিত। কাহিনী গতানুগতিক, দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক, আবেগপ্রাবল্যে চরিত্রগুলি অবাস্তব। এইদিক দিয়ে শ্রীমতী অনুত্তমার 'ওরে উরু বার্তৈ' ('একটি মাত্র কথা') এক সার্থক সৃষ্টি। শ্রীমতী অনুত্তমা, 'লক্ষ্মী' ও 'গুহপ্রিয়া'—মহিলা কথাশিল্পীদের মধ্যে এঁরা অগ্রগণ্য। গার্হস্থ্য জীবন এঁদের উপন্যাসের উপজীব্য।

নিচুতলার জীবনকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন 'শঙ্কর রাম'—আসল নাম টি এল নটেশন। ইংরেজি, তামিল ও তেলুগু তিনটি ভাষাতেই লিখে থাকেন। বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনায় ও নতুন নতুন আঙ্গিকের কুশলী প্রয়োগে 'এস ভি ভি' আধুনিক তামিল সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ইনি পুনরুজ্জীবনবাদী। আর কে নারায়ণ ইংরেজি ঔপন্যাসিক খ্যাতিমান হলেও এক সময় ইনি মাতৃভাষাতেও লিখতেন। এবং, ভালোই লিখতেন।

পুদুমাই পিত্তান (এস বৃদ্ধাচলম) ও কে পি রাজগোপালন—খুবই প্রতিশ্রুতিবান লেখক ছিলেন। দুর্ভাগ্য এই, দুজনেই অসময়ে লোকান্তরিত। বর্তমান সামাজিক সমস্যাবলীই ছিল এঁদের গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য, বক্তব্য প্রগতিশীল। পুদুমাই পিত্তানের গল্পগ্রন্থ 'কডবুল্লুম কন্দস্বামী পিল্লৈয়ুম' ('ঈশ্বর ও কন্দস্বামী পিল্লৈ'), 'পোন্নগরম' ('স্বর্ণশহর'), 'অকিলন' ও উপন্যাস 'পেন' (নারী) এবং রাজগোপালনের গল্পগুলি নতুন কথা-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক।

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাশিল্পী 'কল্কি' (আর কৃষ্ণমূর্তি)। রচনার প্রাচুর্যে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে, অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টিতে ও বক্তব্যের মানবিকতায় ইনি বর্তমানে তামিল কথাসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট। কল্কি লেখেন নানা নামে, জনশ্রুতি—এঁর ছদ্মনাম প্রায় তিরিশটি। প্রথম জীবনে কংগ্রেস আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, পরে রাজনীতি ছেড়ে 'নবশক্তি'র সহ-সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 'নবশক্তি'র পরে যোগ দেন 'আনন্দ বিকটন-'এ, তারপর 'কল্কি' নাম দিয়ে নিজেই একটি সাপ্তাহিক বার করেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এঁর লেখায় প্রচুর, কিন্তু সে-প্রভাব এঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কিছু কিছু সামাজিক উপন্যাস লিখলেও কল্কি প্রধানত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। অতীত ইতিহাসকে ভিত্তি করেই কথাসাহিত্যে ইনি এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। 'কল্বনিন কাদলী' ('দস্যু-প্রিয়া'), 'ত্যাগভূমি', অলৈওশৈ' ('তরঙ্গের ডাক') 'পারতিবন্ কনবু' ('পারতিবের স্বপ্ন') 'মকুটপতি', 'সোলাই মালাই ইল্লবরসী' ('বন-পর্বতের রাজকুমারী') প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'শারদৈইন তান্দিরম' ('শারদার চাতুরী') ইত্যাদি এঁর জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থ। প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও দুরদর্শী সাংবাদিক হিশেবেও কল্কি

খ্যাতিমান। তবে, কল্কির অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখেও, একথা বলতেই হবে যে বর্তমান জীবন ও সমাজ-সমস্যাকে ইনি সযত্নে পাশ কাটিয়ে চলেন। জনরঞ্জনই এঁর গল্প-উপন্যাসের চরমপরম লক্ষ্য।

প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিক হিশেবে বর্তমানে আন্নাথুরাইয়ের আসন সর্বাগ্রে। 'দ্রাবিড় মুন্নেট্র করুঘম' ('দ্রাবিড় প্রগতি সঙ্ঘ')-এর সভাপতি ইনি। অনুপম এঁর রচনাশৈলী। এঁরই সমধর্মী লেখক করুনানিধি। দুজনেই গল্প-নাটক-উপন্যাস সবেতেই সিদ্ধহস্ত। এঁরা ছাড়াও কে ডি জগন্নাথন, বি এস রামৈয়া, পুরস্থ বালকৃষ্ণন, এন রামস্বামী, পি এম কন্নন, টি এন কুমার স্বামী, মহাদেবন ও আরভি (আর বেঙ্কট রামন) আধুনিক তামিল সাহিত্যের শক্তিশালী কথাশিল্পী হিশেবে পরিগণিত। পৌরাণিক ও নীতিমূলক গল্পে রাজাজীর নাম উল্লেখযোগ্য। রাজাজীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'ব্যাসর বিরুন্দু'—মহাভারতের অনুবাদ।

নাটকের ক্ষেত্রে তামিল সাহিত্যের ঐতিহ্য গৌরবময়, ছোটবড় অসংখ্য নাট্য-প্রতিষ্ঠানও বর্তমান, নতুন নাটকের সংখ্যাও নগন্য নয়—তবু সাত্যিকারের আধুনিক নাট্যসাহিত্য বলতে এখনো কিছু গড়ে ওঠেনি। আজো তামিল নাটক, সংলাপ নয়, সঙ্গীতপ্রধান। হয় দেবদেবীর মহিমা কীর্তন, নয় নিছক ভাঁড়ামি—এ ছাড়া আধুনিক তামিল নাটকের আর-কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। আধুনিক তামিল সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এইখানে।

তবু এই প্রসঙ্গে শ্রী পি সম্বন্দ মুদলিয়ারের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। তিনিই প্রথম মঞ্চ-সংস্কারে অগ্রণী হন, এবং শেক্সপীয়ারের অনেকগুলি নাটকের অনুবাদ করেন। প্রায় শতাধিক মৌলিক নাটকও তাঁর আছে—তার মধ্যে 'লীলাবতী সুলোচনা,' 'কাদলর কাংগল' ('প্রেমিকের চোখ'), 'বেদল উলগম' 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, কি দৃষ্টিভঙ্গি কি গঠনরীতি কোন দিক দিয়েই এগুলিকে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। অপেশাদার দলগুলি প্রায়ই মাধবৈয়ার 'তিরুমালৈ সেতুপতি', এফ জি নটেশ আয়ারের 'জ্ঞানসুন্দরী', এস কে পার্থসারথীর 'রামানুজাচারিয়ার', 'শঙ্করচারিয়ার', 'নারদর' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে থাকেন, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে নতুন কোন নাট্য-আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক নাটক তামিলে অনূদিত ও জনপ্রিয়। শুধু দ্বিজেন্দ্রলালই বা কেন, বিশিষ্ট তামিল সমালোচকরাই স্বীকার করেন—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রভাবে আধুনিক তামিল কথাসাহিত্য নতুন প্রেরণা লাভ করেছে। আজও টি এন কুমারস্বামী-কৃত রবীন্দ্র-শরৎসাহিত্যের অনুবাদ তামিল লেখকদের পথপ্রদর্শক। শুধু বাংলার নয়, অন্যান্য ভারতীয় ও পৃথিবীর প্রায়-সব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তামিল অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের দিক দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে তামিলের আসন পুরোভাগে।

অন্যান্য

সাহিত্যের অন্যান্য দিকেও তামিল সাহিত্যের সমৃদ্ধি কম নয়। প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষ করে পুথিসাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ডাঃ মহামহোপাধ্যায় স্বামীনাথ আয়ার। সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে টি কে চিদম্বরনাথ মুদলিয়ার, পি আচার্য, এস ভি পিল্লৈ, টি এন সুব্রহ্মণ্যম্ ও আর এস দেশিকন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে পি এন অপ্পুস্বামী ও আর কে বিশ্বনাথন, শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে টি এস অবিনাশলিঙ্গম, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধে কে শান্তনম ও এ এন শিবরামন এবং পণ্ডিত সমালোচক হিশেবে এস বৈয়াপুরী পিল্লৈ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল পূর্বে লোকান্তরিত থিরু ভি ক (থিরু ভি কল্যানসুন্দর মুদলিয়ার) ছিলেন এক অমিত প্রতিভাধর লেখক—প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন ও পরে কংগ্রেস নেতা, কবি, সাংবাদিক এবং প্রাবন্ধিক। এঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার প্রবর্তক ইনি। টি জে রঙ্গনাথন রম্যরচনার লেখক হিশেবে সবিশেষ জনপ্রিয়।

সাহিত্য যে কতখানি জনপ্রিয় হতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যাবে তামিলনাদে। তামিল সাহিত্যের সম্প্রসারণ ও শ্রীবৃদ্ধিতে সংবাদপত্রের দান সবচেয়ে বেশি। দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ফিরিস্তি আর সাময়িক রাজনীতির খবরাখবর বা নেতৃবর্গের ভাষণ পরিবেশনের মধ্য দিয়েই তামিল সংবাদপত্রগুলি নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে না—সাহিত্য প্রচারও তাদের কর্তব্যসূচীর অন্তর্গত।

শুধু সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদিই নয়, ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে সংবাদপত্রে।

সারা তামিলনাদে পত্রপত্রিকার সংখ্যা পাঁচ শতাধিক—তার মধ্যে ছেলেদের পত্রিকাই প্রায় পঁচিশটি। ছোটদের বিখ্যাত পত্রিকা 'চন্দা মামা' (চাঁদ মামা) তামিল, তেলুগু, হিন্দী, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় এক সাথে প্রকাশিত হয়ে থাকে। লেখা এক, ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। ভারতে এ-ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এবং, যতদূর জানি, এখনো অদ্বিতীয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা 'কল্কি' ও 'আনন্দ বিকটন' (সম্পাদক জেমিনি-খ্যাত এস এস ভাসান, কিন্তু পত্রিকাটি কার্যত সম্পাদনা করে থাকেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী মহাদেবন)। দুটিই সাপ্তাহিক, প্রথমটির প্রচার-সংখ্যা পঁচাত্তর হাজারের মত, দ্বিতীয়টির চৌষট্টি। আরেকটি জনপ্রিয় পত্রিকা 'দিনমনি কাদির'—দৈনিক 'দিনমণি'র সাপ্তাহিক সংস্করণ। অভিজাত সাহিত্য পত্রিকা হিশেবে 'কলৈমগল'-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

কানাড়ী

প্রায় হাজার বছরের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসে মহা-দুর্দিন। কানাড়ীভাষী এলাকাগুলি উনিশটি ছোট-বড় খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। বৃহৎ দুটি অংশকে জুড়ে দেওয়া হয় বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লেজুড় হিশেবে। কুর্গ পরিণত হয় কমিশনার-শাসিত প্রদেশে। এর ওপর বৃটিশের বেতনভুক প্রতিভূ হিশেবে কর্ণাটকের মাটিতে অসংখ্য মারাঠী সামন্তপ্রভুর অস্তিত্বও কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই সব কারণে কর্ণাটকের বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয় ভীষণ ভাবে। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বোম্বাই-কর্ণাটক অঞ্চলে কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষারও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিলনা। অধিকাংশ কানাড়ীভাষী অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন অ-কানাড়ীভাষী। ছোটখাট দেশীয় রাজ্যগুলির সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম ছিল মারাঠী। ফলে প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ যায় ছিন্ন হয়ে। মুষ্টিমেয় জনাকয়েক শাস্ত্রী ও পণ্ডিত কর্ণাটকের অতীত শিল্প-সংস্কৃতির অছিতে পরিণত হন। তাঁদের রক্ষণশীলতার দরুণ সাহিত্য ও জনসাধারণের মধ্যে বিভেদটা গড়ে ওঠে পাকাপাকিভাবে।

কানাড়ী সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি। ভারতপুরুষ রামমোহন যে নবজাগৃতির সূচনা করেছিলেন কর্ণাটকেও তার প্রভাব এসে পড়েছিল সত্যি, তবে সে-প্রভাব পরোক্ষ। কানাড়ী সাহিত্যে নবযুগ নির্মাণে মিশনারিদের ভূমিকাই প্রত্যক্ষ। যদিচ 'মথিলিখিত সুসমাচার,' অর্থাৎ নিছক ধর্মপ্রচারই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য, তথাপি প্রয়োজন হয়েছিল যথোপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টির। রীভি, কিটেল, জেগলার, ফ্লিট, রাইস প্রমুখ ধর্মযাজক ও বিদেশি পণ্ডিতদের উদ্যোগে এবং কিছু-সংখ্যক দেশীয় গুণীজ্ঞানীজনের সহযোগিতায় আধুনিক দৃষ্টিতে প্রাচীন সাহিত্য পর্যালোচনা, সাহিত্য-সমালোচনা ও জীবনী-আলোচনার মধ্যে দিয়ে কানাড়ী সাহিত্যে

নবযুগের অভ্যুদয় ঘটে। কিটেলের কানাড়ী-ইংরেজি অভিধান ও রাইসের কানাড়ী সাহিত্যের ইতিহাস এ-কালের এক যুগান্তকারী ঘটনা।

যুগন্ধর কোন একক প্রতিভার সাক্ষাৎ এ-সময় পাওয়া যায় নি, তাই কানাড়ী সাহিত্যে যুগপ্রবর্তক হিশেবে বিশেষ-কোন-এক-একজনের নাম-উল্লেখ সম্ভব নয়। ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গোষ্ঠী ও কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থা, প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা। কর্ণাটক বিদ্যাবর্ধক সঙ্ঘ উত্তর-কর্ণাটকের সর্বপ্রাচীন সাংস্কৃতিক সংগঠন। নতুন ভাবধারাকে মূলমন্ত্র করে এই সঙ্ঘ গড়ে ওঠে, 'বাগভূষণ' নামে একটি সাহিত্যপত্রও এঁরা বার করেন। আধুনিক সাহিত্যের জন্মলগ্নে 'বাগভূষণ-এঁর অবদান অসামান্য।

তারপর ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল কানাড়ী সাহিত্য একাডেমি। প্রবুদ্ধ কর্ণাটক, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ('প্রচারমালা'), সংযুক্ত কর্ণাটক ট্রাস্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আধুনিক দৃষ্টিতে, শুধু সাহিত্য নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থাদির প্রকাশন শুরু হল।

কাব্যসাহিত্য

আধুনিক কাব্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনার আগে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন: প্রাচীন কানাড়ী কবিতা ছিল ধ্বনিপ্রধান, সঙ্গীতপ্রাণ। আধুনিক যুগে বিভিন্ন শক্তিশালী কবির হাতে বার বার তার ভাব ও বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটলেও মূলত সেই ধারার অনুসরণ আজো অব্যাহত।

বি এম শ্রীকান্তিয়া ও ডি আর বেন্দ্রে—আধুনিক কাব্যপ্রসঙ্গে এই দুজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পরলোকগত শ্রীকান্তিয়া ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক। চিরাচরিত রূপরীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রীকান্তিয়া প্রথম কানাড়ী কাব্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। এ-ব্যপারে গত শতকীয় ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের কাছে ইনি বিশেষভাবে ঋণী ; এবং অসংখ্য ইংরেজি কবিতার অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সে-ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করেছেন। অনুবাদ হলেও সে-সব কবিতা কিন্তু নতুন সৃষ্টির শামিল। এমনি একটি মনোজ্ঞ সংকলন 'ইংলিশ গীতগলু' (ইংরেজি গীতাবলী)। অবিশ্যি শ্রীকান্তিয়ার পরিচয় অনুবাদক নয়, স্রষ্টা হিশেবে। ছন্দের ওপর এঁর দখল ছিল অসামান্য, দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ অন্তরঙ্গ।

সমসাময়িক তরুণ কবিদের প্রেরণার উৎস ছিলেন শ্রীকান্তিয়া। জি পি রাজারত্নম, পি টি নরসিংহাচর্য, কে ভি পুট্টাপ্পা প্রমুখ সাম্প্রতিক খ্যাতিমান কবিরা শ্রীকান্তিয়ারই মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীকান্তিয়ার আরেকটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'অশ্বথামান' নাটক। কাহিনী মহাভারতের, গঠনরীতি গ্রীক ট্রাজেডির, ভাষা প্রাচীন কানাড়ী। এই তিনের সংমিশ্রণে অত্যাশ্চর্য সফলতা তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী যুগের লেখকরা নাটক রচনায় নতুন নতুন পথে অগ্রসর হন।

উত্তর-কর্ণাটকের লেখক ডি আর বেন্দ্রেকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক কানাড়ী কবিতার যাদুকর। মূলত গীতিকবি, কিন্তু কাব্যক্ষেত্র যুগপৎ কাব্যসুষমামণ্ডিত ও কথ্যভাষার ব্যবহার এঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। আবেগের সঙ্গে বুদ্ধির রসায়ণে, প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় কবিকল্পনার সুচারু সমন্বয়ে, প্যাশনের প্রাবল্যে ও অভিনব উপমা-রূপকল্পের প্রয়োগে বেন্দ্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এঁর 'গারী' ('পালক'), 'মূর্তি,' 'নাদালীলে' ('ক্রীড়াসঙ্গীত') ও 'সখীগীতা' ('প্রেমিকের' গান) বারবার পড়বার মত কাব্যগ্রন্থ। বেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের এক অকৃত্রিম অনুরাগী। 'গীতাঞ্জলি' পড়ে 'গীতাঞ্জলিয়েন্নোদি' শীর্ষক কবিতায় কবি অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। উপসংহারে লিখেছেন :

গীতাদোরাগিহা বালাউ ইয়াতয়োলাগু ইল্ল।......
গীতয়েজীব, সদগীতয়ে জীবালা, গীতয়ে ব্রহ্মা ওহ্হু।

—গীতার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে আর কোথাও তা নেই। গীতাই জীবন, গীতাই জীবনের উদ্দেশ্য, গীতাই ব্রহ্ম।

'গীতাঞ্জলি' প্রসঙ্গে সরাসরি গীতার প্রশস্তি কেন বোঝা দুষ্কর, তবে বেন্দ্রের কবিমানস সম্পর্কে একটা আভাষ এতে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিজীবনে বেন্দ্রে শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগী, তবে কবি হিশেবে কোন বিশেষ ভাবধারা বা মতাদর্শের মধ্যে নিজেকে ইনি গণ্ডিবদ্ধ করে রাখেননি—প্রেম ও দেশপ্রেম, দার্শনিকতত্ত্ব ও বাস্তব তথ্য এঁর কাব্যে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত। বেন্দ্রের কাব্যে ভগবৎভক্তির পরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির রোমান্টিক স্বাক্ষর। 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ এঁর আরেক কবিকীর্তি।

উত্তর-কর্ণাটকের বেন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণ-কর্ণাটকের পাঞ্জে মঙ্গেশরাওয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-কর্ণাটকে নতুন কাব্য-আন্দোলনের স্রষ্টা ইনি। গীতিকবিতা রচয়িতা, শক্তিধর শিশুসাহিত্যিক। আধুনিক কানাড়ী কবিতার গুরু হিশেবে শ্রীকান্তিয়া, বেন্দ্রে ও মঙ্গেশরাও—এই তিনজনের নাম স্মরণীয় একত্রে।

অন্যান্য আধুনিক কবিদের মধ্যে ডি ভি গুণ্ডাপ্পা, গোবিন্দ পাই, কে ভি পুট্টাপ্পা, পি টি নরসিংহাচর্য, ভি কে গোকক ও মস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গারের নাম উল্লেখযোগ্য। গুণ্ডাপ্পা দার্শনিক কবি—'বসন্ত কুসুমাঞ্জলি' এঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। গোবিন্দ পাই ধ্রুপদী কাব্যরীতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী। অমিত্রাক্ষর ছন্দে (কানাড়ী সাহিত্যে এই ছন্দ ইনিই প্রথম প্রয়োগ করেন) রচিত এঁর 'গলগোথা' ছোটখাট এক মহাকাব্য বিশেষ। পুট্টাপ্পা বর্তমানে মহীশূরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইংরেজি কবিতার প্রভাবে ইনি সবিশেষ প্রভাবান্বিত, কবিতা নিয়ে নিত্যনতুন পরীক্ষারও এঁর অন্ত নেই। পুট্টাপ্পার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রাঙ্গদা'। মহাভারতের সেই পুরাতন কাহিনী শক্তিমান কবির হাতে অপরূপ হয়ে উঠেছে :

> আ! নীনে অর্জুননে? ওহহ; নানা
> প্রেমভিক্ষার্থী। নিন্মেদেয়া বাগিলীগে
> তিরুপে গাগিয়ে বন্দে—

—অর্জুন! তুমি অর্জুন? হ্যাঁ, আমি সেই প্রেমভিখারি—তোমার হৃদয়ের দ্বারে ভিক্ষার জন্যে এসেছি আমি—পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে।

নরসিংহাচর্য প্রকৃতিপ্রেমিক, ঐতিহ্যবাদী—একই সঙ্গে কালিদাস ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ উভয়েরই কাছ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে কাব্যক্ষেত্রে ইনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়েছেন। গোকক সার্থক কাব্যনাটিকার স্রষ্টা ও কানাড়ী সাহিত্যে গদ্যকবিতার প্রবর্তক। এঁর 'সমুদ্র গীতগলু' ('সমুদ্র-সঙ্গীত')-র মধ্যে যে বিশ্বজনীন কবিদৃষ্টির পরিচয় মেলে অন্যত্র তা দুর্লভ। মাস্তি ছোটগল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কাব্যসাহিত্যেও তাঁর দান বড় কম নয়। কানাড়ী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী ইনি। এঁর ভক্তিমূলক কাব্যসংকলন 'বিন্নাহ'য় বাংলার

বৈষ্ণব কবিকুল ও কর্ণাটকের ভক্তকবি হরিদাসের প্রভাব রয়েছে। মাস্তি ভগবৎবিশ্বাসী বটে, কিন্তু তথাকথিত অতীন্দ্রিয়বাদী নন। এঁর চোখে মানুষের দেহই ঈশ্বরের মন্দির, ঈশ্বরকে তিনি দেখেন প্রেমিক ও বন্ধু হিশেবে। মাস্তির কবিতায় তাই মানবিক আবেদন সুপ্রচুর।

প্রতিশ্রুতিবান কবিদের মধ্যে জি পি রাজারত্নম, টি এন শ্রীকান্তিয়া, আর এস মুগালী ও ভি সীতারামৈয়ার নাম করা চলে।

কথাসাহিত্য

প্রথম দিকে ঐতিহাসিক রোমান্সই ছিল উপন্যাসের উপজীব্য। অথবা অনুবাদ। আর, এই অনুবাদের প্রধান উৎস ছিল বাংলা অথবা মারাঠী সাহিত্য। বি বেঙ্কটচর বঙ্কিমচন্দ্রের, প্রাথমিক ইশকুলের শিক্ষক গালাগানাথ মারাঠী লেখক হরিনারায়ণ আপ্তের এবং বাসুদেবাচর্য কেরুর শেকস্‌পীয়র ও গোল্ডস্‌মীথের রচনাবলীর অনুবাদ করে কানাড়ী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। প্রথম অনূদিত উপন্যাস বাণভট্টের 'কাদম্বরী'। এমন কোন শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের সন্ধান আধুনিক কানাড়ী সাহিত্যে মিলবে না যিনি নিজস্ব একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

অনুবাদ থেকেই মৌলিক উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ হন গালাগানাথ ও কেরুর। গালাগানাথের 'মাধব করুণাবিলাস' বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় রচিত। কেরুর লেখেন আধুনিক কানাড়ী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'ইন্দিরা'। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাস্তবজীবনকে প্রথম তুলে ধরেন এম এস পুট্টান্না। শিল্পসৃষ্টি হিশেবে পুট্টান্নার 'মাডিডুন্নো মহারায়া' সার্থক না হলেও পথিকৃতের সম্মান এঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

বর্তমান কালের শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিশেবে শিবরাম করন্থ, এ এন কৃষ্ণরাও, কে ভি পুট্টাপ্পা, ভি কে গোকক, আর এস মুগালী, আর ভি জাগীরদার, মীরজী আন্নারাও ও বাসবরাজ কাট্টিমণির নাম করা চলে।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিবরাম করন্থ। 'চিগুবিদা কানাসু' এঁর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। কিসান জীবনের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। চরিত্রের সংখ্যা মাত্র পাঁচ-ছটি, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বিশদ

ও বাস্তব বর্ণনায় বইটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। সুখপাঠ্য—তার বেশি নয়। এই দিক দিয়ে বরং 'মারালি মান্নিগে' সার্থকতর সৃষ্টি।

কৃষ্ণরাওয়ের প্রথম দিকের প্রায়-সব উপন্যাসেরই নায়ক শিল্পী। ছাঁচে-ঢালা কাহিনী। নায়করা সবাই অসাধারণ ব্যক্তি। করন্থের তুলনায় বাস্তবতাও এঁর রচনায় কম। যেমন—এঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'সন্ধ্যারাগ'-এর নায়ক লক্ষণ সঙ্গীতশিল্পী। পৃথিবীর দিকে দৃকপাত না করে নিজের সাধনায় সে তন্ময়। এক গানের আসরে তানপুরায় সন্ধ্যারাগ বাজাতে বাজাতে নাটকীয়ভাবে দেহান্ত ঘটল নায়কের। দেহান্ত ঘটল বটে, কিন্তু তার সুরের ঝঙ্কারে শ্রোতারা তখনো মন্ত্রমুগ্ধ।

দুঃখের বিষয়, যে-সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ঔপন্যাসিকের পক্ষে অপরিহার্য এঁদের মধ্যে—কানাড়ী সাহিত্যের সকল ঔপন্যাসিকের মধ্যেই—তার অনুপস্থিতি ভয়ানকভাবে চোখে পড়ে। কেউ চরিত্র চিত্রণে, কেউ মনস্তত্ব বিশ্লেষণে, কেউ-বা আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টিতে পারঙ্গম—ঔপন্যাসিকের প্রকৃত গুণাবলীর পুরোপুরি অধিকারী কেউ-ই নন। অধিকন্তু, খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে এঁরা জীবনকে দেখেছেন, এবং তার খণ্ডিত রূপটিকেই তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ দশকে প্রগতি আন্দোলনের জোয়ার আসে, তারপর বিয়াল্লিশের বিপ্লব। 'প্রগতি' সাহিত্য ও 'বিপ্লবী' সাহিত্য গড়ে ওঠে। কিন্তু সে-সাহিত্য হয় থিয়োরী-সর্বস্ব, নয় পাশ্চাত্য উপন্যাসের দেশি সংস্করণ! নিছক যৌনবিকারের বর্ণনাও (কৃষ্ণরাওয়ের 'সাঞ্জেগাত্তালু') 'প্রগতি' সাহিত্যের শিরোপা পায়, ঘটনাবলীর স্থূল বিবরণী 'বিপ্লবী' সাহিত্যের। বাস্তবতার নামে পর্ণোগ্রাফীর সবসেরা উদাহরণ 'বিদিয়াল্লি বিত্তাবলু'। অবস্থার চাপে পড়ে একটি মেয়ে পরিণত হল রূপপসারিণীতে—এই সামাজিক ট্রাজেডি নিয়ে অনায়াসেই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু ভাষায় ও বর্ণনায় বইটি শুধু অশ্লীলই নয়, রীতিমত কদর্য। সমালোচকদের মতে—এর 'ল্যাঙ্গুয়েজ' 'স্ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর শামিল। অথচ মুখ ফুটে সে-কথা বলা মুশকিল—লেখক যে লরেন্স-জয়েসের আত্মঘোষিত অনুগামী!

তবু, এরি মধ্যে, কৃষ্ণরাওয়ের 'সন্ধ্যারাগ' ('গোধূলি') 'উদয়রাগ'('প্রত্যূষ) ও 'মঙ্গলসূত্র,' পুট্টাপ্পার 'কানুর সুব্বাম্মা 'হেগ্‌গাডাতি,' গোককের 'ইজ্জড়ু' ('বৈষম্য'), 'সমরসাবে জীবন' ('জীবনসত্য') মৃণালীর 'বালুরী' ('জীবনাগ্নি'),

করন্থের 'মারালি মান্নিগে', জাগীরদারের 'বিশ্বামিত্র সৃষ্টি' ও আন্না রাওয়ের 'রাষ্ট্রপুরুষ' আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যকে কতকাংশে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে 'রাষ্ট্রপুরুষ'। দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে ভিত্তি করে বইটি রচিত। পটভূমির বিশালতায় ও চরিত্র-চিত্রণে এবং আপাতঅনুল্লেখ্য ছোটখাট ঘটনার শিল্পসম্মত রূপায়ণে বইটি আধুনিক কানাড়ী সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিশেবে চিহ্নিত হতে পারে।

উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের অগ্রগতি কিন্তু সত্যিই বিস্ময়কর। মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার কবি ও ঔপন্যাসিক হিশেবে খ্যাতিমান হলেও আসলে ইনি ছোটগল্পলেখক। এবং এই বিভাগের একচ্ছত্র সম্রাট। মাস্তি সাধারণত মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লিখে থাকেন। শাদামাঠা আঙ্গিক, অনাড়ম্বর রচনাশৈলী। মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের এক-একটি খণ্ড-অথচ-সম্পূর্ণ চিত্র গল্পের মধ্যে উদ্ভাসিত। সমাজের সর্বশ্রেণীর নরনারী সম্পর্কে নিবিড় পরিচয় আর গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর মাস্তির প্রতিটি গল্পে। কোন-রকম উচ্চ-উচ্চারিত মতবাদ নেই, মানবপ্রেমের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত মাস্তি—দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষা ব্যথাবেদনার সহজ-স্বাভাবিক মানবীয় রসের রসিক। চমক সৃষ্টি বা ঘটনার ঘনঘটার আশ্রয় ইনি কখনো নেন না। কাহিনী অতিসাধারণ, অতিপরিচিত: উপন্যাস পড়ে পড়ে পাত্র নিজেকেই উপন্যাসের নায়ক বলে ভাবছে, আর তার বরাতেই কিনা জুটল প্রথমভাগপড়া এক বালিকা বধূ! মারাত্মক অবস্থা! কিম্বা, পুত্রের ওপর অধিকার নিয়ে বধূ-শাশুড়ীর চিরন্তন ঈর্ষাদ্বন্দ্ব; অথবা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করে বিধ্বস্ত সংসার পুনর্নির্মাণে বিপত্নীকের ব্যর্থ-করুণ প্রয়াস—এসব গল্পে প্লটের জটিলতা নেই, নাটকীয়তা নেই, সংলাপেও চাতুর্য নেই। এমন-কি, ক্লাইম্যাক্স পর্যন্ত না। অথচ রচনার গুণে প্রতিটি গল্প অনবদ্য। মনে হয়, সুরসিক এক বয়োবৃদ্ধ যেন তাঁর জীবনের হাসিকান্নার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে চলেছেন, অনায়াসে—একান্ত আন্তরিকতার সাথে। পাঠকরা শ্রোতার মত তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছে—মন্ত্রমুগ্ধ।

সত্যিকারের জীবনরসিক শিল্পী মাস্তি। এঁর বহু গল্প ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে, মাস্তি নিজেও চার খণ্ডে তাঁর গল্পগুচ্ছের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাই মাস্তির নাম আজ আর স্বদেশের সংকীর্ণ গণ্ডিতে

আবদ্ধ নয়। গল্পর মত না হলেও 'চান্না বাসবা নায়েক', 'বিমর্ষ' ইত্যাদি উপন্যাসেও মাস্তির প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। ব্যাস, বাল্মিকী, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটেকে নিয়ে ইনি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রাজনীতির সঙ্গেও যোগাযোগ এঁর ঘনিষ্ঠ—কানাড়ীভাষী রাজ্যগঠন-আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাস্তি।

গ্রামজীবন নিয়ে সার্থক গল্প লিখেছেন কে বেতিগেরী ও গরুর। বর্তমান সভ্যতার সংঘাতে বিধ্বস্ত গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার বাস্তবধর্মী চিত্র গরুর তাঁর বিভিন্ন গল্পে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মনস্তত্বমূলক গল্পে কৃষ্ণকুমার এবং প্রতীকধর্মী ও ব্যঞ্জনাপ্রধান গল্পে এইচ পি যোশীর নাম উল্লেখযোগ্য। বিয়াল্লিশের বিপ্লব ও কর্ণাটকের দুর্ভিক্ষ একদল তরুণ লেখকের মনে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে, এ-যুগের সমাজ-সত্যকে তাঁরা গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন। বাসবরাজ কাট্টিমণি, কুলকুণ্ড, এল আর বেন্দ্রে প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে করা চলে। প্রেমের গল্পে 'আনন্দ' একটি স্বতন্ত্র আসনের অধিকারী।

আধুনিক নাটকের বয়েস মাত্র বছর পঁচিশেক। প্রথমদিকে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীই ছিল নাটকের উপজীব্য। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার টি পি কৈলাসম। কৈলাসমের আগে সদাশিব রাও প্রমুখ কয়েকজন অবিশ্যি সামাজিক নাটক ('বিষম বিবাহ') রচনায় হাত দেন, কিন্তু পুরোপুরি সার্থক তাঁরা হতে পারেন নি।

কৈলাসম দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে ছিলেন। শুধু বইপত্রের মারফৎ নয়, আধুনিক নাটকের গঠনরীতি সম্পর্কে সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সহজাত নাট্যপ্রতিভা, অভিনয়-দক্ষতা। দেশে ফিরে কৈলাসম এক নতুন নাট্য-আন্দোলন গড়ে তুললেন। নাটকের মাধ্যমে সূচনা করলেন ভাববিপ্লবের, পরিচিত হলেন কর্ণাটকের ইবসেন হিশেবে। জনপ্রিয় প্রাচীন নাটকগুলির অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে প্যারডি রচনা এবং শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনীতির নামে যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় তাকে তীব্র কষাঘাত করলেন কৈলাসম। এঁর নাটকের ভাষাও অভিনব—কানাড়ী ও ইংরেজির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এবং সর্বরসের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ প্রতিটি নাটক। 'টল্লু গাড্ডি', 'পলি কিট্টি', 'হোম রুল' ইত্যাদি এঁর বিখ্যাত নাটক। কৈলাসমের অকাল বিয়োগে কানাড়ী নাট্যসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

আর ভি জাগীরদার ('শ্রীরঙ্গ') কবি, গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয় লেখক, জীবনীকার, ভাষাতাত্ত্বিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক হিশেবে পরিচিত হলেও এযুগের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার ইনি। ষাটটিরও অধিক নাটক এঁর রয়েছে। 'বৈষ্ণরাজা' ও 'দরিদ্রনারায়ণ'-এর মধ্যে দিয়ে ইনি বর্তমান সমাজের নগ্নচিত্র তুলে ধরেছেন। 'শ্রীরঙ্গ'-র নাটকের কাহিনী পৌরাণিক হলেও আসলে সেটা বর্তমান সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। শ্রীকান্তিয়া, গুণ্ডাপ্পা, করন্থ, মাস্তি, কৃষ্ণ রাও, গোকক, পুট্টাপ্পা প্রমুখ কবি-কথাশিল্পীদের দানও নাট্যসাহিত্যে কিছু-কিছু রয়েছে।

অন্যান্য

কাব্য ও কথাসাহিত্যের তুলনায় অন্যান্য শাখার বিকাশ মোটেই আশানুরূপ নয়। ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা থেকে অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। বাঙালি লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সমাদর অসাধারণ। 'চরিত্রহীন' কর্ণাটকের পাঠকসমাজে একদা যে-আলোড়ন এনেছিল সমসাময়িক বিখ্যাত কানাড়ী লেখকদের মনে তা রীতিমত ঈর্ষার সঞ্চার করে।

জীবনীসাহিত্যে গুণ্ডাপ্পার 'গোখেল', জাগীরদারের 'কামালপাশা', পুট্টাপ্পার 'বিবেকানন্দ', বেঙ্কট রামৈয়ার 'মুহম্মদ' ও কৃষ্ণ রাওয়ের 'ম্যাক্সিম গর্কি'র নাম উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস-নেতা আর আর দিবাকর কারাজীবন নিয়ে স্মৃতিকথাজাতীয় একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থ রচনা করেছেন। উপনিষদ ও প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে তাঁর আলোচনা আধুনিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। রম্যরচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। এবং ভি সীতারামৈয়া, এম জি বেঙ্কটেশিয়া ও ডি আর বেন্দ্রে এ-পথের পথিকৃত হলেও, এ এন মূর্তি রাওয়ের 'দিবাস্বপ্ন' এ-বিভাগে শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন আর নরসিংহাচার্য, গোবিন্দ পাই, এফ জি হালাকাট্টি, শ্রীনিবাস মূর্তি, রাজারত্নম ও আর এস মুগালী। শুধু আধুনিকতার কষ্টিপাথরে অতীতের মূল্য-নির্ধারণ নয়, জনমানসকে ঐতিহ্য-প্রেমিক করে তোলাও এঁদের অন্যতম—হয়ত প্রধানতম—লক্ষ্য। শ্রীকান্তিয়া, মাস্তি, গুণ্ডাপ্পা, গোকক, অধ্যাপক ইনামদার ও বেন্দ্রে

বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের সমসাময়িক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে কর্ণাটকের পাঠকসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই মহীশূরের রাজদরবার কানাড়ী সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আধুনিক সাহিত্য-আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও, রাজকীয় অনুগ্রহ লাভে কানাড়ী সাহিত্য আজো বঞ্চিত হয় নি। মহীশূর-রাজের উদ্যোগে ও অর্থানুকুল্যে পুরাণসমূহের নতুন ও সুদৃশ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে—এমন ব্যয়বহুল দুঃসাধ্য দায়িত্ব কোন প্রকাশকই নিতে রাজি হননি। আর, শুধু কি মহীশূর-রাজ? কয়েকটি মঠ পর্যন্ত সাহিত্য-প্রকাশনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অবিশ্যি এঁদের সাহিত্য হল, প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্য বা সাধুসন্তদের অলৌকিক জীবনী।

তেলুগু

তেলুগু সাহিত্যকে মোট চারটি যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে : (১) অতি-প্রাচীন যুগ, (২) কাব্যযুগ, (৩) প্রাক-আধুনিক যুগ, (৪) আধুনিক যুগ। খৃস্ট জন্মের প্রায় আট শ বছর আগেই তেলুগু লিপি আবিষ্কৃত হলেও ১০২০ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থই আজ পাওয়া যায় না। তেলুগু সাহিত্যের আদি কবি নন্নয়্য ভট্ট। এঁর মহাভারতের রচনাকাল ১০২০ খৃস্টাব্দ। মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ ইনি করেন নি, করেছেন ভাবানুবাদ। নন্নয়্য ভট্টের রচনায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এঁর অন্যান্য গ্রন্থ—'আন্ধ্রশব্দ চিন্তামণি', 'ইন্দ্রসেন বিজয়মু' ও 'চামুণ্ডিকা বিলাসমু'। অবিশ্যি, এই তিনটিরই গ্রন্থকার ঠিক ইনিই কিনা সে-সম্পর্কে মতদ্বৈধ বর্তমান।

বেমুলবাড ভীম কবি, নন্নেচোড কবি, অথর্বণাচার্য, পালকুরিকি সোমনাথ কবি, ভদ্র ভূপতি, ও তিক্কন সোময়াজী অতি প্রাচীন যুগের, মহাকবি শ্রীনাথ, বিন্নকোঁড বল্লভরায়লু, ভৈরব কবি, অনন্তামাত্য কবি ও শ্রীকৃষ্ণদেব রায়লু কাব্যযুগের এবং কামেশ্বর কবি, সমুখং বেঙ্কট কৃষ্ণপ্প নায়কুডু ও গণপ বরপু বেঙ্কট প্রাক-আধুনিক যুগের বিখ্যাত কবি। অতিপ্রাচীন ও কাব্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্মীয় সাহিত্য। প্রাক-আধুনিকও তার ব্যতিক্রম নয়, তবে এ-যুগের কবিরা সমধিক ঝোঁক দেন শৃঙ্গার রসের দিকে।

দক্ষিণ-ভারতের গোঁড়ামি, ভুবন না হোক, ভারত-বিদিত। এই গোঁড়ামির মূলে প্রথম আঘাত হানেন রামমোহন, মূলোচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসেন কন্দুকুরি বীরেশলিঙ্গম পন্তুলু (১৮৪৬-১৯১৯)। রামমোহনের মন্ত্রশিষ্য ও বিদ্যাসাগরের সংস্কারবাদী অন্দোলনের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বীরেশলিঙ্গমই আন্ধ্রদেশ, তথা সারা দক্ষিণ-ভারতে নবজাগরণের অগ্রদূত। জন্ম হয়েছিল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে, ব্রাহ্ম হয়েছিলেন পরে। না ইংরেজি না সংস্কৃত, কোন ভাষাতেই 'সুপণ্ডিত' ছিলেন না—পাণ্ডিত্যের বদলে ছিল প্রবল পুরুষকার। আসলে সংস্কারক, সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিশেবে। কিন্তু, আশ্চর্য এই, পরবর্তী যুগে ইনিই হয়ে উঠলেন

সাহিত্যে নবযুগের স্রষ্টা। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, জীবনী, আত্মজীবনী, সংস্কৃত থেকে অনুবাদ, ইংরেজি থেকে ভাবানুবাদ, হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের ভাষ্য, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ—সব্যসাচী লেখক হিশেবে আত্মপ্রকাশ করলেন বীরেশলিঙ্গম। এঁর গ্রন্থের সংখ্যা একশ তিরিশটি, বারো খণ্ডে সেগুলি কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কারমূলক অভিযান চালাবার জন্যে 'বিবেকবর্ধিনী' নামে একটি পত্রিকাও ইনি বার করেছিলেন। আন্ধ্রের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পত্রিকাটির একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

'আন্ধ্রের অন্ধ কবি' চিলকমর্তি লক্ষ্মীনরসিংহম বীরেশলিঙ্গমের প্রায় সমসাময়িক, 'আন্ধ্রের মিলটন' নামে পরিচিত। দুজনের মধ্যে বয়েসের কিছুটা ব্যবধান থাকলেও হেরফের ছিল না আদর্শের। বরং, বীরেশলিঙ্গমের যেখানে ছিল পিছটান, চিলকমর্তি সেখানে ছিলেন অগ্রণী। রাজনীতিকে বীরেশলিঙ্গম সচরাচর এড়িয়ে চলতেন, আন্ধ্রে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে চিলকমর্তির দান অসামান্য। বীরেশলিঙ্গমের মত সর্বতোমুখী প্রতিভা অবিশ্যি এঁর ছিল না। এবং কবি হিশেবে পরিচিত হলেও ইনি লিখেছেন শুধু উপন্যাস আর নাটক। আধুনিক তেলুগু উপন্যাস-নাটকের জনক চিলকমর্তি। অন্ধ ছিলেন, কিন্তু এই অন্ধত্ব জীবনে তাঁর বড় রকমের অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় নি। স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। মুখে মুখে অনর্গল বলে যেতেন, অন্যে লিখে নিত। সুবক্তা হিশেবেও চিলকমর্তি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাটক 'গজোপাখ্যান,' ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অহল্যাবাঈ', সামাজিক উপন্যাস 'রামচন্দ্রবিজয়মু' ও ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস 'গণপতি'র জন্যে তেলুগু সাহিত্যে ইনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'আপ বীতি' এঁর আত্মজীবনী, অন্ধ জীবনের বেদনাবিধুর কাহিনী।

১৯১২ সাল। শুধু আন্ধ্র নয়, তেলুগু সাহিত্যের ইতিহাসেও এ এক স্মরণীয় বৎসর। সংস্কারবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে মোড় নিল বৈপ্লবিক অগ্রগতির পথে। গ্রন্থাগার-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যার শুরু, পৃথক আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র আন্ধ্র প্রদেশ গঠনের দাবির মারফৎ দেখা গেল তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। তেলুগু সাহিত্যের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্যে নেতৃবর্গ একটি কেন্দ্রীয় একাডেমী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। শুরু হল রঙ্গমঞ্চের পুনরুজ্জীবন। আধুনিক তেলুগু ভাষাকে

সরকারি স্বীকৃতি দানের দাবি নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করলেন গিডুগু বেঙ্কট রামমূর্তি পন্তুলু। পন্তুলু ছিলেন শিক্ষাব্রতী—ইতিহাসের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ববিদ। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান না হলেও মাতৃভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ এঁর দান। ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খল ভেঙে জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায়—কথ্য ভাষায়—সাহিত্য রচনার জন্যে ইনি এক আন্দোলন শুরু করেন। সেজন্যে এঁকে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সম্প্রদায় ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়, এমন-কি, বীরেশলিঙ্গম পর্যন্ত সে আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকেন—তবু ইনি পিছু হটেন নি। আধুনিক তেলুগু গদ্যের স্রষ্টা ইনি, নব্য সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা।

কাব্যসাহিত্য

অন্ধ্রের নব জাগরণে বাংলার ভূমিকাই প্রধান। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অন্ধ্রের আত্মোপলব্ধিতে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করেই আধুনিক তেলুগু সাহিত্যের অগ্রগমন আরম্ভ। আধুনিক যুগের প্রথম কবি—যুগ্মকবি—তিরুপতি-বেঙ্কট কবুলু। বীরেশলিঙ্গম ও গিডুগু রামমূর্তি অলঙ্কারবহুল রচনাশৈলীর শৃঙ্খল ভেঙে গদ্যের মুক্তি সাধন করেছিলেন, এঁরা করলেন কাব্যের। এঁরা দুজনে একসঙ্গে লিখতেন—অর্থাৎ কোন কবিতার ইনি লিখতেন এক চরণ, দ্বিতীয় চরণ উনি। এইভাবে এঁরা পূর্ণাঙ্গ করে তুলতেন কবিতাটিকে। সে-কবিতার সাহিত্য মূল্য সম্পর্কে উন্নাসিক সমালোচকদের মত যাই হোক, সে-যুগে তেলুগু ভাষার প্রতি জনসাধারণকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এঁরা যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। সমসাময়িককালে এঁদের কবিতা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সারা দেশে অগুণতি অনুকারকের জন্ম দেয়।

অন্ধ্রে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রচারক রায়প্রোলু সুব্বারাও। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, রবীন্দ্রপরিবেশে মন এঁর গড়ে ওঠে। দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ করে ইনি নতুন এক সাহিত্য-আন্দোলন শুরু করেন। রায়প্রোলু নিজেও ছিলেন শক্তিমান কবি। এঁর 'তৃণকঙ্কনম', 'রম্যালোকমু' ও 'মাধুরী দর্শনমু'

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ওমর খৈয়ামের অনুবাদক হিশেবেও ইনি খ্যাতিমান। রবীন্দ্র-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আর যাঁরা কাব্যরচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে বেঙ্কট পার্বতীশ্বর কবুলুর আসন সকলের আগে। এঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'একান্তসেবা', রবীন্দ্রনাথের রহস্যবাদী ভাবধারার প্রভাব বইটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। আধুনিক যুগে প্রথম সার্থক গীতিকবিতা রচনার সম্মান প্রাপ্য অব্বুরী রামকৃষ্ণ রাওয়ের।

১৯২১ সালে শক্তিশালী তরুণ সাহিত্যিকরা 'সাহিতি সমিতি' নামে একটি নতুন গোষ্ঠীর মধ্যে এসে সমবেত হন। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সমিতি কোনদিন গঠিত হয়নি, সমিতির সদস্যরাও ছিলেন বিভিন্ন মন ও মেজাজের—সাহিত্যিক সকলেই, ঐক্য কেবল এইখানে। শুধু নতুন সাহিত্য সৃষ্টি নয়, নতুন সাহিত্যিক-আবিষ্কারও ছিল সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। 'সাহিতি সমিতি'র সভাপতি হন তল্লাবঝল শিবশঙ্কর শাস্ত্রী। শিবশঙ্কর শাস্ত্রী তেলুগু ছাড়া সংস্কৃত, পালি, হিন্দী ও বাংলায় সুপণ্ডিত। কবিতায় ধ্রুপদী, নাটকে মিশ্র এবং গল্প-উপন্যাসে আধুনিক রচনাশৈলী ও কথ্য ভাষা ব্যবহার এঁর এক অ-সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অনুবাদেও যে পারঙ্গম, শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া'র সুন্দর অনুবাদ করে সে-প্রমাণ ইনি দিয়েছেন। সমিতির সদস্য হিশেবে বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ, দেবুলপল্লি কৃষ্ণশাস্ত্রী,, কোডাভাটি গেন্টি বেঙ্কটসুব্বাইয়া, বেড়ুলা সত্যনারায়ণ, নোরি নরসিংহ শাস্ত্রী, নায়ানী সুব্বারাও, চিন্তা দীক্ষিতুলু, মোক্কাপাতি নরসিংহ শাস্ত্রী, মুনিমানিক্যম নরসিংহ রাও, নাণ্ডুরী বেঙ্কট সুব্বারাও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক তেলুগু সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সমৃদ্ধ এঁদের দানে। এই সমিতির সদস্য বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ পরবর্তী যুগে 'কবিসম্রাট' হিশেবে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন।

'সাহিতি সমিতির' মুখপত্র ছিল 'সাহিতি'। এ ছাড়াও নতুন সাহিত্য-আন্দোলনের বাহন হিশেবে আরো অনেকগুলি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে—'শক্তি', 'জয়ন্তী', 'সারদা', 'সুজাতা', 'প্রতিভা', 'উদয়িনী', 'ভারতী' ইত্যাদি।

এ-যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সাহিত্যিক কবিসম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ। —সব্যসাচী লেখক। এঁর 'আন্ধ্রপ্রশস্তি', 'শৃঙ্গার বীথী' ও 'শশিদূতমু' কাব্যগ্রন্থ এবং 'বেয়িপডগলু' ও 'চেলিয়লিকট্টু' উপন্যাস দুটি সমধিক বিখ্যাত। 'কিন্নের সানী পাটলু' (মৎস্যকন্যার গান) এঁর এক অনুপম সৃষ্টি। আরেক কবিকীর্তি

'শ্রীমদ্রামায়ণ' মহাকাব্য। দেবুলপল্লি কৃষ্ণশাস্ত্রী 'আন্ধ্রের শেলী' নামে পরিচিত। নিতান্ত ব্যক্তিগত আবেগানুভূতির সঙ্গে কবিকল্পনার সুচারু সমন্বয় সাধনে পারঙ্গম ইনি। আত্মজিজ্ঞাসার অন্তর্দ্বন্দ্বে কবিমন ক্ষতবিক্ষত, হৃদয়বেদনার রসে অভিষিক্ত এঁর কবিতা। 'কৃষ্ণপক্ষমু', 'কন্নীরু', 'উর্বশীপ্রবাসমু' কৃষ্ণ-শাস্ত্রীর স্মরণীয় সৃষ্টি। সমালোচকদের মতে এঁর 'উর্বশী' বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলনে স্থান পাবার যোগ্য। উপমা, চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্বে কৃষ্ণশাস্ত্রীর 'পাল্লকী' ('পালকী') আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'শিবতাণ্ডবম'-র কবি নারায়ণাচার্যালু কাব্যের গঠনরীতির দিক দিয়ে ধ্রুপদধর্মী, দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। নতুন নতুন ছন্দের প্রয়োগ-চাতুর্যে কোডাভাটি-গেন্টির স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। 'আতিথ্যেমু' এঁর একটি আশ্চর্য কাব্যসৃষ্টি। বেঙ্কট সুব্বারাও প্রচলিত পদ-লালিত্যের মোহ পরিহার করে জনগণের ভাষায় প্রথম কাব্যরচনা শুরু করেন। এঁর 'ইয়েঙ্কী পাটলু' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক মহলে প্রবল আলোড়নের সঞ্চার হয়। অতি-আধুনিক গণ-সাহিত্যের অগ্রদূত ইনি।

এঁরা সবাই আধুনিক কবি হিশেবে পরিচিত হলেও কম-বেশি ঐতিহ্যবাদী সকলেই। পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত কেউই নন। এর কিছুটা ব্যতিক্রম শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও (শ্রী শ্রী)। শুধু দেশীয় নয়, বিদেশি প্রাচীন ও বর্তমান শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে এঁর যোগাযোগ অন্তরঙ্গ। কাব্যশরীরের অলঙ্করণে ও দৃষ্টিভঙ্গির গণতান্ত্রিকতায় 'শ্রীশ্রী' আধুনিক কাব্যসাহিত্যে এক নতুন পথের সূচনা করেন, চারণের মত আগামী পৃথিবীর আগমনী গানে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এঁর 'জগন্নাথুনি রাধা চক্রালু' ('জগন্নাথের চাকা') আধুনিক তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা। নিপীড়িত জনমনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কবি এখানে বাণীমূর্তি দিয়েছেন, জানিয়েছেন উজ্জীবনের উদাত্ত আহ্বান। 'শ্রীশ্রী'র আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'রাশিয়াকে সালাম':

গর্জে ওঠো, হে রাশিয়া, গর্জে ওঠো
বাজাও তোমার পর্জন্য শঙ্খ
ধ্বংস করো শত্রুবাহিনীকে
জাগো, এগিয়ে চলো
হে রাশিয়া!

মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার হে রক্ষাকর্তা !
বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতীত মানুষের আশ্রয় হে রাশিয়া !......
এগিয়ে চলো.........
দীর্ঘদিনের ঘুমন্ত কংকালে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে
ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে পৃথিবী, হিস্ হিস্ করে গর্জাচ্ছে
কিসান আর শ্রমিকেরা, অধঃপাতিত আর শোষিতেরা
বিদ্রোহের প্রলয় বন্যা সৃষ্টি করেছে।
কোটি কোটি কণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছে তোমায়,
তোমায় বরণ করে নিতে পৃথিবী আজ প্রস্তুত।
জয়ের আঘাত হানতে প্রস্তুত হও
হে রাশিয়া
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো.........

গত যুদ্ধের সময় কবিতাটি রচিত। 'শ্রীশ্রী' শক্তিশালী কবি সন্দেহ নেই, তবে পুরোপুরি স্থিতধী এঁকে ঠিক বলা যায় না। কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মোহে মাঝে মাঝে ইনি মাত্রা ছাড়িয়ে যান :

ছন্দো বন্দো বস্তু লন্নী
ছট্ ফট্ ফট্ মনি ত্রেঁচি
Damnit এমিট্া ইদংটে
Pray it is poetry অন্দাং।

—ছন্দের বাঁধন ভাঙার জন্যে আমার প্রতি কেউ যদি অভিযোগ করে তো বলব—ড্যাম ইট, এ-ই কবিতা।

'শ্রীশ্রী'র বিশিষ্ট কাব্যসংগ্রহ 'মহাপ্রস্থান'। 'মহাপ্রস্থান'-এ সংকলিত 'মানবুড়া' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। মানবেতিহাসের শুরু থেকে বর্তমানকাল কবিতাটির উপজীব্য—মানুষের ক্রমাগ্রগতির ধারাবিবরণীর সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ভবিষ্যৎ কর্তব্যের।

শিষ্ট্লা, শ্রীরঙ্গ নারায়ণ বাবু, পট্টাভি ও ডি আর রেড্ডী আধুনিক কালের অন্যান্য শক্তিশালী কবি। শিষ্ট্লা জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহী কবি—'বিষ্ণুধনু' ও 'নবমিচিলুক' এঁর নাম উল্লেখযোগ্য কবিকীর্তি। শ্রীরঙ্গ নারায়ণ বাবুর 'রুধিরজ্যোতি' স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ। পট্টাভি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি। উপমার

বৈচিত্র্য ও চমক সৃষ্টির দিকে এঁর একটা বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। এবং সেই হিশেবে ইনি অসাধারণ ঃ

ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌স্ লাগুন্ন
নী কন্নুলন্নু সাল্‌বু চেসে মহাভাগ্যঃ
এ মানবুনিদো কদা।......

—ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌সের মত রহস্যময় তোমার ওই চোখ দুটি—কে সেই ভাগ্যবান যে ওই রহস্যের কিনারা করতে সক্ষম?

রেড্ডীর মেজাজ শান্ত। অতিসাধারণ বিষয় নিয়ে সার্থক কাব্যরচনার দুরূহ ক্ষমতা আয়ত্তে এঁর। প্রসঙ্গক্রমে রেড্ডীর 'কৃষকপত্নীর প্রতি' কবিতাটির উল্লেখ করা যায় ঃ

দুজনে একসাথে চাষ করলে সংসার চলে সুখে
—গাড়ি কি কোনদিন তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারে
যদি ঘোড়ারা টেনে নিয়ে যায় দুই বিরুদ্ধ দিকে?
নারী! সমভাবে খাটতে পারছ না বলে দুঃখিত হচ্ছ?
কেন, এখন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তো খাটতে পারবে তুমি!
সূর্য অস্ত গেল, এবার তোমায় বাড়ি ফিরতে হবে
তোমার ছেলে হয়ত এতক্ষণ উঠেছে ঘুম থেকে
হয়ত-বা দুধ খাবার জন্যে কাঁদছে। তার আর দোষ কি!
পুকুর-পাড় দিয়ে যাবার সময় কিছু পদ্ম তুলে
বাড়ি নিয়ে যেও, তোমার শিশুর মুখে হাসি ফুটবে ঃ
ফুল নিয়ে সে খেলা করবে মনের খুশিতে!
সেই অবসরে রান্নার কাজ তুমি দিব্যি সেরে
নিতে পারবে, স্বামী ফেরবার আগেই।......
ধনীরা তাদের ধনসম্পদ দেখাবার জন্যে
কত রকমের শাড়ি গহনা, আর দাসী চাকর
ব্যবহার করে—তুমি ওদের দিকে অমন করে
তাকিও না লক্ষ্মিটি। ওদের অবজ্ঞা করো।......
অলংকারে দেহ ঢেকে ফেলেও স্বামীর ভালোবাসা
মেলে না—তাই প্রেম-প্রত্যাশী সব স্ত্রীকেই

মিষ্ট মনোহর হাসি দিয়ে স্বামীর হৃদয় জয় করতে হয়—
সুন্দর প্রেমময় হাসি ফুলের মাঝে শিশিরের মত।
.........অলংকার আর প্রেম
কোনদিন কিছুতেই সমান হবেনা জেনো।

(অনু: মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়)

কথাসাহিত্য

আধুনিক তেলুগু কথাসাহিত্যের শুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। বীরেশলিঙ্গমের 'রাজশেখর চরিত্রম' প্রথম তেলুগু উপন্যাস, যদিচ একটি বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাব এতে স্পষ্ট। প্রথম মৌলিক উপন্যাস ও নাটক লেখেন 'আন্ধ্রের অন্ধ কবি' চিলকমর্তি। এর 'রামচন্দ্র বিজয়মু' একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক তেলুগু উপন্যাসের স্রষ্টা উন্নব লক্ষ্মীনারায়ণ। লেখক সক্রিয়ভাবে গান্ধী-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হরিজনদের নিয়ে লেখা এঁর 'মালাপল্লি' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে, আজো বইটির আদর কমেনি। লেখক এই উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন, হরিজনদের সততা ও বিশ্বস্ততার চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এর পরেই উল্লেখযোগ্য কবিসম্রাট বিশ্বনাথের বিরাট উপন্যাস 'বেয়িপডগলু'-র নাম। আন্ধ্রের সমাজজীবনের এ এক জীবন্ত চিত্র। উপন্যাসটির জন্যে আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় লেখককে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। 'বীরবল্লডু', 'বন্দম্নসেনানী', 'স্বর্গানিকি নিচ্চেন', 'চেল্লিমলিকট্ট' ও 'একবীরা' এঁর অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাস। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত রোমান্টিক উপন্যাস 'একবীরা' ভাষা, রচনাশৈলী ও চরিত্র সৃষ্টির স্বকীয়তায় তেলুগু সাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদ হয়ে রয়েছে। নোরি নরসিংহ শাস্ত্রী আন্ধ্রের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে দুটি স্মরণীয় উপন্যাস লেখেন—'নারায়ণ ভট্ট' ও 'রুদ্রম দেবী'।

পরবর্তী যুগে ঔপন্যাসিক হিশেবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন বুচ্চিবাবু। ইনিই প্রথম ঘটনার বদলে বেশি ঝোঁক দেন মনস্তত্ব বিশ্লেষণের দিকে। এঁর নায়ক-নায়িকারা সবাই এ-যুগের আবহাওয়ায় মানুষ, জটিল মানসিক দ্বন্দ্বে উদ্ব্যস্ত সর্বদা। প্রসঙ্গক্রমে এঁর 'চিভরকুমিগিলেদী'র ('অবশেষ') নাম

করা যায়। বাগভঙ্গির দিক দিয়েও বুচ্চিবাবু এক নতুন গদ্যশৈলীর প্রবর্তক। জেমস জয়েস ও হেনরী জেমসের ইনি অনুগামী। জনপ্রিয় না হলেও শিক্ষিত জনসমাজে বুচ্চিবাবুর সমাদর যথেষ্ট। তরুণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রীমতী মল্লদি বসুন্ধরা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এঁর 'তঞ্জুর পতন' আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। বইটিতে রাজাদের আমলের সামাজিক জীবনচিত্র মনোরম ভাবে চিত্রিত। এঁর 'দূরপুকোংডলু' উপন্যাসটিও বিখ্যাত।

উপন্যাসের তুলনায় ছোট গল্প বেশি সমৃদ্ধ। কিছুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এক তেলুগু লেখক —পালগুম্মি পদ্মারাজু। অথচ, আশ্চর্য এই, তেলুগু সাহিত্যে ইনি প্রধানত পরিচিত সুররিয়লিস্ট কবি হিশেবে। গুডিপতি বেঙ্কটচলম, কে কুটুম্ব রাও, টি গোপীচন্দ, শ্রীপাদ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, চিন্তা দীক্ষিতুলু, বেলুরি শিবরাম শাস্ত্রী প্রমুখের দানে আধুনিক তেলেগু ছোটগল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মিতভাষিতা ও কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষার জন্যে বেঙ্কটচলমকে মোপাসাঁ ও লরেন্সের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। লরেন্সের মুক্তজীবনবাদের প্রবক্তা ইনি। ব্যঙ্গাত্মক গল্প ও রেখাচিত্রে কুটুম্ব রাও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গোপীচন্দের উপজীব্য দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ—ছোট-গল্পে ইনি একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। শ্রীপাদ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী আধুনিক তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় ছোটগল্প-লেখক। এঁর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, লোক-সাহিত্যের অতিপরিচিত কাহিনীগুলিকে ইনি নতুন ভাবে নতুন রূপে তুলে ধরেছেন। শিবরাম শাস্ত্রী দার্শনিকভাবাপন্ন কথাশিল্পী। গল্পের চেয়ে ইনি অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস ও মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর সার্থক অনুবাদে। সাহিতি সমিতির বিশিষ্ট সদস্য চিন্তা দীক্ষিতুলু ডিটেকটিব উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও, পরবর্তী যুগে শক্তিশালী ছোটগল্প-লেখক ও নাট্যকার হিশেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অবিশ্যি মূলত ইনি শিশুসাহিত্যিক।

নাটকের ক্ষেত্রে তেলুগু সাহিত্যের তথা দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। অধিকাংশ নাটকের কাহিনী রামায়ণ-মহাভারত থেকে সংগৃহীত। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রথম সামাজিক নাটক গুরজাডা আপ্পারাওয়ের 'কন্যাশুল্কম', ১৯১০ সালের কাছাকাছি সময়ে রচিত।

নাটকটিতে বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণিত হয়েছে। প্রচারধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এর শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য। বরং, ভাবলে অবাক লাগে সে-যুগে এত সার্থক এমন বাস্তবানুগ নাটক রচনা কী করে সম্ভব হয়েছিল! প্রাচীন তেলুগু ভাষার নাগপাশ থেকে মুক্তির আন্দোলন যখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে, সেই সময় জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় নাটকটি রচিত হয়। 'মুচ্যালশরু' (মনিমাণিক্যের মালা) নামে এক নতুন গদ্যরীতি এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে।

কবিসম্রাট বিশ্বনাথের 'আনারকলি' ঐতিহাসিক নাটক হলেও মৌলিক সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত। 'আনারকলি' প্রকাশিত ১৯২৩ সালে। প্রধান বিচারপতি পি ভি রাজমান্নার প্রথম জীবনে কয়েকটি সামাজিক সমস্যামূলক নাটক লিখে খ্যাতিমান হন। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে লিখিত এঁর 'দেইয়ালা লঙ্কা' ('ভৌতিক দ্বীপ') একদা যথেষ্ট মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করেছিল।

সাম্প্রতিক তেলুগু নাট্যসাহিত্যে শক্তিধর নাট্যকারের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। এঁদের মধ্যে এ বেঙ্কটেশ্বর রাওয়ের নাম উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে। কিসান ও মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে ইনি অনেকগুলি সার্থক নাটক লিখেছেন। এঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'ভানতেনা' ('সেতু')। একটি ছোট্ট সেতু-নির্মাণের ফলে কিভাবে গ্রামের কিসান-জীবনে ঘটে গেল প্রচণ্ড ওলট-পালট—তারই বাস্তবধর্মী কাহিনী। তেলুগু সাহিত্যে প্রথম যাঁরা একাঙ্কিকা রচনা করেন তাঁদের মধ্যে গুডিপতি বেঙ্কটচলমের স্থান পুরোভাগে।

অন্যান্য

ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সে-যুগের ও এ-যুগের লেখকদের মধ্যে চিলকর্মর্তি, বি কামেশ্বর রাও, মুনিমানিক্যম নরসিংহ রাও, মোক্কাপাতি নরসিংহ শাস্ত্রী প্রমুখের নাম করা যায়। অনুবাদের প্রধান উৎস সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী। মাধবরাও শর্মা, তিরু বেঙ্গলাচার্য, পাপয়্যা শাস্ত্রী, বুলুসু বেঙ্কটেশ্বলু ও সুন্দররাম শর্মা বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেছেন। উপনিষদের অনুবাদক পন্তুলু লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী ও চর্ল গণপতি শাস্ত্রী। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের অনুবাদক শিবশঙ্কর শাস্ত্রী। ১৯৪৫ সালের পরে শরৎচন্দ্রের সমস্ত বই অনূদিত হয়েছে—অনুবাদ করেছেন বেলুরি শিবরাম শাস্ত্রী, চক্রপাণি ও বোংদেম্নপাটি শিবরামকৃষ্ণ। রবীন্দ্রনাথের

বহু বই অনূদিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বেজবাড গোপাল রেড্ডীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের স্রষ্টা ডাঃ কট্টমংচি রামলিঙ্গা রেড্ডী। এঁর 'কবিত্ব-তত্ত্ববিচারমু' সমালোচনা-সাহিত্যের আদর্শস্থানীয় গ্রন্থ হিশেবে স্বীকৃত। বইটিতে মহাভারত-আদি মহাকাব্যগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে কাব্যের তত্ত্ব, শৈলী, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ডাঃ রেড্ডী ইংরেজি সমালোচনা-পদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। রাল্লপল্লি, অনন্তকৃষ্ণ শর্মা, নডকুদুটি বীররাজু পন্তুল, বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ ও বেটুরি প্রভাকর শাস্ত্রী অন্যান্য কৃতি সমালোচক। এবং তরুণ সমালোচকদের মধ্যে পোট্লপল্লি সীতারাম রাও, পিল্লভরিং হনুমন্ত রাও ও ইন্দ্রকন্টি হনুমচ্ছাস্ত্রী খ্যাতনামা। অনন্তকৃষ্ণ শর্মা, মুটনূরি কৃষ্ণ রাও, পুট্টপর্ত্তি নারায়ণাচার্যুলু ও হনুমন্ত রাও শক্তিশালী প্রাবন্ধিক। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে বসন্ত রাও বেঙ্কট রাও, হরি আদি শেষুবু ও নারায়ণ রাওয়ের নাম করা যায়।

একটি কথা উপসংহারে স্বীকার করতেই হবে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তেলুগু সাহিত্য ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হলেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার সুস্পষ্ট অবনতি দেখা যায়। এর কারণ, সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রভাবে আধুনিক লেখকদের মন গড়ে উঠেছিল, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গণ্ডিবদ্ধ। এই গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেই লেখকরা চারপাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, সার্থক সাহিত্যও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু, যুগ-জীবনের জটিল দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি তাঁরা করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাঁদের মনোজগতে এক প্রচণ্ড আঘাত হানল, আধুনিক লেখকরা আধুনিক দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়-বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ফলে কেউ করলেন পশ্চাদপসরণ, কেউ লেখনী সম্বরণ। কবিসম্রাট বিশ্বনাথ চোখ ফেরালেন অতীতের দিকে, নতুন করে রামায়ণ রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি নামে যিনি পরিচিত ছিলেন সেই দেবুলপল্লি কৃষ্ণশাস্ত্রী শুরু করলেন সিনেমার শস্তা চটকদার গান লিখতে। রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রচারক রায়প্রোলু মূক হলেন, চিন্তা

দীক্ষিতুলু মগ্ন হলেন যোগ-সাধনায়। সাহিতি সমিতির কর্মতৎপরতা বন্ধ হল, নব্য সাহিত্য পরিষদ নামে মাত্র বজায় রইল।

এই সংকটকালে চটুলবাড পিচ্চয়্য-র নেতৃত্বে একদল তরুণ লেখক এগিয়ে এলেন গণ-সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ নিয়ে। প্রখ্যাতনামাদের মধ্যে 'শ্রী শ্রী' ও শ্রীরঙ্গ নারায়ণ বাবু এঁদের সাথে হাত মেলালেন। এই গোষ্ঠীর অন্যান্য শক্তিধর লেখক হিশেবে দাশরথী, আনিসেট্টি সুব্বা রাও, আরুদ্র, আত্রেয় অঞ্জতা, মান্সু ও রমনা রেড্ডীর নাম উল্লেখযোগ্য। গঠিত হল 'অভ্যুদয় রাচাইতালা সঙ্ঘমু'—প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘ। 'প্রজা সাহিত্যামু' অর্থাৎ গণসাহিত্য সৃষ্টি এঁদের বিঘোষিত আদর্শ। দেশীয় ঐতিহ্যের যা-কিছু শ্রেয় এঁরা তা গ্রহণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলেন বহির্জগতের দিকে। শুধু নতুন সাহিত্য সৃষ্টি নয়, নতুন লেখকদের 'শিক্ষিত' করে তোলার জন্যে এঁরা একটি স্কুল পর্যন্ত স্থাপন করেছেন—ভারতে যার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই।

এ-ধরনের সাহিত্য-প্রচেষ্টা খানিকটা প্রচারবাদী হতে বাধ্য। হয়েওছে। তবে কিনা, যুগ-সূচনায় সাহিত্য মাত্রেই কম-বেশি প্রচার হিশেবে দেখা দেয়, আবার শক্তিমান লেখকের হাতে এই প্রচারই হয়ে ওঠে কালজয়ী সাহিত্য। অন্যত্র অনুসন্ধানে কাজ কি, তেলুগু সাহিত্যে বীরেশলিঙ্গমই তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

মতবৈষম্য সত্ত্বেও এই সঙ্ঘের কবি দাশরথী, আনিসেট্টি সুব্বা রাও ও নাট্যকার আত্রেয়র প্রতিভা আজ সর্বজনস্বীকৃত। তেলেঙ্গানার কিসান বিদ্রোহ একাধিক বিপ্লবী কবির জন্মদাতা—দাশরথীর আসন নিঃসন্দেহে তাঁদের পুরোভাগে। এঁর কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিধারা' ও 'রুদ্রবীণা' এবং খণ্ড কবিতা 'মস্তিষ্কংলো লেবরেটরী' সর্বমতের সমালোচকদের প্রশস্তি পেয়েছে। আনিসেট্টি দাশরথীর চেয়ে অধিকতর কল্পনাকুশল। 'অগ্নিবীণা' এঁর স্মরণীয় কাব্যসংকলন। গণকবিতাও যে সার্থক কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, বিদগ্ধজনের মনোহরণ করতে পারে—দাশরথী ও আনিসেট্টি তা প্রমাণ করেছেন।

আত্রেয়র সামাজিক নাটক 'পরিবর্তন' প্রাচীনপন্থী সমালোচকদেরও মুগ্ধ করেছে। এঁর আরেকটি নাটক 'আদ্দেকোমপালু' (ভাড়াটে বাড়ি')—অতি আধুনিক তেলুগু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক হিশেবে সর্বজনস্বীকৃত। এক দরিদ্র কেরানির জীবনসংগ্রাম নাটকটির উপজীব্য। একদিকে চরম অর্থাভাব, অন্যদিকে ভাড়াটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কায় প্রতিটি দিন তার

বিড়ম্বিত। ন্যায়ান্যায়ের জটিল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে শেষ পর্যন্ত নায়ক আত্মসমর্পণ করল অন্যায়ের কাছে। নাটকটি ট্রাজেডি, কিন্তু এ-ট্রাজেডি ব্যক্তিবিশেষের নয়—বর্তমান সমাজের। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সাধারণ মানুষের প্রতি অপরিসীম দরদ, আর সমসাময়িক সমাজসত্যের সার্থক সাহিত্যায়নে সত্যিই এ এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

গত যুগের মত যুগন্ধর প্রতিভার স্বাক্ষর আজকের তেলুগু সাহিত্যে মিলবে না, তবে এর ভবিষ্যৎ যে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় নতুন আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
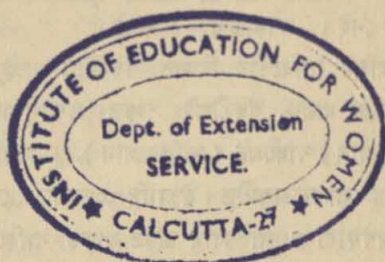
মালায়ালম

সংস্কৃতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সংস্কৃতের প্রভাবই প্রাচীন মালায়ালম সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি। মাঝখানে অবিশ্যি ফার্সীর প্রভাব কিছুটা পড়েছিল, তবে তা নেহাতই সাময়িক। কারণটাও নিছক রাজনৈতিক। সংস্কৃতের মত সে-প্রভাব দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারেনি। এমন-কি, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সমৃদ্ধতম যে-তামিল সাহিত্য তারও বিশেষ-কোন প্রভাব মালায়ালম সাহিত্যে নেই। কানাড়ীর তো নয়ই।

প্রাচীন মালায়ালম সাহিত্যের বিকাশ দ্বিমুখী: পট্টু ও মণিপ্রাবল। প্রথমটি লোকসংস্কৃতির ধারক, দ্বিতীয়টি সংস্কৃত ছন্দালঙ্কারের অনুসারক। কিলিপট্টু (বিহঙ্গের গান) বাঞ্চীপট্টু (মাঝির গান), তুল্ললপট্টু (নৃত্যসঙ্গীত), কৈকত্তিক্কালিপট্টু (লোকনৃত্যসঙ্গীত) ইত্যাদি প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর মহাকাব্য, সন্দেশকাব্য ও নাটকাদি রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে। অবিশ্যি, এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় ঘটনা, কাহিনী বা বিষয়কে সাহিত্যে রূপায়িত করে তোলার জন্যে সংস্কৃত রূপরীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অনেক চম্পূতে সংস্কৃত ও মালায়ালম ছন্দালঙ্কার অঙ্গাঙ্গী। আবার 'ভাগবত' (কৃষ্ণগাথা), 'রামায়ণ', 'ভারত' ইত্যাদি মহাকাব্যের কাঠামো সংস্কৃত থেকে নেওয়া হলেও এসবের ছন্দালঙ্কার বিশুদ্ধ মালায়ালম। তুল্লা জাতীয় কবিতার কাঠামো সংস্কৃত, ছন্দ মালায়ালম। প্রাচীন মালায়ালম সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, 'রামায়ণ' ও 'ভারত'-এর অনুবাদক টি রামনুজন ইজ্‌হুত্তাসন ভাষা ও ছন্দ ছাড়া আর সব বিষয়েই পুরোপুরি সংস্কৃতের অনুসারী।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত মালায়ালম সাহিত্যেও নবযুগের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘাতে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত গুটিকয় কবি-সাহিত্যিক এই নতুন চেতনার অগ্রদূত। অবশ্য দিকপাল এঁরা কেউই নন। নতুন সৃষ্টির চেয়ে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যের রোমন্থনেই এঁরা মনপ্রাণ নিয়োগ করেন। আবার, সংস্কৃতের বন্ধনমুক্তও হতে পারেননি।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মালায়ালম সাহিত্যের জন্ম বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে।

"............the *Gitanjali* of Rabindranath Tagore came to the notice of the people of Malabar when the great poet was awarded the Noble Prize, and his famous poem was made available in English. Soon his other poems also became accessible to the people in a language known to them. ***This was the turning point in the history of contemporary Malayalam poetry.***" (ইটালিক্‌স্‌ আমার)

আধুনিক মালায়ালম সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মালয়ালী পণ্ডিত ও সমালোচক ডাঃ সি কুনহাম রাজা এই উক্তি করেছেন। এই সঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন : ১৯১৪ সালে কেরল বর্মা বালিয়া কৈল তম্পুরণের মৃত্যু। ইজ্‌হত্তাসনকে বলা হয়ে থাকে মালায়ালম সাহিত্যের জনক, পরবর্তী যুগে তম্পুরণ লাভ করেছিলেন সাহিত্যসম্রাটের মর্যাদা। সাহিত্যকীর্তি এঁর সুবিশাল নয়, তবু ইনিই ছিলেন সমসাময়িক কবিকুলের গুরুস্থানীয়—অতীত-অনুসারীদের প্রতিনিধিস্বরূপ। এঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাই ঘোষিত হল বিগত যুগের অবসান।

কাব্যসাহিত্য

আধুনিক মালায়ালম কাব্যের পথিকৃৎ কুমারন আসান। আসান একাধারে কবি, দার্শনিক ও সমাজ-সংস্কারক। চিরাচরিত রীতি পরিহার করে ইনিই প্রথম নিছক পৌরাণিক পটভূমির বদলে সামাজিক ঘটনাকে আশ্রয় করেও কাব্যরচনা করেন। কাব্য-কাহিনীতে নায়ক-নায়িকার মর্যাদা দেন, দেবদেবী নয়, সাধারণ মানুষকে।

'ঝরা ফুল'-এর কবি হিশেবে আধুনিক কাব্যসাহিত্যে আসানের আবির্ভাব। এবং 'ঝরা ফুল' শুধু আসানের নয়, আধুনিক মালায়ালম কাব্যসাহিত্যের স্মরণীয় এক কবিকীর্তি :

> এই তো সেদিন বৃন্তচূড়ে রানির গরিমায়
> উঠলি ফুটে ভোরের ফুল, দ্যুতির প্লাবনে

ভাগ্য আজো অনিশ্চিত! আকাশ ছুঁয়ে হায়
এই তো ছিলি, আনত আজ ধুলোর আসনে।

(অনু: মিহির সেন)

একটি ফুলের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে উপলক্ষ্য করে কাব্যমণ্ডিত একটি দর্শনতত্ত্ব কবি এখানে প্রচার করেছেন—ফুলের জন্ম কুঁড়ি হিশেবে, পাতার আশ্রয়ে সে বেড়ে ওঠে, পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনিতে চোখে নামে তার নিশ্চিন্ত ঘুমাবেশ, চাঁদ-সূর্যের নির্যাস পান করে ধীরে ধীরে সে মাথা তোলে, বিকশিত হয়ে ওঠে তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, রঙিন প্রজাপতি আর মৌমাছির দল তখন ছুটে আসে সৌন্দর্যের আকর্ষণে। আর, নিজেকেও ফুল বিলিয়ে দেয় বিনিঃশেষে। তারপর একদিন, অনিবার্য মৃত্যু এসে হানা দেয়—মৃত্যুর কাছে তো সুন্দর কুৎসিতের কোন প্রভেদ নেই। মৃত্যু হয় ফুলের। হোক্ মৃত্যু, দুঃখের কি রয়েছে তাতে! ক্ষণিকের জন্যে হলেও তো সে পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচেছিল, পূর্ণাঙ্গ জীবনের আস্বাদ পেয়েছিল। চিরকাল পরের অবজ্ঞা-অনাদর সয়ে সয়ে পথের ধুলোয় দিন কাটানোর চেয়ে, অনেক মহিমময় এই ক্ষণিক জীবন :

শোক কোরো না ওই ফুলের জন্য
ওর ঝরা পাপড়িগুলি একদিন
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যাবে ধুলোর সাথে
সবাই ভুলে যাবে ওর কথা।
পৃথিবীতে আমাদের পরিণতিও
অবিকল এই রকম
মিছেই চোখের জল ফেলা!

কাব্য, সঙ্গীত ও দর্শনের আশ্চর্য মিতালি ঘটেছে এই কবিতাটিতে। এবং, আঙ্গিকের দিক দিয়েও 'ঝরা ফুল' নতুনের স্রষ্টা।

'চণ্ডাল ভিক্ষুকী', 'দুরবস্থা' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আসান অস্পৃশ্যতা প্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। সংকীর্ণ জাতিধর্মের ওপরে তিনি আসন দিয়েছিলেন মানুষকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মাত্র একটি সম্পর্ক রয়েছে, তা হল প্রেমের সম্পর্ক :

প্রেমের থেকেই জন্ম হয়েছে ওই পৃথিবীর
প্রেমই এর প্রেরণা, প্রেমই এর লক্ষ্য
প্রেমই জীবন।

প্রেমের অবসান—মৃত্যু !
নরকের দগ্ধ ধূসর প্রান্তরে
প্রেম গড়ে তোলে নতুন ইন্দ্রলোক।
প্রেমই সেই রাসায়নবিদ
জননীর দেহের শোণিতকে যে পরিণত করে
সন্তানের জন্ম সুধায়।

আধুনিক মালায়ালম সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভাল্লাথোল নারায়ণ মেনন। শুধু কবি নয়, নতুন কাব্য-আন্দোলনের স্রষ্টাও। মালাবারের কবিসম্রাট, মহাকবি ভাল্লাথোল। জাতীয় কবি হিশেবে পূজিত তিনি।

কৈশোর থেকেই ভাল্লাথোল কবিতা রচনায় ব্রতী। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, তাই এঁর প্রথম জীবনের কবিতায় সংস্কৃত রূপরীতির অনুসৃতি স্পষ্ট। কিন্তু, প্রথম সমরোত্তর গণ-আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে তাঁর কবিমনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হল। ক্রান্তিকালে তিনি আবির্ভূত হলেন জনগণের কবি হিশেবে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ালেন, ভাষা দিলেন গণমুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে।

মালাবারে জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা ভাল্লাথোল। গান্ধী-আন্দোলনকে তিনিই মালাবারে জনপ্রিয় করে তোলেন। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিকে তিনি সোচ্চার করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অসাম্য ও ধনবণ্টন নীতির বৈষম্যকেও আক্রমণ করলেন তীব্র ভাবে। তাঁর কবিতা হয়ে উঠল শোষিত মানুষের মুক্তির মৃদঙ্গধ্বনি।

সাম্রাজ্যবাদী সরকার সেদিন তাঁকে নানাভাবে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল, সুবিধে করতে পারেনি। প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এসে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানান, উপাধি ও নানা পুরস্কারের লোভ পর্যন্ত দেখানো হয়—কিন্তু শোষক সরকারের সেই প্রতিনিধির সাথে দেখা করতে সরাসরি অস্বীকার করেন কবি। মুখের ওপর জানিয়ে দেন : যে-সরকার তাঁর দেশবাসীর রক্ত শোষণ করে বেঁচে রয়েছে তার হাত থেকে কোন রকম পুরস্কার নিতে তিনি ঘৃণাবোধ করেন। এ তো পুরস্কার নয়—ঘুষ !

ভাল্লাথোলের কবিতা ও গানে উজ্জীবিত হয়ে সেদিন হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কবির ভাষায়ঃ

এই বীরদের কাছে
হাতকড়া যেন সোনার কাঁকন
বন্দীশালা—বিলাসনিকেতন।

'আমাদের জবাব' কবিতায় তিনি ঘোষণা করেনঃ

হয় যাব শেষ গন্তব্যের ঠিকানায় পৌঁছিয়ে
নয় নিক মুছে মৃত্যু এ-পথ থেকে
অপ্রতিহত দৃপ্ত কদমে সামনে এগিয়ে যাব
দুপায়ে মাড়িয়ে যত বাধা-বিঘ্নকে।
(অনুঃ মিহির সেন)

'কিসানের গান' কবিতায় সরকারি নৃশংসতাকে উদ্দেশ করে কবি বলেনঃ

যখনই দেখেছি ঋজু কোন মাথা
টান হয়ে দাঁড়িয়েছে
ঝল্‌সিয়ে ওঠে তোমাদের তলোয়ার,
বর্শাফলক চোখের পলকে
ছুটে চলে সেই দিকে
—রাইফেল করে আগ্নেয় উদ্‌গার।
(অনুঃ মিহির সেন)

ভাল্লাথোল আজ প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। তবু আজো বার্ধক্য তাঁর মনের নাগাল পায়নি। ভারতের জাতীয়-আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি অগ্রণী সৈনিক হিশেবে এগিয়ে চলেছেন। বরং দিনে দিনে তাঁর গণ্ডিবদ্ধ জাতীয়তাবাদ পাখা মেলেছে সারা বিশ্বের মুক্ত আকাশে। সোভিয়েট ইউনিয়নে তলস্তয়ের স্মৃতিসৌধে নাৎসীদের বোমাবর্ষণের সংবাদে তাই কবিকণ্ঠে ধিক্কার শোনা যায়ঃ

যুদ্ধোন্মাদ পশুরা কি ভেবেছিল
তলস্তয় শুধু রাশিয়ার ?
তিনি কবি, তিনি শিক্ষক,
মানুষের প্রেমে ও শ্রদ্ধায় মহান তিনি।……

সাম্রাজ্যবাদের অস্থির আজ আসন,
মানুষ আর মানুষের ক্রীতদাস থাকবে না
—সে-কথা ভেবেই আমার জাগ্রত আত্মা
গান গেয়ে উঠেছে আজ।

চীনে জাপানী বর্বরতার বিরুদ্ধেও কবিকণ্ঠের প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। 'অধঃপতন' নামে একটি কাহিনী-কবিতায় মর্মস্পর্শী ভাবে তিনি বর্ণনা করেন—কি করে মা'র কোল থেকে দুধের বাছাকে ছিনিয়ে নিয়ে এক জাপানী সৈনিক তাকে নৃশংস করে হত্যা করল। এই কাহিনী-কবিতাটি নিয়ে একটি নৃত্যনাট্য (কথাকলি) পর্যন্ত নানাস্থানে অভিনীত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ঐতিহ্যসমৃদ্ধ দক্ষিণ-ভারতের এই নাট্য-আঙ্গিকটিকে ভাল্লাথোলই প্রথম এবং সার্থক তার সঙ্গে যুগোচিত ভাবে প্রয়োগ করেন।

ভাল্লাথোলের দেশপ্রেমমূলক কবিতাবলী 'সাহিত্য মঞ্জরী'-তে সংকলিত।

রাজনীতি নিয়ে কবিতা রচনা করলেও ভাল্লাথোল রাজনীতিসর্বস্ব নন, বা তাঁর লেখায় কাব্যের চেয়ে রাজনীতি কখনো বড় হয়ে ওঠেনি। আর, সব কবিতাই যে তাঁর রাজনীতি-কেন্দ্রিক তাও না—'শিষ্যনুম মাকানাউম' (গুরু-শিষ্য), 'আচ্চানুম মাকালাউম' (পিতা-পুত্রী), 'কোচু সীতা' (ছোট্ট সীতা), 'ওরু চিত্রম' (একটি চিত্র) ইত্যাদি কবিতায় রাজনীতির নামগন্ধও নেই, ভাল্লাথোলের বহুমুখী কাব্যপ্রতিভার নিদর্শন এগুলি।

ভাল্লাথোল শুধু কবিই নন, সংস্কৃত কবি ভাসের অনেকগুলি নাটকও তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর নিজস্ব একটি কথাকলি নৃত্য-সম্প্রদায় রয়েছে এবং কিছুকাল আগে শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে সেই সম্প্রদায় নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। যে-অফুরান প্রাণশক্তি, সত্যদৃষ্টি ও আদর্শনিষ্ঠা থাকলে কোন কবি আমৃত্যু অগ্রনায়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন, ভাল্লাথোলের তা রয়েছে পুরোমাত্রায়। মালায়ালম সাহিত্যে বর্তমান যুগকে তাই বলা হয়ে থাকে 'ভাল্লাথোল-যুগ'।

ভাল্লাথোলের যুগেও যাঁরা ধ্রুপদী ঐতিহ্যের অনুসরণে বিশিষ্ট তাঁদের মধ্যে উল্লুর এস পরমেশ্বর আইয়ার ও কুত্তিপুরথ কেশবন নাইয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। 'রাজনীতির অসৎ সংসর্গ' এড়িয়ে কবিতার অদ্বিতীয় ব্রতে ব্রতী এঁরা। সমসাময়িক রাজনৈতিক জাগরণ বা জাতীয়তাবোধের স্বাক্ষর অনুপস্থিত

এঁদের কবিতায়। উল্লুর শুধু কবি নন, পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও এঁর অসাধারণ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনুসারী ইনি, অতীত অভিসারী—পুরনো ধ্যান-ধারণাকে উপস্থাপিত করেছেন নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে। এ-যুগের আরেক শক্তিশালী কবি কে এম পানিক্কর। ভাল্লাথোলের শিষ্য হিশেবে আত্মপরিচয় দিলেও আসলে ইনি সমন্বয়বাদী। ধ্রুপদী ও আধুনিক কাব্য-রীতির সুচারু সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন পানিক্কর। ভাবের চেয়ে কাব্যশরীরের অলঙ্করণে বেশি মনোযোগী। পুরনো চম্পূ-কাব্যরীতিকে ইনি নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। প্রাচীন মালায়ালম চম্পূগুলিতে সংস্কৃত ও মালায়ালম ছন্দ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হত, পানিক্কর সংস্কৃত চম্পূর অনুসরণে তাঁর চম্পূগুলিতে গদ্য ও পদ্য দুই-ই ব্যবহার করেছেন। 'পঙ্কীপরিণয়' (পঙ্কীর বিবাহ) এঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। প্রাচীনকালের স্বয়ম্বর-সভার রীতি অনুযায়ী পঙ্কী নাম্নী এক তরুণীর বিবাহ-অনুষ্ঠান এতে বর্ণিত। প্রসঙ্গ ক্রমে কবি এমন অনেক ব্যক্তিচরিত্র এঁকেছেন, মালাবারের সমাজে যাঁরা সুপরিচিত।

জি শঙ্কর কুরুপের আসন, কারো কারো মতে, ভাল্লাথোলের পরেই। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক ভাবধারার প্রভাবে ইনি প্রভাবিত একান্ত। নতুন নতুন প্রতীকের সৃষ্টিতে ও ভাষার পরিমার্জনায় মালায়ালম কাব্যসাহিত্যে শঙ্কর কুরুপ নতুন একটি ধারার প্রবর্তক, বহু তরুণের অগ্রজস্থানীয়। কুরুপের কবিকল্পনা দূরবিস্তারী, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের রসে অভিসিঞ্চিত এঁর কবিতা। কবিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষারও এঁর অন্ত নেই। রাজনীতির দিক দিয়ে কুরুপ গান্ধীবাদের উদারমানবিকতার বিশ্বাসী। এই সঙ্গে আরও একজনের নাম করা উচিৎ—চঙ্গম পূজা কৃষ্ণ পিল্লৈ। প্রথম দিকে ইনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এক সময়ে জনসাধারণের মুখে মুখে শোনা যেত কৃষ্ণ পিল্লৈ-র কবিতার পংক্তি, গানের কলি। সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আবেগকে কেন্দ্র করে লেখা এঁর গান ও কবিতাগুলির সাহিত্যমূল্যও কিন্তু বড় কম নয়। চুটকি প্রেমের গানও যেমন লিখেছেন, তেমনি এযুগের সমাজসত্যকে কাব্যকাহিনীর মধ্যে দিয়েও তুলে ধরেছেন সার্থক ভাবে। যথা—এঁর একটি কবিতার কাহিনী হল: বাবা, মা ও চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে গরিবের এক সংসার। নিজেদের হাতে তারা একটি

কলাগাছের চারা রোপণ করেছে—সমগ্র পরিবারটি প্রতীক্ষায় রয়েছে কবে এই চারাটি গাছে পরিণত হবে, ফল ধরবে। স্বপ্ন দেখ্‌ছে সোনালী ভবিষ্যতের। হায়, স্বপ্ন একদিন সত্য হয়, কিন্তু বাস্তব তার চেয়েও বড় সত্য!—জমিদারের লোকেরা এসে তাদের চোখের ওপর কলার কাঁদিগুলি কেটে নিয়ে চলে গেল।···অতি সাধারণ কাহিনী, কিন্তু লেখার গুণে অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আধুনিক কবিতায় কৃষ্ণ পিল্লে-ই প্রথম গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিকে শহুরে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করেন। এঁর গ্রাম্য গাথা-কাব্য 'রামনন' শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমাদৃত। সংস্কৃত রূপরীতির প্রভাব থেকে ইনি একেবারে মুক্ত, লোকসংস্কৃতির ধারাবাহী।

মহিলা কবিদের মধ্যে একমাত্র বালামণি আম্মার নাম করা যায়। কিছুটা প্রগতিশীল ভাবধারা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারিণী হলেও মূলত ইনি প্রাক্তন কবিকুলের অনুগামী।

যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিশেষ করে মার্কসবাদ ও সোভিয়েট সাহিত্যের প্রভাবে কাব্যক্ষেত্র নতুন একটি চেতনার আভাস অধুনা পাওয়া যাচ্ছে। সে-চেতনা এখনো অবশ্য আভাস মাত্রই। হয় তা স্রেফ শ্লোগানপ্রাণ, নয় নিছক ভঙ্গি দিয়ে ভোলাবার প্রয়াস। 'জীবাৎ সাহিত্য' গোষ্ঠীর একদল তরুণ লেখক নতুন পথে পদক্ষেপ শুরু করেছেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রয়াস এঁদের প্রশংসনীয়। এই লেখকদের মতে—সাহিত্য সর্বসাধারণের সম্পদ। দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের সমাজতান্ত্রিক। কাব্যক্ষেত্রে ভাবগত পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত আঙ্গিক-আবিষ্কারের দিকেও এঁরা যত্নবান। যদিচ তেমন শক্তিধর এঁদের মধ্যে কেউ-ই নেই, ইতিহাসের পাতায় এঁদের নামও হয়ত থাকবে না—তবু এই গোষ্ঠীর আদর্শ ও যুগচেতনাই ভাবীকালের সাহিত্যের জন্মদাতা।

কথাসাহিত্য

ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদ বা অনুকরণের মধ্য দিয়ে মালায়ালম সাহিত্যে উপন্যাস রচনা শুরু। ইংরেজির পরেই বাংলা। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—মালাবারের

পাঠকসমাজে এঁরা জনপ্রিয়ই শুধু নন, মালায়ালী কথাশিল্পীরাও উদ্বুদ্ধ এঁদের প্রেরণায়।

সার্থক সামাজিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মালায়ালম সাহিত্যে নেই, আজো না—বিস্ময়ের হলেও কথাটি সত্যি। বাংলার পটভূমিকায়, বাঙালিদের নিয়ে উপন্যাস রচনার একটা ঝোঁক একদা সাহিত্যিকদের পেয়ে বসেছিল। এই ভাবে তাঁরা সামাজিক উপন্যাসের অভাবটা মেটাতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সে-সব উপন্যাস যেমন নিষ্প্রাণ তেমনি বাস্তবতাবর্জিত। আসলে সেগুলি কোন-না-কোন বাংলা উপন্যাসেরই অক্ষম অনুকৃতি মাত্র। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে কয়েকজনের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন টি এন আপ্পু নেড়ুনগাড়ি এবং চান্দু মেনন। নেড়ুনগাড়ির 'কুন্দলতা' ও মেননের 'ইন্দুলেখা' ও 'সারদার' জনপ্রিয়তা আজো অব্যাহত। মালায়ালম সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'ইন্দুলেখা'। আধুনিক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মার্তণ্ড বর্মা-কে নায়ক করে সি ভি রামন পিল্লৈ একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেন। এঁর 'রামরাজা বাহাদুর' ও 'ধর্মরাজা'র কাহিনীও ত্রিবাঙ্কুরের অতীত ইতিহাস থেকে গৃহীত। এঁরা ছাড়াও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিশেবে কোচিন রাজপরিবারের রাম বর্মা আপ্পন তম্পুরন, কে এম পানিক্কর, টি কে রামন নাম্বিসান, আম্বাডি নারায়ণ পডুভাল, কাপ্পানা কৃষ্ণ নাইয়ারের নাম উল্লেখ করা যায়। আজকের শক্তিশালী ঔপন্যাসিক তাকাঝি শিবশঙ্কর পিল্লৈ, ভি এ বশীর ও পি কেশবদেব। তাকাঝির কয়েকটি উপন্যাস হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে।

উপন্যাসের অভাব ছোট গল্প মিটিয়েছে অনেকখানি। বলতে-কি, ছোট গল্পকে আশ্রয় করেই আধুনিক মালায়ালম কথাসাহিত্যের বিকাশ। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ছোটগল্পের ইতিহাস একটানা অগ্রগতির বিস্ময়কর ইতিহাস। কবিতায় যেমন আধুনিক ধ্যানধারণা ও রূপরীতির প্রকাশ সুস্পষ্ট, ছোটগল্পে তেমনি যুগ-জীবনের প্রতিচ্ছবি।

এম, কুমারন, ওড়ুভিল কুন্হিকৃষ্ণ মেনন, এ নারায়ণ পডুভাল ও কে সুকুমারন —প্রথমযুগের কৃতি লেখক এঁরা। এঁদের গল্প অবশ্য কাহিনীপ্রধান। নিছক আনন্দবিধান ছাড়া আর-কোন উদ্দেশ্য এঁদের ছিল না। তাই সমসাময়িক কালে যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও, পরে পাঠকশ্রেণীর রুচিবদলের ও

ছোটগল্পের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের জনপ্রিয়তাও হ্রাস পায়। ইংরেজির অনুকরণে ই ভি কৃষ্ণ পিল্লৈ অজস্র গল্প লিখেছিলেন। প্রশংসাও প্রচুর লাভ করেছিলেন—আজ কিন্তু ইনি নামে মাত্র বজায়।

আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্পলেখক তাকাঝি শিবশঙ্কর পিল্লৈ। শুধু কাহিনীর সুঠাম বিন্যাস নয়, সমাজচেতনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। 'জীবাঠ সাহিত্য' গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় সদস্য ইনি। এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমালোচকদের বিরূপতার অন্ত নেই। তাঁদের অভিযোগ—এই গোষ্ঠীর লেখকরা নাকি শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার করে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের যথোচিত মর্যাদা দেয়না, সাধারণ মানুষকে নিয়ে বাড়াবাড়ি এদের অসাধারণ—ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীর কোন কোন লেখক সম্পর্কে একটি কথা অবিশ্যি সত্যি যে বাস্তব সাহিত্যের নামে তাঁরা বস্তিসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বকলমে প্রাধান্য দিচ্ছেন মনোবিকারকে, সমাজচেতনার দোহাইয়ে যৌন অনাচারকে। লেখকের ব্যক্তিগত অক্ষমতাই দায়ী এর জন্যে। কেননা, তাকাঝি, এস কে পট্টেকাট, কেশবদেব, পনকুন্নম বার্কে, করুর নীলকণ্ঠ পিল্লৈ ও ভি এ বশীর—এঁরা সকলেই এই গোষ্ঠীর সদস্য হলেও এঁদের আসন, সকল মতাবলম্বী সমালোচকদের মতে, আধুনিক ছোট গল্পলেখকদের পুরোভাগে।

তাকাঝির পরেই নাম উল্লেখযোগ্য কেশবদেব ও পট্টেকাটের। দরিদ্র নিপীড়িত জনসাধারণের জীবনকে দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে এঁরা বিভিন্ন গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। কেশবদেব আশাবাদী, তবে সে-আশাবাদ প্রায়শই বড়-বেশি উচ্চকণ্ঠ। তাই প্রচারবাদিতার একটা গুনগুন অভিযোগ শোনা যায় এঁর বিরুদ্ধে। শিল্পী হিশেবে পট্টেকাটের স্থান কেশবদেবের ওপরে। এঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর, এবং অনেক গল্পেই তার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে পট্টেকাটের লেখায় অন্যত্র-দুর্লভ একটি স্বাদ পাওয়া যায়। বশীর মালাবারের মুসলিম জনজীবনের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। এঁরই সঙ্গে নাম উল্লেখযোগ্য পি সি কুট্টিকৃষ্ণনের। ইনি 'উরুব' ছদ্মনামে লিখে থাকেন। মালাবারের মধ্যবিত্ত জীবন, বিশেষ করে, নায়ার ও মুসলিম এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের কুশলী রূপকার উরুব। গল্পে বাস্তব আবহ সৃষ্টির জন্যে ভাষায় ও সংলাপে ইনি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার

করেন, রুচিবানদের কানে যা শ্রুতিকটু ঠেকে, রুচিবাগীশদের কাছে অশ্লীল যৎপরোনাস্তি। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বার্কে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ধর্মীয় গোঁড়ামির ওপর এঁর আক্রমণ দ্বিধাহীন, নির্মম। কক্কর বাহ্যত বাস্তববাদী হলেও আসলে রোমান্টিক মানবতাবাদের সেবক।

লেখিকাদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করা যায়—শ্রীমতী পার্বতী অন্তর্জানম ও শ্রীমতী সরস্বতী আম্মা। শ্রীমতী পার্বতী অন্তর্জানম পর্দানশীল নারীসমাজের ব্যথা-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক লিপিকার। শ্রীমতী সরস্বতী আম্মা বিদ্রোহিনী কথাশিল্পী—নারী জাতির মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত।

নাটকের জন্ম মাত্র গত শতাব্দীতে, সংস্কৃতের অনুবাদের মধ্যে। বহুবিখ্যাত কথাকলি অবিশ্যি শ'দুই বছরের প্রাচীন, কিন্তু কথাকলিকে প্রকৃতপক্ষে নাটক বলা যায় না। আজো সত্যিকারের নাট্যসাহিত্য বলতে কিছুই গড়ে ওঠেনি। নাটকের সংখ্যা নগণ্য না হলেও সেগুলি হয় সংস্কৃত নয় ইংরেজির ভাষান্তর মাত্র। অধিকাংশ নাটকেরই কাহিনী পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক।

আধুনিক যুগের প্রথম নাট্যকার কে এম পানিক্কর। সংস্কৃত নাটকের কাঠামো মূলত বজায় রেখে ইনি তার কিছু-কিছু সংস্কার করেন। পুরাণ বা ইতিহাস থেকে নাটকের কাহিনী নিয়ে তাতে আধুনিক বক্তব্য পরিবেশন করেন পানিক্কর। ধ্রুপদী ও আধুনিক রীতির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায় এঁর 'মন্দোদরী', 'ভীষ্ম', 'ধ্রুবস্বামিন' ইত্যাদি নাটকে।

অধুনা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে শ'র অনুকরণে কিছু-কিছু নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য হিশেবে সেগুলি সার্থক হয়ে ওঠেনি। শ'র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ স্থূল ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত। তবু, এরি মধ্যে, কে দামোদরন কিসান ও শ্রমিক জীবনের পটভূমিকায় বাস্তবধর্মী নাটক লিখে কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিদগ্ধ সমালোচক মহলে এঁর নাটকের মূল্য যাই হোক, অকুণ্ঠ জনসমাদর তা লাভ করেছে। অস্কার ওয়াইল্ড, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি নাটক অনূদিত হয়েছে।

মালায়ালম নাট্যসাহিত্যের এই অপূর্ণতার একটা কারণ, মনে হয়, কথাকলি নৃত্যনাট্যের অসাধারণ সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা। আধুনিক নাটকের অভাব

কথাকলিই অনেকখানি পূরণ করে রেখেছে। আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও যে কথাকলির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব মহাকবি ভাল্লাথোল তার প্রমাণ দিয়েছেন।

অন্যান্য

"At present Malayalam essays look very much like prize essays, school lessons or at best thesis for Doctorates."—বছর কয়েক আগে এই মন্তব্য করেছিলেন বিশিষ্ট মালায়ালী সাহিত্য-সমালোচক এম কুনহাপ্পা। অপ্রিয় হলেও কথাটি সত্যি। আর, গত ক বছরে প্রবন্ধ-সাহিত্যের এমন-কিছু উন্নতিও হয়নি যার জন্যে কুনহাপ্পার এই মন্তব্য আজ বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

তবে একথা অবশ্য ঠিক যে, কুনহাপ্পা এই উক্তি করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শকে সামনে রেখে, নতুন সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে কথঞ্চিৎ উন্নাসিক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে। নইলে মালায়ালম কথাসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রবন্ধ-সাহিত্যের—সাহিত্যের অন্যান্য শাখার—সমৃদ্ধি একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। অনুবাদ, জীবনী, আত্মজীবনী, সমালোচনা-সাহিত্য, গবেষণামূলক সাহিত্য, এমন-কি অতিআধুনিক রম্যরচনার নিদর্শনও সাম্প্রতিক মালায়ালম সাহিত্যে মিলবে। এ-ব্যাপার শুধু বিভিন্ন লেখক নন, 'বিদ্যাবিনোদিনী', 'রসিকরঞ্জনী' 'মালায়ালম মনোরমা' ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকা ও 'মাতৃভূমি', 'মালায়ালারাজ্যম' ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকার দান অসামান্য। মালায়ালম গদ্যের রূপান্তরে সংবাদপত্রের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

চারখণ্ডে সমাপ্ত পি নারায়ণ। পানিক্করের মালায়ালম সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থটি স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। মালায়ালম সাহিত্যের আদি থেকে আধুনিক কালের ইতিহাস বিধৃত এই গ্রন্থে। অবিশ্যি সাহিত্যেতিহাস রচনার ব্যাপারে অগ্রণীর সম্মান প্রাপ্য গোবিন্দ পিল্লের। সমালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-পদ্ধতির বদলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিভঙ্গিই অধিকতর অনুসৃত হয়ে থাকে। বহু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুবাদে এই বিভাগটি সমৃদ্ধ। সমালোচনা সাহিত্যে রাম বর্মা আপ্পন তম্পুরন, এ বালকৃষ্ণ পিল্লে, যোশেফ

মাণ্ডেশেরী কুট্টিকৃষ্ণ মারার, পি শঙ্করণ নাম্বিয়ার, ডাঃ কে গোডা বার্মা ও ডাঃ সি কুনহান রাজার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং হালকা রসাত্মক রচনায় ই ভি কৃষ্ণ পিল্লৈ, কে এম কুমারন, 'কেশরী' ও 'সঞ্জয়ন'-এর নাম। জীবনী-সাহিত্যে শুধু মালাবারের প্রাচীন কবি ও ইতিহাস-নায়করাই স্থান পাননি, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখকে নিয়েও একাধিক সাহিত্য-রসাশ্রিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনুবাদ সাহিত্যও খুববেশি পিছিয়ে নেই।

ভারতের মধ্যে মালাবারে, বিশেষ করে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে, শিক্ষিতের হার (পুরুষ শতকরা একশ, নারী কিছু কম) সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আশ্চর্য এই, সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকের 'রামায়ণ' ও 'ভারত'-এর সঙ্গে পরিচয় নামে মাত্র। অথচ আগেকার দিনে নিরক্ষর জনসাধারণও অন্যের মারফৎ প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। মালায়ালম সাহিত্যের পশ্চাৎবর্তিতার একটি কারণ এইখানে। পাঠকসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি না পেলে, আর যাই হোক, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি সম্ভব নয়।

পাঞ্জাবী

সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শত্রু যুদ্ধ। যুদ্ধে যত-না মানুষ মরে, মনুষ্যত্ব মার খায় তার চেয়ে অনেক বেশি। যুদ্ধের প্রথম বলি তো মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি। আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে।

বীরপ্রসবিনী পাঞ্জাব। কিন্তু সাহিত্যের সম্পদে সে সমৃদ্ধ নয়। কারণ, যে-শান্তিময় পরিবেশ সাহিত্য-সৃষ্টির অনিবার্য প্রয়োজন, পঞ্চনদের দেশ তা থেকে চিরবঞ্চিত। বারবার বৈদেশিক শক্তি ভারত আক্রমণ করেছে, আর তার সবচেয়ে বড় রণরঙ্গভূমি হয়েছে পাঞ্জাব। একেকটি যুদ্ধে তার ধনক্ষয় ও জনক্ষয়ই শুধু প্রচুর হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অগ্রগতিও ব্যাহত হয়েছে, বিপর্যয় ঘটেছে।

গুরুগোবিন্দ সিং তাঁর দরবারে সারা ভারতের অর্ধশতাধিক বিশিষ্ট কবিকে এনে সমবেত করেছিলেন। এঁদের দিয়ে তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান ও পার্শীদের ধর্মগ্রন্থসমূহ ও নানা ভাষার বহু ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ করান। এই অনূদিত গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপির ওজন নাকি ছিল আঠারো মণ।—মোগল বাহিনীর এক অভিযানেই সব একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়!

এ-ধরনের উদাহরণ আরো আছে। এরই ফলে পাঞ্জাব পেশীকে স্থান দিয়েছে মেধার ওপরে। বরং, বলা যায়—দিতে বাধ্য হয়েছে।

আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের অনগ্রসরতার আরেকটি কারণ—লিপির সাম্প্রদায়িকতা। কথা বলেন সকলে একই ভাষায়, কিন্তু লেখার সময় এক-এক সম্প্রদায়ের এক-এক অক্ষরলিপি। শিখরা ব্যবহার করেন দেবনাগরী-প্রভাবিত গুরুমুখী, মুসলমানরা লেখেন শারদা লিপি থেকে উদ্ভূত লন্ডা অক্ষরে বা ফার্সী হরফে। ধর্মসাহিত্য প্রায়-সবই গুরুমুখীতে লিপিবদ্ধ, সুফী কবিদের কবিতাবলী ও রোমান্টিক কাব্যকাহিনীগুলি ফার্সীতে। গত পঞ্চাশ বছরে গুরু-মুখীতে লিখিত সাহিত্যের যে-পরিমাণ সমৃদ্ধি ঘটেছে, ফার্সীর সে তুলনায় কম।

অধিকন্তু, পাঞ্জাবী ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য একটি চলিত রূপ আজো স্বীকৃত হয়নি। পাঞ্জাবের কথ্যভাষাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ পশ্চিম-পাঞ্জাবী—'লহন্দী' বা 'লহন্দে-দী-বোলী' নামে যা পরিচিত এবং পূর্বী-পাঞ্জাবী। আধুনিক সাহিত্যে প্রধানত পূর্বী-পাঞ্জাবীই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিখদের ধর্মপুস্তক 'আদিগ্রন্থ' বা 'গ্রন্থসাহেব' পূর্বী-পাঞ্জাবীর প্রাচীনতম পুস্তক। বইটি রচিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে।

ইংরেজির সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগের ফলেই ভারতীয় সাহিত্যে নব-জাগৃতির সূচনা—শুধু পাঞ্জাব এর ব্যতিক্রম। ১৮৪৯ সালে বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের ফলে রাজ্যে তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল বটে, জনসাধারণের ভাষা কিন্তু সরকারি দাক্ষিণ্য লাভ করল না। উর্দুই সরকারি ভাষা হিশেবে বজায় রইল, জনান্তিকে বাড়তে লাগল ইংরেজির প্রভাব। মাতৃভাষার বদলে ইংরেজি ও উর্দুর ওপর মাত্রাতিরিক্ত এই গুরুত্ব আরোপের পরিণাম ভালো হয়নি— এরই ফলে পরবর্তী যুগের শক্তিশালী লেখকদের অধিকাংশ নিজেদের সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেন ইংরেজি বা উর্দুকে। কবি ইকবাল, ডাঃ মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌, কৃষনচন্দর, রাজেন্দর সিং বেদী, উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক্‌, হাফিজ জলেন্ধরী, ফৈয়জ আহ্‌মদ ফৈয়জ, সাদাৎ হোসেন মিণ্টো, এ এস বোখারী, ধরম প্রকাশ প্রমুখ কবি-কথাশিল্পীরা যদি মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হতেন, কে জানে, আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের চেহারাই হয়ত পালটে যেত!

সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে পাঞ্জাবী সাহিত্যে নবযুগের শুরু। সেই যুগান্তরের পর্যায় আজো চলেছে। মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র একদিকে যেমন নতুন প্রেরণার সঞ্চার করে, অপরদিকে তেমনি নামধারী আন্দোলন এবং আহ্‌মেদিয়া, আর্যসমাজপন্থী ও সিংসভাপন্থীদের ধর্মান্ধতা অগ্রগতির রাশকে টেনে রাখে। স্বধর্মের স্বপক্ষে ও পরধর্মের বিপক্ষে প্রচার, অথবা শিখ-মুসলিম, শিখ-অশিখ যুদ্ধের বর্ণনা করাই ছিল এ-যুগের সাহিত্যিকদের একমাত্র লক্ষ্য। পুনরুজ্জীবনবাদী লেখক এঁরা। বর্তমানকে অস্বীকার করে এঁরা অতীতের বন্দনা করেছেন। ভাই বীর সিং, পূরণ সিং, কৃপা সগর প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

প্রথম মহাযুদ্ধ, আকালী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম জনমানসকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রভাব তার দৃঢ়মূল হয়নি। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি গদর পার্টির কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। প্রধানত তাঁদেরই প্রেরণার এক নতুন সাহিত্য-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। সমাজ ও রাজনীতি পাঞ্জাবী সাহিত্যে প্রথম প্রবেশাধিকার পেল। সন্তোষ সিং ক্যানাডিয়ান তাঁর 'কীর্তি' পত্রিকার মারফৎ বৈপ্লবিক আদর্শবাদ প্রচারে ব্রতী হলেন। সর্দার শার্দুল সিং কবিশের 'সংহত' পত্রিকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িকভাবে শিখ ধর্মের ব্যাখ্যা শুরু করলেন। এ-সময়কার দুই জনপ্রিয় কবি—হীরা সিং দর্দ ও উস্তাদ হামদান। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমানসে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল এঁরা তাকে বাণীমূর্তি দিলেন। গনমনের এই অসন্তোষ ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দা, যোশুয়া ফজলদীন, নানক সিং, ধনীরাম চাত্রিক প্রমুখ লেখকরাও অবশ্য সচেতন হন—কিন্তু তাঁরা বেছে নেন সমাজ-সংস্কারের পথ।

কাব্যসাহিত্য

প্রাচীন পাঞ্জাবী সাহিত্যে গদ্যের নিদর্শন নেই বললেই চলে। পাঞ্জাবের প্রথম কবি বাবা ফরিদ—বাবরের প্রায় সমসাময়িক ইনি। দোঁহার মধ্যে দিয়ে বাবা ফরিদই প্রথম পাঞ্জাবী ভাষায় ইসলাম প্রচার করেন। শিখধর্মের প্রবক্তা গুরু নানকও প্রভূত কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ইনিও ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিশেবে কাব্যের আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানে গুরু নানক, গুরু অঙ্গদদেব, গুরু অর্জনদেব প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। কাদির ইয়ার, হামিদ ইয়ার, শাহ্ হোসেন, পিলু, নাজাবৎ ও শাহ্ মুহম্মদ পাঞ্জাবের প্রাচীন কবি হিশেবে স্মরণীয়। ধর্ম, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ বা ধর্মকেন্দ্রিক দেশপ্রেমই প্রাচীন সাহিত্যের মূল সুর।

এবং, তার জের আজো চলেছে। আধুনিক যুগে শক্তিমান লেখকের সংখ্যা নগণ্য না, কিন্তু আধুনিক ধ্যানধারণা ও রূপরীতির অধিকারী এঁদের অধিকাংশই নন। মধ্যযুগীয় ভাবধারার প্রভাব স্পষ্ট এঁদের রচনায়।

জীবিত লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করা উচিত ভাই বীর সিংয়ের। উনবিংশ শতাব্দীর লেখক, অশীতিপর বৃদ্ধ—এখনো সমানে লিখে চলেছেন। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ—সব্যসাচী স্রষ্টা। রচনার পরিমাণও অপরিমেয়—এঁর সমুদয় রচনাবলী একত্র করলে নাকি চব্বিশ খণ্ড 'এনসাই-ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'কেও ছাড়িয়ে যাবে। শিখ জনসাধারণ ভাই বীরসিং-কে দেবতার মত শ্রদ্ধাভক্তি করে, এঁর রূপকধর্মী আধ্যাত্মিক কাব্যনাটক 'রাণা সূরৎ সিং'কে পবিত্র 'গ্রন্থসাহেব'-এর সমান মর্যাদা দেয়। 'রাণা সূরৎ সিং'-এ ইনিই প্রথম পাঞ্জাবী সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেন।

'গ্রন্থসাহেব' ভাই বীরসিংয়ের কাব্যরচনার, তথা তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উৎস; শিখ ধর্মের প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য। যুক্তিবুদ্ধির ওপরে ইনি বিশ্বাসকে আসন দেন:

ভিক্ষাপাত্রে পরিণত করেছিলাম আমার মনকে
জ্ঞানের অন্ন ভিক্ষা করে ঘুরেছি দ্বারে দ্বারে।
জ্ঞানের আবাস থেকে যে যা দিয়েছে
গ্রহণ করেছি না দেখে,
ভারী হয়ে উঠেছে ভিক্ষাপাত্র,
মন ভরে গেছে অহমিকায়—
আমি পণ্ডিত!
    মেঘের রাজ্যে বিচরণ করেছি অনায়াসে
    হোঁচট খেয়েছি মাটির পৃথিবীতে।......
তারপর একদিন গেলাম গুরুর কাছে
আমার ভিক্ষাপাত্র সমর্পণ করলাম তাঁর শ্রীচরণে।
'এ কি নোংরা আবর্জনা!'
চিৎকার করে উঠলেন তিনি
ঠেলে ফেলে দিলেন আমার ভিক্ষাপাত্র।
সব কিছু ধুলোয় ছড়িয়ে দিলেন।
বালি দিয়ে মাজলেন, আর
    জল দিয়ে ধৌত করলেন আমার পাত্র
        ধুয়ে মুছে ফেললেন জ্ঞানের কালিমা।

রুবাঈ-ধরনের ছোট ছোট কবিতাও ইনি পাঞ্জাবী সাহিত্যে প্রথম রচনা করেন। অতীন্দ্রিয় আকুতির সঙ্গে মানবিক হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণে সার্থক এঁর কবিতা :

স্বপ্নে তুমি আমার কাছে এসেছিলে।
তোমায় বুকে নেব বলে এগিয়ে গেলাম
পারলাম না। হায়রে স্বপ্ন !
আমার ব্যাকুল দুবাহু টনটন করে উঠল।
তখন উবু হয়ে পড়লাম তোমার পায়ের কাছে—
পা দুটি জড়িয়ে ধরব,
তোমার পায়ে মাথা গুঁজব।
হায় ! তবু তোমার নাগাল পেলাম না !
অনেক ওপরে তুমি
আমি অনেক নিচে !

নিছক প্রচারক ভাই বীরসিং নন, সার্থক সাহিত্যিকও। আধুনিক না হলেও অতীত-আধুনিকের সেতু হিশেবে এঁকে অভিহিত করা চলে।

ভাই পূরণ সিং ও ধনীরাম চাত্রিক প্রথমদিকে ভাই বীরসিংয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দুজনেই অনুপ্রাণিত হন, কিন্তু কাব্যরীতি ও ধ্যানধারণার দিক দিয়ে এঁরা কিছুটা নতুন পথের পথিক। পূরণ সিং পাঞ্জাবী কাব্যসাহিত্যে নতুন নতুন ছন্দের প্রবর্তক। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের কিছুটা প্রভাবও এঁর কবিতায় লক্ষণীয়। পূরণ সিংয়ের 'খুলে-ময়দান' ('উন্মুক্ত প্রান্তর') একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ধনীরাম আজো সগৌরবে বিরাজমান। বীর সিংয়ের সঙ্গে এঁর কবিদৃষ্টির পার্থক্য আছে—অধ্যাত্মবাদের অনন্ত আদর্শ থেকে বীর সিং কখনো চোখ ফেরান না, কিন্তু ধনীরাম সূক্ষ্ম মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দেশপ্রেমকেও তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন। লীরিক কবি হিশেবে ইনি সর্বাগ্রগণ্য। বীর সিংয়ের মত সর্বতোমুখী প্রতিভা না থাকলেও বর্তমান পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ কবি ধনীরাম। আধুনিক নন, তবে আধুনিকদের পূর্বসূরী নিঃসন্দেহে। এঁর 'চন্দনবারী' ও 'কেশরকিয়ারী' পাঞ্জাবী কাব্য-সাহিত্যের সম্পদ।

এ-যুগের অন্যান্য শক্তিমান কবি হিশেবে চরণ সিং শহীদ, মওলা বক্স খুশ্‌তা, হীরা সিং দর্দ, গুরুমুখ সিং মুসাফির, নন্দলাল নুরপুরী, ফিরোজ দীন স্রফ

ও হিদায়েতুল্লার নাম করা যায়। মওলা বক্স ফার্সী গজলের আঙ্গিকে কবিতা রচনা করে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন—এঁর 'দিওয়ানে-খুশ্‌তা' সবিশেষ জনপ্রিয়। হীরা সিং দর্দ-এর 'দরদ-শুনে'-তে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ স্পষ্ট। গুরুমুখ সিং কবি হিশেবে তেমন শক্তিশালী না হলেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান ও বন্দেমাতরমের অনুবাদক হিশেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লোকগীতিতে নন্দলাল নুরপুরী এবং গাথাকাব্যে ফিরোজ দীন শ্রফ ও হিদায়েতুল্লা জনপ্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁদের কাউকেই আধুনিক কবি বলা চলে না।

আধুনিক পাঞ্জাবী কবি হিশেবে মাত্র তিনজনের নাম উল্লেখ্য : মোহন সিং, প্রীতম সিং শফির ও শ্রীমতী অমৃত প্রীতম। মোহন সিং সমাজসচেতন কবি ও প্রগতিশীল কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা। লোকসাহিত্য ও প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ, সেই সঙ্গে রয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। কাব্য-আঙ্গিক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেছেন, এবং সে-পরীক্ষায় অনেকাংশে সার্থকও হয়েছেন। এঁর গান, গীতিকবিতা, গাথাকাব্য ও অন্যান্য কবিতাবলী আধুনিক পাঞ্জাবী কাব্যসাহিত্যের সম্পদ। 'কবি-দরবারে'ই ইনি স্বীকৃতি লাভ করেন, 'সবে-পত্তর' এঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। বিদগ্ধ সমালোচক হিশেবেও মোহন সিং খ্যাতিমান। 'পঞ্জ-দরিয়া' মাসিকপত্রের সম্পাদক। প্রীতম সিং শুধু শক্তিধর কবিই নন, আঙ্গিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইনি চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র এঁরই কবিতায় অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যরীতির প্রভাব দেখা যায়। প্রথম দিকে জীবনবাদী কবি হিশেবে আত্মপ্রকাশ করলেও ইদানীং রীতিমত সিনিক হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ আবার এঁকে বলেন—সুর-রিয়লিস্ট কবি। প্রীতম সিংয়ের পাঠকসংখ্যা বিশেষ এক গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আধুনিক হলেও শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের মেজাজ আলাদা। জাত কবি, যুগের কবি—কিন্তু বৈদগ্ধ্যবিলাসী নন। ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের ঝঙ্কারে, উপমা ও চিত্রকল্পের মনোহারিত্বে এঁর কবিতা একটি স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, বিষণ্ণ মধুর প্রেমের কবিতায় ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী :

হে আমার প্রেম
জাগো! জাগো!

স্বপ্নের ছোঁয়ায় ভারী হয়ে এসেছে
তোমার আঁখিপল্লব—
হারানো দিনের স্বপ্নে !
সেই হারানো দিন
—যখন বাতাসে ছড়ানো ছিল মধুর সৌরভ !
(তার জন্যে কি তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছ ?)
আজ
কৃষ্ণপক্ষের এই অমানিশার
আকাশের অযুত তারা যেন
হে প্রেম,
তোমায় পথ দেখায়।

প্রাচীন পাঞ্জাবের জনপ্রিয়তম মুসলিম কবি ও বিখ্যাত প্রেম-গাথা 'হীর-রঞ্ঝা'র অন্যতম রচয়িতা ওয়ারিশ শাহ্‌কে উদ্দেশ করে লিখিত এঁর কবিতাটি অত্যন্ত বিখ্যাত। ১৯৪৭-৪৮ সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সময় কবিতাটি তিনি লেখেন :

ওয়ারিশ শাহ, কথা কও ! কথা কও ! কবরের তলা থেকে তুমি কথা কও ?
তোমার প্রেমের উপাখ্যানে আজ
নতুন অধ্যায় যোজনা কর,
ওয়ারিশ শাহ্‌ !
একদিন পাঞ্জাবের একটি মেয়ের কান্নার সুরে
তোমার লেখনী লক্ষ লোককে কাঁদিয়েছে !
আর আজ
লক্ষ লক্ষ মেয়ে কাঁদছে, ওয়ারিশ শাহ্‌,
তোমার পানে তাকিয়ে রয়েছে আকুল ভাবে।...

বাবা বলবন্ত—বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীর কবি। এঁর 'মহানাচ' ও 'জ্বালামুখী' জনসমাদর লাভ করেছে, কিন্তু কাব্যের কারুকর্মে ইনি দক্ষ নন। অবতার সিং আজাদের কাব্য-সংকলন 'বিশ্ববেদনা' ও মহাকাব্য 'মর্দ আগাম্রা'-র মধ্যে আধুনিক মনোভাবের পরিচয় কিছুটা রয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি গুরুগোবিন্দ সিংয়ের জীবনকে ভিত্তি করে রচিত—কবি এখানে

নতুন দৃষ্টিতে গুরুগোবিন্দকে উপস্থাপিত করেছেন। অন্যান্য কবি হিশেবে শীলা ভাটিয়া, পিয়ারা সিং সহরাই ও দর্শন সিং আওয়ারার নাম করা চলে।

কথাসাহিত্য

কথাসাহিত্যের—অর্থাৎ উপন্যাস গল্প নাটকের—মধ্যে যা-কিছু সমৃদ্ধি ছোটগল্পের। অবশ্য গত শতাব্দী থেকেই ভাই বীর সিং প্রমুখ কয়েকজন লেখক উপন্যাস লিখে আসছেন, কিন্তু শিল্পবিচারে তাঁদের বইগুলিকে উপন্যাস নামে অভিহিত করা চলে না। অতিলৌকিক অসংলগ্ন ঘটনা, অবাস্তব চরিত্র ও ধর্মীয় প্রচারপ্রবণতায় সেগুলি ভারাক্রান্ত। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তাঁদের কাহিনীতে স্থান পায়নি। জনসাধারণের কাছে প্রিয় ছিল শিরীঁ-ফরহাদ, ইউসুফ-জুলায়খা, সোহ্‌নী-মহিঁওয়াল, হীর-রঞ্ঝা প্রভৃতি রোমান্টিক কাব্যকাহিনীগুলি। প্রায় চোদ্দজন খ্যাতনামা লেখক একই কিস্‌সা হীর-রঞ্ঝা লিখেছেন। তার মধ্যে ওয়ারিশ শাহ্‌-র 'হীর রঞ্ঝা'ই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। পরবর্তী যুগের লেখকরা নিছক জনরঞ্জনের মোহে মশগুল হয়ে ওঠেন। এর প্রথম ব্যতিক্রম নানক সিং।

বলতে গেলে, আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র ঔপন্যাসিক নানক সিং। শৈশবেই ইনি পিতৃমাতৃহীন হন, রুক্ষকঠোর বাস্তবের সাথে সংগ্রাম করে এঁকে বড় হতে হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই নানক সিংয়ের প্রধান উপজীব্য। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র ইনি বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। 'চিট্টা লৌ' (শাদা রক্ত), 'পবিত্র পাপী', 'চিত্রকার' প্রভৃতি উপন্যাসে এঁর সংস্কারবাদী মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু দুর্বল আঙ্গিক এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ এঁর লেখা নিছক কাহিনী বর্ণনায় পর্যবসিত। আর সে-কাহিনীও অতিনাটকীয়তা ও পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট।

বলবন্ত সিং কমল ('পালী'—রাখাল, 'পূর্ণমাসী'—পূর্ণিমা), হরনাম দাস সহরাই ('মেরি ভউটি'—'আমার স্ত্রী, 'হরিমন্দর'—সোনার মন্দির) প্রমুখ লেখকরা আধুনিক কালে ঔপন্যাসিক হিশেবে খ্যাতিমান—মধ্যযুগীয় রোমান্টিক ঐতিহ্যের অনুসারী এঁরা। কেবলমাত্র সন্ত সিং সেখোঁ-র

'লৌ তে মিটি' (রক্ত ও মাটি)-কে কিছুটা বাস্তবধর্মী বলা যায়। কিসান সংগ্রামের পটভূমিকায় বইটি রচিত—গ্রামজীবনের এক অন্তরঙ্গ ছবি এতে ফুটে উঠেছে।

আধুনিক পাঞ্জাবী কথাসাহিত্য বলতে ছোট গল্পের কথাই শুধু উল্লেখ করতে হয়। কবিতা ও উপন্যাসের তুলনায় এই বিভাগটি অনেক সমৃদ্ধ। সর্দার গুরুবক্স সিং, সন্ত সিং সেখোঁ, কর্তার সিং দুগাল, দেবিন্দর সত্যার্থী, অমৃত প্রীতম, সুজান সিং, নওতেজ সিং প্রমুখ প্রবীণ-নবীন বহু লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রাণবান লেখক সর্দার গুরুবক্স সিং। ইঞ্জিনীয়ার হিশেবে ইনি জীবন শুরু করেন, দীর্ঘকাল আমেরিকায় ছিলেন। শুধু পুঁথিপত্রের মারফৎ নয়, প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পসংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। পাঞ্জাবী সাহিত্যে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তকদের মধ্যে এঁর আসন সর্বাগ্রে। আধুনিক যুগ ও জীবনকে গুরুবক্স সিং-ই প্রথম সাহিত্যায়িত করেন।

সর্দারজীর প্রথম যুগের গল্পে যৌনতার বাড়াবাড়ি ছিল। এঁর 'পাবী ম্যানা তে হোর কঁহানিয়া' ('ময়না বৌদি ও অন্যান্য গল্প') একদা রক্ষণশীল সমালোচকদের অজস্র কটুক্তি অর্জন করে। এই গ্রন্থে সংকলিত প্রেমের গল্পগুলির মধ্যে ফ্রয়েডবাদের প্রভাব উৎকট। মনে হয়, ফ্রয়েডবাদের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্যই যেন গল্পগুলি রচিত। কিন্তু পরবর্তী কালে সর্দারজী এই মনোবিকার থেকে মুক্ত হয়ে ওঠেন।

শুধু সাহিত্য নয়, প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও সর্দারজী ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। শান্তিসম্মেলন উপলক্ষে সম্প্রতি ইনি চীন, সোভিয়েট ও পূর্ব-ইওরোপের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সফর করে এসেছেন। প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা 'প্রীত-লারী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সর্দারজী।

উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পে নানক সিংয়ের কৃতিত্ব সমধিক। মধ্যবিত্ত জীবনের সুখদুঃখের খণ্ডখণ্ড চিত্র ইনি গল্পের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। এঁর গল্পের বিশেষ কোন বক্তব্য নেই, কিন্তু তার মানবিক আবেদন পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। সন্ত সিং সেখোঁ নিচুতলার জীবনের রূপকার। গ্রামজীবন ও কিসানদের নিয়ে ইনি অনেক সার্থক গল্প লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গি

বিপ্লবী রোমান্টিক। সুজান সিং বহুকাল বাংলা দেশে ছিলেন। বাংলা দেশের পটভূমিকায় ইনি কয়েকটি সুখপাঠ্য গল্পও লিখেছেন। এঁর 'জীবন-লীলা'র নায়ক নায়িকা বাঙালি। বাংলার পটভূমিকায় আরও কয়েকজন গল্প লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে হরনামদাস সহরাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কর্তার সিং দুগালের গল্পে উচ্চবিত্ত সমাজের ঘুণধরা জীবনের হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। আঙ্গিকের কারুকর্মে ও চিন্তাধারার সূক্ষ্মবিন্যাসেও এঁর দক্ষতা যথেষ্ট। দুগালের 'সুবেরসার' (সকাল), 'ডঙ্গর' (জানোয়ার), 'নমাকার' (নতুন বাড়ি) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ অতিআধুনিক পাঠকসমাজে সবিশেষ জনপ্রিয়। ফ্রয়েডবাদে ইনি আজো সমাচ্ছন্ন। প্রগতিশীল জীবনধর্মী লেখক বলবন্ত সিং, দেবিন্দর সত্যার্থী ও নওতেজ সিং। নওতেজ বয়েসে তরুণ ও সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান। মাত্র কয়েকটি গল্প ইনি লিখেছেন। বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব এঁর লেখায় স্পষ্ট। ইংরেজি, রুশ ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এঁর গল্প অনূদিত হয়েছে। নওতেজ সর্দার গুরুবক্স সিংয়ের পুত্র, 'প্রীত-লারী'র সহ-সম্পাদক। ছোটদের একটি মাসিক পত্রিকাও ইনি সম্পাদনা করে থাকেন।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদের মধ্যে দিয়েই আধুনিক পাঞ্জাবী নাটকের জন্ম। শেক্সপীয়রের অনুসরণেও কয়েকটি নাটক লেখা হয়েছিল— যথা 'কিং লিয়র'-এর পাঞ্জাবী সংস্করণ 'দুখী রাজা'। কিন্তু এইসব অনুবাদ ও ভাবানুবাদ, অনুসৃতি বা অনুকৃতির চেয়ে ইতিহাস-নায়ক বা ধর্মগুরুদের জীবনী, অথবা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ভিত্তি করে রচিত নাটকগুলিরই সাহিত্যমূল্য বেশি।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় ভাই বীর সিংয়ের রূপকধর্মী আধ্যাত্মিক কাব্যনাটক 'রাণা সুরৎ সিং'। সে-সময় সারা পাঞ্জাবে বইটি মহা আলোড়নের সঞ্চার করলেও আধুনিক পাঠকের কাছে এঁর কোনই আবেদন নেই, অভিনয়যোগ্য নাটক নামেও অভিহিত একে করা যায় না।

আধুনিক যুগের একমাত্র সার্থক নাট্যকার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দা। শুধু যে বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতা পরিহার করে বর্তমান জীবন ও সমস্যাবলীকেই ইনি নাটকের উপজীব্য করেছেন তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ ও আঙ্গিক সব দিক দিয়েই পরিচয় দিয়েছেন অসাধারণ কৃতিত্বের। দৃষ্টিভঙ্গি

সংস্কারবাদী। অধিকাংশ নাটকেই স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার ও পণপ্রথার বিরোধিতা করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন উগ্র পাশ্চাত্যপ্রিয়তাকে, মুখোশ খুলে দিয়েছেন ধনী মহাজন ও দুর্নীতিপরায়ণ সমাজনেতাদের। এঁর শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়তম নাটক 'সুভদ্রা'। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রচারই নাট্যকারের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হিশেবেও নাটকটি রসোত্তীর্ণ। এঁরই সমধর্মী শক্তিমান নাট্যকার যোশুয়া ফজলদীন।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেয়ে একাঙ্কিকার সমৃদ্ধি বেশি। এ-ক্ষেত্রে সন্ত সিং সেখোঁ ('চার ঘর'—একাঙ্কিকা সংকলন), হরচরণ সিং ('সারে নাটক'—ঐ), ইন্দ্রসিং চক্রবর্তী ('পুরব-পশ্ছম'), বলবন্ত গর্গী, বলবীর সিং প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কর্তার সিং দুগাল ও রফি পীর রেডিও-নাটকে খ্যাতিমান।

অন্যান্য প্রধানত ধর্মগুরুদের জীবনী, দর্শনতত্ব, ধর্মতত্ব, ও সাহিত্যেতিহাসকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শাখা গড়ে উঠেছে। কিন্তু যুগধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সর্বত্রই বিরল। বিরাট সাহিত্যকীর্তি নামে পরিগণিত কহান সিংয়ের 'গুরু সাহেব রত্নাকর' (চারখণ্ড—সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠা) গতানুগতিক প্রথায় বর্ণিত সমগ্র শিখ ইতিহাস ও ধর্মের কাহিনী মাত্র। সর্দার জি বি সিংয়ের 'আদি গ্রন্থ সাহেব' এবং ভাই বীর সিংয়ের শিখ ধর্মের ভাষ্য, দার্শনিক প্রবন্ধাবলী এবং নানক ও গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জীবনীগ্রন্থ দুটি সম্পর্কেও এই একই উক্তি প্রযোজ্য।

বিষেণ এন ডি পুরী প্রথম পাঞ্জাবী অভিধান প্রণেতা। বুধ সিং প্রাক-আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের এক ইতিহাস রচনা করেছেন—বইটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। আধুনিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের পূর্বসূরী ভাই পূরণ সিং। প্রধানত কবি হিশেবে পরিচিত হলেও প্রবন্ধ-সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্য-রসাশ্রিত গদ্য রীতির আমদানি ইনিই প্রথম করেন। শেষ জীবনে পূরণ সিং বেদান্তদর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইস্তফা দেন সাহিত্য-সাধনায়। নইলে এঁর কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা গিয়েছিল। কৃতি গদ্যলেখক ও পাণ্ডিত্যের জন্যে অধ্যক্ষ তেজা সিং সুপরিচিত। এঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রগতিশীলতার আভাষ মাত্র না থাকলেও সমালোচক হিশেবে ইনি

অত্যন্ত সহৃদয়। পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে গোপাল সিং দর্দী, সন্ত সিং সেখোঁ, সুরিন্দর সিং কোলী, হরদয়াল সিং প্রমুখ প্রভৃত শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। লোকগীতি সম্পর্কে দেবিন্দর সত্যার্থীর 'দিবা বলে সারী রাত' (দ্বীপ জ্বলে সারা রাত) অত্যন্ত মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ। 'গীদ্দা' নাম দিয়ে লোকগীতির একটি সংকলনও ইনি প্রকাশ করেছেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনী আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। এবং সর্দার গুরুবক্স সিং, এই দিক দিয়ে, আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিকদের ইনি গুরুস্থানীয়।

সাহিত্যের ভূগোল বিস্তৃত হয় অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু আধুনিক বিদেশি সাহিত্য দূরের কথা বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্য থেকে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। অনুবাদ বলতে প্রধানত হয়েছে সংস্কৃত ও ফার্সী থেকে। তারপর হিন্দী, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য। অনেক ক্ষেত্রে আবার বাংলা বইয়ের অনুবাদ হয়েছে হিন্দীর মাধ্যমে। সার্থক অনুবাদক হিশেবে শ্বর সাহাবুদ্দীন ও নারিন্দর সিং সোচের নাম উল্লেখযোগ্য। নারিন্দর সিং প্রধানত ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন। তবে পাঞ্জাবী ভাষায় 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদকও ইনি। সাহাবুদ্দীন হালীর 'মোসাদ্দেস'-এর অনুবাদক। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলির বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। হরনামদাস সহরাই 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'রাইকমল'-এর অনুবাদ করেছেন—হিন্দী অনুবাদ থেকে যদিও।

'পঞ্জ-দরিয়া', 'প্রীত-লারী', 'পাঞ্জাবী-সাহেত', 'ফলওয়াড়ী' 'পাঞ্জাবী-দুনিয়া', 'প্রীতম'—জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের বাহন।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্য অনেক পিছিয়ে থাকলেও—নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস সেখানে আজ পুরোদমে চলছে। আজকের লেখকরা বিশ্বভুবনের প্রতি অন্ধদৃষ্টি নন—তার প্রমাণ চীন ও কোরিয়ার মুক্তি-সংগ্রামকে উপজীব্য করে শ'দুইয়েরও বেশি কবিতা, বহু গল্প ও নাটক রচিত হয়েছে। এসবের সাহিত্যমূল্য যাই হোক—বর্তমান পাঞ্জাবী সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এর দ্বারা বোঝা যাবে।

সিন্ধী

সিন্ধী সাহিত্যে নবজাগরণের সূচনা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। দয়ারাম গিডুমল, বুলচাঁদ কোড়ুমল, পরমানন্দ মেওয়ারাম, বুলচাঁদ দয়ারাম, কৌরোমল চন্দনমল, কালিচ বেগ মীর্জা, শামসুদ্দীন বুলবুল প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন লেখক এই নবজাগৃতির অগ্রদূত। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় মন এঁদের গড়ে উঠেছিল। ধর্মকেন্দ্রিক প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য ভেঙে সাহিত্যক্ষেত্রে মানবিক আবেগ-অনুভূতি ও আধুনিক যুক্তিবাদের আমদানি এঁরাই প্রথম করেন। এঁরা শুধু নতুন পথের পথিকৃৎ মাত্র নন, আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তিও এঁদেরই হাতে নির্মিত।

তারপর, ১৯১৪ সালে আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক লালচাঁদ জগতিয়ানী ও জেঠমল পরশ্রাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হল 'সিন্ধী সাহিত সোসাইটি'। আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। দেশের অধিকাংশ তরুণ লেখক এই সংস্থার মধ্যে এসে সমবেত হলেন। সিন্ধী সাহিত্যে, বিশেষ করে কথাসাহিত্যে, নতুন সৃষ্টির জোয়ার এল।

আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির মধ্যে সিন্ধী সবচেয়ে পুরনো ধরনের। অথচ আশ্চর্য এই, ১৯২১ সাল পর্যন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক সিন্ধী ভাষা ও সাহিত্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন। বিশিষ্ট সিন্ধী শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক ডাঃ এইচ এম গুরবক্সানীর *The Hitherto Published Literature in the Sindhi Language* প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। সঙ্গে সঙ্গে পট-পরিবর্তন—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক সিন্ধী ভাষাকে তাঁদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করে নিলেন। এর ফলে সিন্ধুর সাহিত্যিক গোষ্ঠীও নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। শুরু হল আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়।

অবশ্য ভারত সরকার আজো সিন্ধীকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অন্যতম হিশেবে স্বীকার করেননি!

কোন কোন সমালোচকের মতে, আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের জন্মকাল ১৯২১ সাল। অর্থাৎ তাঁদের মতানুযায়ী আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের বয়েস দাঁড়ায় বছর বত্রিশেক মাত্র। এই বত্রিশ বছরও কিন্তু একটানা অগ্রগতির ইতিহাস নয়। দাঙ্গা ও দেশবিভাগ সিন্ধুর সমাজজীবনে যেমন প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে, সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা দেয় তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সেই দুর্যোগের দিনেও আশ্চর্য সংযম ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন সিন্ধুর হিন্দু মুসলমান লেখকগণ। মৃত্যু-ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের জেহাদী জিগিরের মধ্যেও তাঁরা সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির মহান আদর্শকে অব্যাহত রেখেছিলেন। এ ব্যতিক্রম সারা ভারতে বিরলদৃষ্টান্ত। জাতির শিক্ষক সাহিত্যিকদের এই অনুপম আদর্শনিষ্ঠার ফলেই এত বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও স্বল্পসময়ে আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি তা সত্যিই অসাধারণ।

কাব্যসাহিত্য

গত যুগের সিন্ধী কবিতা ছিল সুফীবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তারই জের চলেছে। কাব্যসাহিত্যে আধুনিক ধ্যানধারণার প্রকাশ দেখা যায় তৃতীয় দশকের শুরুতে। তবে আধুনিক কবিদের পূর্বসূরী হিসেবে কালিচ বেগ মীর্জার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

মীর্জা সাহেব উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর লেখক। সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে ইনি ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী, সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। পরবর্তী যুগে প্রধানত নাট্যকার হিশেবে খ্যাতিমান হলেও, কাব্যসাহিত্যেও দান এঁর নগণ্য নয়। 'জিনাত' ও 'দিল আরাম' নামে দু'টি মৌলিক উপন্যাস এবং উর্দু ও সংস্কৃত থেকে অনূদিত কয়েকটি গ্রন্থও এঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

সুফীবাদের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে মীর্জা সাহেব পারেন নি। তবে, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের আবহ ভেঙে তিনিই প্রথম সিন্ধী কবিতায় নতুন সুর ও স্বাদ আনেন। ভগবৎভক্তির বদলে কাব্যলক্ষ্মীর আসনে ইনি অধিষ্ঠিত করেন প্রেম ও সৌন্দর্যকে। এঁর 'সৌদাই খাম', 'চন্দন হার', 'মতিয়ুন-জি-

দবলি', 'অমূলহ্ মাণিক' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের সমাদর অতিআধুনিক পাঠকদের কাছে তেমন না থাকলেও, এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

১৯২০ সালের পর থেকেই সিন্ধী কবিতা এক নতুন পথে মোড় নেয়। ভারতীয় রাজনীতির প্রভাবে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিরা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। ফলে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ ও উনিশ-শতকীয় রোমান্টিসিজ্‌মের পরিবর্তে কাব্যসাহিত্য আধুনিক মতাদর্শের জয়গানে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় আঙ্গিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা।

কিসিনচাঁদ 'বেওয়াস', লেখরাজ 'আজিজ', হায়দর, বক্স জাতই, হুণ্ডরাজ 'তুখায়াল,' আকবর আলী আঈজ ও হরি 'দিল্গীর'—এ যুগের শক্তিমান কবিদের অগ্রণীস্থানীয়। পরলোকগত কিসিনচাঁদ ছিলেন জনগণের কবি, দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক। প্রকাশভঙ্গির সারল্যে ও আন্তরিকতায় অতি সহজেই ইনি পাঠকসাধারণের আত্মীয় হয়ে ওঠেন। 'গরীবোঁ-ঝি-ঝুপরি' ('দরিদ্রের কুটির') ও 'লার্ক (অশ্রু)-এ দরিদ্র জনসাধারণের ব্যথা-বেদনাকেই ইনি একান্ত করে তুলে ধরেছেন। এঁরই সমশ্রেণীর কবি হায়দর বক্স জাতই। শুধু কবি নন, কিসান নেতা হিশেবেও ইনি সুপরিচিত, কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত। কবিতার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করলেও কাব্যের চেয়ে মতবাদকে জাতই বড় মর্যাদা দেননি। তাই, শ্রেষ্ঠতম যদি নাও হন তবু অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিন্ধী কবি হিশেবে ইনি আজ সর্বমহল কর্তৃক স্বীকৃত। সিন্ধুনদকে উদ্দেশ করে লেখা এঁর 'দরিয়া শাহ্' এক অতুলনীয় কবিকীর্তি। কল্পনার বিশালতায়, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতায় ও অভিনব উপমা-চিত্রকল্পের সার্থক ও সুসমঞ্জস প্রয়োগে এটি ছোটখাট এক মহাকাব্য বিশেষ। ব্যংগাত্মক কবিতায়ও যে জাতই কুশলী, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে আক্রমণ করে লিখিত এঁর 'শিকওয়া' তার উদাহরণ।

জনপ্রিয়তায় জাতই সর্বাগ্রগণ্য হলেও অনেকের মতে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি লেখরাজ আজিজ। বহুপঠিত পণ্ডিত, তাই এঁর কবিতায় বৈদগ্ধ্যের ছাপ স্পষ্ট। ভাবের চেয়ে কাব্যশরীরের পরিমার্জনায় ইনি অধিকতর মনোযোগী। সনেট থেকে এপিক—সব রকমের কবিতাই ইনি লিখছেন। তবে, সময়ে-সময়ে আঙ্গিকের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের দরুন এবং আরবী-ফার্সী শব্দাবলীর অবাধ ব্যবহারের ফলে সাধারণ পাঠক এঁর কবিতার

রসগ্রহণে বঞ্চিত হন। শিক্ষিত মহলেই এঁর সমাদর সমধিক। অবশ্য আজিজের 'শাইরাণী শামা' ('কবির প্রদীপ') ও 'পাছতাউ-ঝা-লার্ক' ('অনুশোচনার অশ্রু') সম্পর্কে এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এই বই দু'টি অনায়াসে স্থান পেতে পারে। হুণ্ডরাজ কৃষকশ্রেণীর কবি। কৃষকজীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ইনি কাব্যায়িত করেছেন। একটি বিষণ্ণ-করুণ সুর এঁর কবিতাকে আশ্চর্য সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছে। আকবর আলী আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ লীরিক কবি। প্রথমে ছিলেন প্রেমের পূজারী, পরে হন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা। হরি দিল্লীর ছোটদের জন্যে কবিতা লিখে বিখ্যাত।

আধুনিক সিন্ধী কবিতা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল—ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের মত এখানে পাঠকসাধারণের সঙ্গে আধুনিক কবিদের একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠেনি। (শুধু কবিতা নয়, আধুনিক সিন্ধী কথাসাহিত্য সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য)। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা আধুনিক সিন্ধী লেখকরা প্রভাবিত হয়েছেন সত্যি, কিন্তু সে-প্রভাব তাঁদের আত্মোপলব্ধিতে ও আত্মবিকাশে সাহায্য করেছে মাত্র—তার বেশি নয়। কবিবন্ধু বা কাল্পনিক ভাবী পাঠকদের মুখ চেয়ে আধুনিক সিন্ধী কবিরা কবিতা রচনায় ব্রতী নন। দেশের মাটির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নিবিড়, পরিচয় অন্তরঙ্গ। উন্নাসিক সমালোচকবর্গ অবশ্য এর পরিণাম হিশেবে আঙ্গিকের গতানুগতিকতা ও প্রকাশ-ভঙ্গির সারল্য-করণ প্রবণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেন। এবং এও বলতে পারেন যে, আধুনিক সিন্ধী কবিতা পড়ে আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতা পাঠের স্বাদ পাওয়া যায় না!

কথাসাহিত্য

আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস লেখেন কালিচ বেগ মীর্জা ও কৌরোমল চন্দনমল। কিন্তু বিষয়বস্তুর চেয়ে রচনাশৈলীর দিকেই এঁদের, বিশেষ করে কৌরোমলের ঝোঁক ছিল বেশি। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'লীলাবতী'র নাম করা যেতে পারে। রচনাশৈলীর কারুকর্ম আশ্চর্য রকম উন্নত, কিন্তু ঘটনাবলী অবাস্তব, চরিত্র সৃষ্টি অস্বাভাবিক। ফলে মৌলিক উপন্যাসের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের অনুবাদই এ-সময়ে অধিক জনসমাদর লাভ করে।

প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস দেওয়ান প্রীতমদাসের 'আজিব ভেট' সিন্ধুর হিন্দু মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় রচিত। প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ভেরুমল মহিরচাঁদ। তারপরই নাম উল্লেখযোগ্য লালচাঁদ জগতিয়ানীর। ভেরুমল তাঁর 'মোহিনী বাঈ'-এর মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক হিন্দু পরিবারের গার্হস্থ্য-জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। 'মোহিনী বাঈ'-ই প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস। লালচাঁদের 'চথ-ঝো-চাঁদ' (পূর্ণ চাঁদ) সিন্ধী কথাসাহিত্যে এক অসমসাহসিক প্রচেষ্টা হিশেবে পরিগণিত। মূলত সামাজিক উপন্যাস হলেও দুটি তরুণের প্রেমই উপজীব্য এই উপন্যাসের। মনে হয়, লালচাঁদ এ-ব্যাপারে প্রেরণা পেয়েছিলেন অস্কার ওয়াইল্ডের কাছ থেকে। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল।

সিন্ধুর প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক শ্রীমতী গুলি সদারঙ্গনী। প্রথম, কিন্তু আজো অনন্যা। হিন্দু পরিবারের মেয়ে হয়েও চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে ইনি পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত। একটি হিন্দু তরুণী ও এক মুসলিম তরুণের পূর্বরাগ, প্রেম ও পরিণয় এঁর 'ইতহাদ'-এর (মিলন) কাহিনী। বলা বাহুল্য, এজন্যে লেখিকাকে রক্ষণশীল সমালোচকবর্গের প্রবল সমালোচনা ও কটূক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র সার্থক অনুবাদিকা হিশেবেও শ্রীমতীর নাম উল্লেখযোগ্য।

রাম পানজোয়ানী, নারায়ণ ভামভানী, সেবক ভোজরাজ ও আস্‌সানন্দ মামতোরা একালের অন্যান্য খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক। সেবক ভোজরাজের 'আশীর্বাদ' ও 'দাদা শ্যাম' জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। মামতোরার 'শাহ্-ইর' (কবি) আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

অতিআধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গোবিন্দ 'মালহী'। গোবিন্দ মালহী তাঁর উপন্যাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীকেই প্রধান স্থান দিয়ে থাকেন। দেশবিভাগের পর বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এঁর 'জীবনসাথী' ও 'জিন্দেগী-ঝে-রাহ্-তে' (জীবনের পথে) উল্লেখযোগ্য দুটি উপন্যাস। পানজোয়ানীর 'লতিফা' ও ভামভানীর 'গরীবোঁ-ঝো-ভার্সো' (দরিদ্রের উত্তরাধিকার) মুসলিম কিসান জীবনের বাস্তব চিত্র। এক সঙ্গীতশিল্পীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রেমের মনোরম বর্ণনা ও বিশ্লেষণে

পানজোয়ানীর 'কয়েদী'র নাম সবিশেষ স্মরণীয়। জনৈক শিক্ষিতা বিধবার প্রেম, মানসিক দ্বন্দ্ব ও পুনর্বিবাহের পটভূমিকায় লিখিত ভামভানীর 'বিধোয়া' এ-যুগের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে লালচাঁদ, নির্মলদাস ফতেচাঁদ, জেঠমল, মীর্জা নাদির বেগ, আসসানন্দ মামতোরা, অমরলাল হিঙ্গোরানী এবং ও এইচ আনসারী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক—সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক সিন্ধী লেখকদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যক্ষভাবে কেউ সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও সমাজহিতের প্রেরণায় সকলেই উদ্বুদ্ধ। তাই কাহিনীর আঙ্গিকগত চমক সৃষ্টির চেয়ে তার যথাযথ রূপায়ণের দিকেই লেখকরা নজর দিয়েছেন বেশি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম আনসারী। আনসারীর গল্পের আবেদন মনে নয়, মস্তিষ্কে। ঘটনাকে ইনি প্রাধান্য দেন না, পাঠকের চিন্তাশীলতাকে উদ্দীপিত করাই এঁর লক্ষ্য।

অতিআধুনিক লেখকদের মধ্যে সুন্দরী উত্তমচাঁদ, আনন্দ গোলানী, গোবিন্দ পাঞ্জাবী, কিরাত বাবানী, মোতি প্রকাশ, তারা মীরচন্দানী ও দাস তালিব অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। বোম্বাইয়ের সিন্ধী সাহিত মণ্ডলের সদস্য এঁরা।

মীর্জা কালিচ বেগ প্রথম যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী নাট্যকার। এঁর 'হাসানা দিলদার', 'শাহ ইলিয়া', 'আজিজ-আঁই-শরিফ' ইত্যাদি নাটক একদা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। এগুলি কিন্তু মৌলিক নাটক নয়, শেকস্‌পীয়রের বিভিন্ন নাটকের ভাবানুবাদ মাত্র। তবু, নতুন পরিবেশে চরিত্র-সৃষ্টি ও সংলাপ-রচনায় মীর্জা সাহেব যে কৃতিত্ব দেখান নিঃসন্দেহে তা তারিফযোগ্য। সে-সময় পৌরাণিক নাটক রচনায় খ্যাতিমান হয়েছিলেন দেওয়ান লীলারাম সিং।

আধুনিক সিন্ধী নাটকের জনক কে এস দরিয়ানী। ইবসেনের 'পিলার্স অব সোসাইটি' অবলম্বনে লিখিত এঁর 'মুলকা-ঝা-মুদাবর' ও মেতরলিঙ্কের 'মান্না ভান্না'র অনুকরণে রচিত 'দেশা সাডকে'-র অভিনয় একদা তুমুল আলোড়নের সঞ্চার করেছিল। মৌলিক নাটক রচনাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত— 'জামানেঝি-লহর' (সময়ের স্রোত) ও 'বুখা-ঝো-শিকার' (বুভুক্ষার শিকার) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজ-সংস্কারই নাটক দুটির উদ্দেশ্য হলেও শিল্পসৃষ্টি হিশেবেও এগুলির মূল্য নেহাৎ কম নয়। লালচাঁদ জগতিয়ানীর দেশপ্রেমমূলক লোকনাটক 'উম্‌র মারভি' নাট্যসাহিত্য এক নতুন পথের সূচনা করে।

দরিয়ানীর সমসাময়িকদের মধ্যে এম ইউ মালকানী, আহমদ চাগলা, লেখরাজ আজিজ ও মোহাম্মদ ইসলাম উরসানী নাটক রচনায়, বিশেষ করে তার আঙ্গিকগত উৎকর্ষ বিধানে, যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একাঙ্ক নাটিকায় মামতোরা ও মালকানীর নাম উল্লেখযোগ্য। মঞ্চসাফল্য অর্জন করতে না পারলেও এঁদের একাঙ্কিকাগুলি আধুনিক নাট্যসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।

অন্যান্য

কাব্যসাহিত্যের তুলনায় কথাসাহিত্য সমৃদ্ধ। সমাজের আলো-অন্ধকার সকল দিক ও সর্বশ্রেণীর নরনারীর সাক্ষাৎ আধুনিক সিন্ধী কথাসাহিত্যে পাওয়া যাবে। গতিবিধি এর বহুমুখী, দৃষ্টিভঙ্গিও বিভিন্ন। কথাসাহিত্যের তুলনায় সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সমৃদ্ধি কিন্তু তেমন নয়। রচনার পরিমাণে অপ্রতুলতা নেই—তবে গুণগত বিচারে তা বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি।

পরমানন্দ মেওয়ারাম প্রথম যুগের এক শক্তিশালী প্রাবন্ধিক—ধর্মে খৃশ্চান, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন ভাবধারার প্রচারে ইনি ব্রতী হন এবং নিজের আদর্শ প্রচারের বাহন হিশেবে 'জোতে' ('আলো') নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বার করেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনা করে যান। আধুনিক সাহিত্যে নিজস্ব একটি গদ্যরীতির স্রষ্টা হিশেবে নাম এঁর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'গুল ফুল' (পুষ্পস্তবক) এঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সংকলন।

সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে দেওয়ান ওয়াধুমলের 'পানগাটি 'ইনকিলাব' (সামাজিক বিপ্লব), লেখরাজ আজিজের 'আদাবি আইনো' (সাহিত্য-দর্পণ), তীর্থ বসন্তের 'চিঙ্গুন' (স্ফুলিঙ্গ) এবং পানজোয়ানী ও ভামভানীর মিলিত গ্রন্থ 'আদাবি গুনচো-র' (সাহিত্য-সংকলন) নাম করা যায়। হাস্যরসাত্মক রচনায় এন আর মালকানী সর্বাগ্রগণ্য। হাকিম ফতে মোহাম্মদ, দীন মোহাম্মদ ওয়াফাই, মোহাম্মদ সিদ্দিক মেমন ও মোহাম্মদ সিদ্দিক মুসাফির ইসলাম ও ঐসলামিক সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। শাহ্, সামী ও সাচাল—প্রাচীন তিন সিন্ধী

কবি। এঁদের জীবনী ও কবিকীর্তিকে অবলম্বন করে রচিত লালচাঁদ, জেঠমল, ডাঃ গুরবক্সানী, আগা গোলাম নবী ও ডাঃ ইউ এম দাউদপোটার কয়েকটি গ্রন্থ ছাড়া সমালোচনা সাহিত্য বলতে আজো তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রাচীন সাধুসন্তদের জীবনী অবিশ্যি অনেকগুলি রয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের মর্যাদা তাতে আরোপ করা যায় না। আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি নেই বললেই চলে। অনূদিত পুস্তকের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

কাশ্মীরী

ভারতে ইরাণীয়-প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কাশ্মীরী প্রধান। প্রাচীনতম কাশ্মীরী সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা হল শৈবতন্ত্রাচার্যা লল্লার লেখা কয়েকটি কবিতা। শৈবতন্ত্রাচার্যা লল্লা চতুর্দশ শতাব্দীর কবি। তার আগেও কাশ্মীরীতে সাহিত্য রচিত হত, কিন্তু তার নমুনা অপ্রাপ্য।

আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের সমৃদ্ধি মোটেই আশানুরূপ নয়। এমন-কি, আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্য নামে কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা, কোন কোন মহল সে-সম্পর্কেও সন্দিহান। এটা অবিশ্যি উন্নাসিকতার নামান্তর। আধুনিকতা সম্বন্ধে একটা অন্ধ অপরিবর্তনীয় ধারনাই এই মনোভাবের হেতু।

আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের যথোচিত বিকাশ ঘটেনি প্রধানত দুটি কারণে। এক: কাশ্মীরের সামাজিক পরিবেশ। এই সেদিনও কাশ্মীর সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের জোয়ালে আবদ্ধ ছিল। বাইরে থেকে ভ্রমণবিলাসীরা এসেছেন কাশ্মীরের নিসর্গশোভা উপভোগের আশায়, রাজ্যের সামন্তপ্রভুরা বিদেশে গিয়েছেন জীবনানন্দ আস্বাদের লালসায়—জনসাধারণ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত থেকেছে বরাবর। চরম দারিদ্র্য আর অশিক্ষার মধ্যে দিন কেটেছে ভূস্বর্গের মানুষগুলির। দ্বিতীয় কারণ: নির্দিষ্ট অক্ষরলিপির অভাব। কাশ্মীরী ভাষা আছে, কিন্তু কাশ্মীরী লিপি বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। আগে কাশ্মীরী ভাষা লেখা হত ব্রাহ্মী-থেকে-উদ্ভূত শারদা লিপিতে, এখন হয় উর্দুতে। কিন্তু উর্দু লিপিকে আশ্রয় করে একদা কাশ্মীরী সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও আধুনিককালে নিজস্ব লিপির অভাব সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এক মস্তবড় অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। তাই কিছুদিন আগেও কাশ্মীরী ভাষায় কোন সাহিত্যপত্র ছিল না। আজও কাশ্মীরী গদ্যসাহিত্য বলতে উল্লেখযোগ্য কিছুই সৃষ্টি হয়নি।

জাতিগতভাবে কাশ্মীরকে মূলত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়: জম্মু, কাশ্মীর-উপত্যকা, লাদাখ। জম্মু হিন্দুপ্রধান (ডোগরা) এলাকা, এখানকার ভাষা ডোগরী। কাশ্মীর-উপত্যকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভাষা কাশ্মীরী।

লাদাখে মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রায় সমানসংখ্যক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তিব্বতীদের সঙ্গেই লাদাখবাসীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম। এছাড়া কাশ্মীরে আরও অনেকগুলি উপজাতি রয়েছে। ফলে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে (জম্মু লাদাখ সমেত) প্রায় বারো-তেরটি ভাষা প্রচলিত—কষ্টবাড়ী, পোগুলী, সিরাজী, রামবনী ইত্যাদি। 'নয়া কাশ্মীর' কর্মসূচিতে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়েছে। এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরী, ডোগরী, বাল্তী, দর্দী, পাঞ্জাবী, হিন্দী ও উর্দু—এই কটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিশেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

জনসংখ্যার দিক দিয়ে কাশ্মীরীভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্থানীয় ভাষাগুলির মধ্যে কাশ্মীরীই সমৃদ্ধতম। বর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে উর্দুকে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সরকারি ভাষা হিশেবে গ্রহণ করা হলেও, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরী ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কাশ্মীরী ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিবিধানে সরকারি তৎপরতাও স্পষ্ট।

আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্য মানে শুধুই কবিতা। উপন্যাস একবারেই নেই। রোশন, নাদিম, হারুন ও মজবুর অবশ্য কিছুসংখ্যক গল্প ও নাটক লিখেছেন, কিন্তু সার্থক কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত সেগুলিকে করা যায় না।

আধুনিক কবিতা বলতে পূর্ব-সংস্কারের বশে আমরা যা বুঝি, আধুনিক কাশ্মীরী কাব্যসাহিত্যে তার নিদর্শন মিলবে না। চমকপ্রদ ও অভিনব চিত্রকল্প বা উপমা, একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগানুভূতি, কিম্বা আঙ্গিকগত দুরূহ-দুরূহতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে কাশ্মীরী কবিদের ঝোঁক একদম নেই। কারণ, আধুনিক বিদেশি কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের অকিঞ্চিৎকর। তারচেয়ে বড় কারণ—যে-সামাজিক পরিবেশ কবিমানসে জটিলতার সৃষ্টি করে, যন্ত্রশিল্পের প্রসারের অভাবে কাশ্মীরে তা অনুপস্থিত।

কিন্তু, এহো বাহ্য। আসলে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম—সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের সংগ্রামই কাশ্মীরে নবজাগৃতির পটভূমি নির্মাণ করেছে। এই নবজাগৃতির ফসল আধুনিক কবিতা, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের চারণ আধুনিক কবিরা।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাচীন কাশ্মীরী কবিতার যে নমুনা পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। তৃতীয় দশক পর্যন্ত কাশ্মীরী কবিরা সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করে এসেছেন। কিন্তু ততদিনে সে-ঐতিহ্যের প্রাণধারা বিশুষ্ক। নারীসুরা-ফুলবাগিচা নিয়ে কবিরা আগের মতোই গজল রচনা করেছেন সত্যি, কিন্তু এ-গজল যেন হৃতযৌবনা নর্তকী। সাধারণ অশিক্ষিতজনের কাছে ধর্মীয় কবিতার বিশেষ একটা আবেদন থাকলেও এযুগের রহস্যবাদী কবিরা জনমনে তেমন সাড়া জাগাতে পারেননি। ঐতিহ্য অনুসরণের নামে তাঁরা শুধু অতীতের অনুকরণই করে গিয়েছেন। দাগা বুলিয়েছেন পুরনো লেখায়।

১৯৩১ সালে কাশ্মীরের কিসান জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু। এই সময়কার কবি মজহুর আধুনিক কাশ্মীরী কবিতার স্রষ্টা। নবজাগ্রত জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে ইনিই প্রথম কবিতার মাধ্যমে মূর্ত করে তোলেন। পুরনো বোতলে নতুন পানীয় পরিবেশনের মত প্রচলিত গজলের কাঠামোকেই ইনি গ্রহণ করেন।

কাশ্মীরের প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি মজহুর। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ আপোষকামী নয়, জঙ্গী জাতীয়তাবাদ। গণ-আন্দোলন যেমন ক্রমে ক্রমে জোরদার হয়ে উঠেছে, মজহুরের কবিতার সুরও তেমনি চড়েছে পর্দায় পর্দায়। মজহুর আজ লোকান্তরিত।

মজহুরের দুই সমসাময়িক কবি আজাদ ও মাস্টারজী। মাস্টারজী প্রথমদিকে রহস্যবাদী কবি হিশেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আর এই রহস্যবাদী কবিই কিনা শেষপর্যন্ত এমন-এক পৃথিবীর বন্দনা গাইলেন—

> যেখানে কেউ শোষিত নয়, কেউ ব্যথিত নয় ;
> যেখানে উন্মাদ নেই, আহাম্মক নেই ;
> মানুষ যেখানে খিদের জ্বালায় জ্বলে না ;
> যেখানে কোন দুশ্চিন্তা নেই,
> নেই ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা।……

আজাদের ‘নদী’তে তাঁর কবিমনের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রভাবে প্রতিফলিত :

> আমার দুর্বার গতিবেগে
> পাহাড়ের হৃৎস্পন্দন জাগে,

পাথরে পাথরে
নতুন দিনের দামামা বাজাই আমি।
কিন্তু
যখনই তাকাই চড়াই আর উৎরাইয়ের দিকে,
চোখে পড়ে
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধের প্রাকার—
আর
অসাম্যের খান্‌-খন্দ,
মন আমার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
আমি চাই সব এক করে মিলিয়ে দিতে,
সব একাকার করে দিতে।

আজাদ ও মাস্টারজী দুজনেই সমস্তরকম শোষণ-নির্যাতনের বিরোধী, শ্রেণীহীন সমাজের উদ্‌গাতা। তবে, এঁদের কাব্যাদর্শ—আশাবাদ—রোমান্টিকতার কুয়াশামুক্ত নয়।

এর পরের যুগের কবিরা জনগণের আরও কাছাকাছি নেমে এলেন। শুধু নতুন পৃথিবীর আগমনী তাঁরা গাইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনগণের দৈনন্দিন জীবনের বেদনাবিষণ্ণ বাস্তব চিত্রও তুলে ধরলেন। এই তরুণ কবিদের মধ্যে ফণি, আসি, প্রেমি ও আরিফের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক নববিবাহিতা বধূকে কেন্দ্র করে লেখা আরিফের দীর্ঘ কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে পড়ে: নিদারুণ দারিদ্র্যে এক কুমারীর আবাল্যের স্বপ্নসাধ কি ভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, নিছক জীবিকার তাড়নায় তাকে গিয়ে কারখানায় কাজ নিতে হচ্ছে—তারই মর্মন্তুদ কাহিনী। স্বামীকে নিয়ে নিরিবিলি নীড় রচনার অবসর কই, সময় কই দুদণ্ডের জন্যে হলেও প্রিয়ের বাহুবন্ধনে সব ভুলে নিজেকে সঁপে দেবার—দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে হবে সকলের আগে! একটি মেয়ের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীরের নারীজীবনের ট্রাজেডির এ এক আশ্চর্য শিল্পায়ন।

সাহিত্যের সঙ্গে জনগণের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে তোলার জন্যে কবিরা এ-সময় লোককাব্যের পুনরুজ্জীবনের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। গজলের ক্ষেত্রে একদা মজহুর যা করেছিলেন, লোককাব্যের পুনরুজ্জীবনে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন নাদিম, প্রেমি, রোশন। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে

কেন্দ্র করে রোশন অনেকগুলি সুন্দর কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতা নিছক প্রকৃতিপ্রেমের বর্ণনায় পর্যবসিত নয়, প্রকৃতিলালিত মানুষগুলির জীবন-চিত্রও ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গে। দুটি চিত্রই বাস্তব—কিন্তু কী বৈসাদৃশ্য! এঁদের রচিত নতুন ফসলকাটার গান, ঘুমপাড়ানী গান ও বিভিন্ন লোকনৃত্য-নাট্যগুলি আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের সম্পদ।

আগেই বলেছি, কাশ্মীরের রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে নতুন সাহিত্য আন্দোলন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মসূচিকে—যথা, কৃষি-সংস্কার, জাতীয় পুনর্গঠন, সামাজিক ও সরকারি দুর্নীতির বিলোপ, সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ ইত্যাদি—আধুনিক কবিরাই জনপ্রিয় করেছেন, তাকে কার্যকর করার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই আধুনিক কাশ্মীরী কবিতা মানেই কম-বেশি রাজনৈতিক কবিতা। অবশ্য এ-রাজনীতি বক্তৃতামঞ্চ বা ড্রইংরুমের রাজনীতি নয়, কাশ্মীরীদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী এর সঙ্গে। আধুনিক কাশ্মীরী কবিরা কিসানের জীবনের শরিক, কর্মে ও কথায় তাঁরা তাদের সত্য আত্মীয়তা অর্জন করেছেন।

বিশেষ করে, গত কয়েক বছরে কাশ্মীর-রাজনীতি এক জটিলতর রূপ ধারন করেছে, ১৯৪৭ সালে হানাদারদের আক্রমণের মধ্যে দিয়ে এর শুরু। আজ কাশ্মীর বিশ্বরাজনীতির অন্যতম ক্রীড়াক্ষেত্র। রাজনীতি ছাড়া কাশ্মীরী জনগণ আজ তাই অন্য-কিছু ভাবতেও পারে না। আর, জনগণকে ছেড়ে কবিই কি বাঁচতে পারেন!

হানাদারদের অতর্কিত আক্রমণে প্রথমটা কাশ্মীরীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সত্যি, কিন্তু ভারতীয় ফৌজ না পৌছনো পর্যন্ত ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে তারা অপূর্ব এক জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। সে-দুর্দিনে কবিরাও পিছিয়ে থাকেননি। একদিকে বহিরাগত হানাদার বাহিনী, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে কাশ্মীরের কবিকণ্ঠ সেদিন দুর্বার সংগ্রামের শপথ ঘোষণা করে:

আমাকে লড়তে হবে
সীমান্ত থেকে সীমান্তে, প্রতিটি রণাঙ্গনে,

পথে-প্রান্তরে, মাটিতে-আকাশে
আমাকে লড়তে হবে।
জাতির সৈনিক আমি—
আমার দেশকে বাঁচাবোই আমি।
আমি এক নওজোয়ান!
আমি এক নওজোয়ান!!

কবিতাটি নাদিমের। সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাদিম।

গোড়া থেকেই ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে দুর্বলতা ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের কোলে 'শের-ই-কাশ্মীর'-এর আত্মসমর্পণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কবিরা এই দুর্বলতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার বরাবর। বারবার তাঁরা জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করেও দিয়েছেন। এক শহীদ-জননীকে নিয়ে লেখা রোশনের কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ দেশের জন্যে সন্তান প্রাণ দিয়েছে। সন্তানের কথা ভাবলে মার বুক ফেটে যায়, তবু তাঁর আপসোস নেই—ছেলে যে তাঁর শহীদ হয়েছে! চিরদিনের জন্যে হাজার হাজার মায়ের দুঃখ ঘোচাতে ছেলে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই তার সান্ত্বনা। কিন্তু মা যখন দ্যাখেন, যতসব ভণ্ড দেশপ্রেমিকের দল ভীড় করে এসেছে তাঁর শহীদ সন্তানের পবিত্র সমাধির ওপর পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করতে, দুর্জয় ক্রোধে তিনি ফেটে পড়েন। সন্তানের লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে ধ্বনিত হয়ে ওঠে মাতৃহৃদয়ের তীব্র ফরিয়াদ—তুই দ্যাখ বাছা, তুই-ই দ্যাখ! আজাদীর জন্যে তুই জান দিলি, আর এই বিশ্বাসঘাতকরা আজাদীর সেই লড়াইকে বানচাল করে দিয়েছে। নিজেরা দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছে, আজ এসেছে ফুল নিয়ে!

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে কাশ্মীরের কবিরা সদাজাগ্রত। কাশ্মীরকে যুদ্ধঘাঁটি বানাতে তাঁরা দেবেন না। তাঁরা জানেন, এতদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেটুকু অধিকার জনগণ অর্জন করেছে, যত সামান্যই হোক, আপাতত তার মূল্যও বড় কম নয়। কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রাম শেষ হয়নি, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একবার যদি কাশ্মীর সাম্রাজ্য-বাদীদের যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত হয়, তাহলে সবকিছু যাবে বানচাল হয়ে। আবার ফিরে আসবে ডোগরা-শাসনের সেই অন্ধকার দিনগুলি।

তাই শান্তি-আন্দোলন বর্তমানে কাশ্মীরী রাজনীতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। যে সুখী স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন কাশ্মীরীরা চিরকাল দেখে এসেছে, যার জন্যে রক্ত ঢেলেছে, প্রাণ দিয়েছে, হাজারো নির্যাতন সয়েছে—সেই স্বপ্নসম্ভব নতুন দিনের দ্বারদেশে আজ উপনীত তারা। গত দুবছরের কাশ্মীরী কবিতা প্রধানত শান্তির কবিতা। এ-শান্তি সংগ্রামপলাতক কাপুরুষের শান্তিভিক্ষা নয়—যুদ্ধবাদীদের প্রতি জাগ্রত জনতার বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ। জনতার এই চ্যালেঞ্জকে ভাষা দিয়েছেন নাদিম, রোশন, রাহী।

রাহীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও বর্তমান কাশ্মীরের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা 'কাটি রয ইয়া গট্ যল্ ত্রাৎ তুফান'ঃ

ঘরে ঘরে আজ জাগছে কিসান
বজ্র-বিদ্যুত্যের পৌরুষ নিয়ে জেগে উঠছে,
ছিঁড়ে ফেলেছে দাসত্বের শৃঙ্খল,
সামন্তপ্রভুদের হৃদয় গুঁড়িয়ে দিয়ে
ছিনিয়ে নিচ্ছে নিজেদের জমিজিরাত,
শক্তি ও যৌবনের গর্বে তারা গর্বিত।......
এসো, কান পেতে শোনো
কী সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হচ্ছে মেহনতী জনতার বুকে।......
কারখানার সমস্ত শ্রমিকসাথীরা যখন
এক সুরে কথা কইবে
রাজপ্রাসাদে নেমে আসবে করাল অন্ধকার।
এসো, কাঁধে কাঁধ মেলাই,
এসো, একজোট হয়ে দাঁড়াই—
নতুন দিনের আলো হোক আমাদের শিরস্ত্রাণ।
এসো, ন্যায় ও সত্যের হাওয়ায়
নিশ্বাস নেই বুক ভরে,
এসো, এই অত্যাচারের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে
আগামী প্রত্যূষকে সাজাবার জন্যে
তৈরী করি এক নতুন অলঙ্কার।......

আধুনিক কাশ্মীরী কবিতা বড়-বেশি প্রচারধর্মী ?—তা বটে !!

গুজরাতী

আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের বয়েস মোটামুটি একশ বছর। একে আবার তিনটি যুগে ভাগ করা যায়: অভ্যুদয়, পুনরুজ্জীবন ও গান্ধীযুগ। রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীযুগের সমাপ্তিও আজ চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে।

প্রথম যুগের সূচনাকাল ১৮৫০ সাল। কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই এর প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাবে গুজরাতের সমাজমানসে যে-পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সেটা পূর্ণতা লাভ করে। আধুনিক ধ্যানধারনাকে মূলমন্ত্র করে গড়ে ওঠে 'গুজরাট ভার্নাকুলার সোসাইটি', 'বুদ্ধিবর্ধক সভা', 'জ্ঞান প্রচারক সভা' ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ-সময়কার সাহিত্য মূলত সংস্কারবাদী সাহিত্য। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক মানসিকতার কিছু-কিছু অনুশীলন চোখে পড়লেও— ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারই ছিল এ-যুগের লেখকদের অনন্য আদর্শ। এঁরা যত বড়-না সাহিত্যিক তার চেয়েও বড় সাহিত্যকর্মী।

অভ্যুদয়ের যুগের দুই মহারথী—নর্মদাশঙ্কর ও দলপৎরাম। অন্যান্য কৃতি লেখক—নবলরাম, মহিপৎরাম, মনসুখরাম, নন্দশঙ্কর, ভোলানাথ সারাভাই ও হরগোবিন্দদাস। প্রধানত সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও সাহিত্যে নবযুগের ভিত্তি নির্মাণ এঁরাই করেন।

কয়েকজন পার্শী লেখকও এ-সময় গুজরাতী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তবে পরবর্তীযুগের পার্শী লেখকরা গড়ে তোলেন পার্শী-গুজরাতী নামে নতুন একটি ভাষা।

১৮৮০ সালে, কারো কারো মতে ১৮৮৫ সালে, প্রথম যুগের অবসান ঘটে। উগ্র পাশ্চাত্যপ্রিয়তার ঝোঁকটা কেটে যাওয়ার ফলে এবং সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচারের দরুন এযুগের লেখকরা স্থিতধী হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে অতীতের প্রতি অনেকখানি মোহগ্রস্তও। তবে, সকলেই এঁরা কম-বেশি সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনবাদী হলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রগতি-বিরোধীর ভূমিকায় কেউই

বড় অবতীর্ণ হন নি। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অবাধ অনুশীলন এ-যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। গোর্ধনরাম ত্রিপাঠী, নরসিংরাও দিবেতিয়া, মনিলাল দ্বিবেদী, রমণভাই নীলকণ্ঠ, বলবন্তরায় ঠাকোর, নানালাল, 'কলাপী' 'কান্ত', আচার্য আনন্দশঙ্কর ধ্রুব ও কে এম মুন্‌শী পুনরুজ্জীবনবাদী যুগের শক্তিমান লেখক।

১৮৮৭ সাল গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়তম বৎসর। গোবর্ধন-রামের যুগান্তকারী উপন্যাস 'সরস্বতীচন্দ্র'র প্রথম খণ্ড ও নরসিংরাওয়ের 'কুসুম-মালা' প্রকাশিত হয় এই বছর। আর, এই বছরেই এমন একটি কিশোর ম্যাট্রিক পাশ করে ও এক নবজাতক পৃথিবীতে আসে পরবর্তীযুগে যাঁরা দুই যুগন্ধর সাহিত্যিক হিশেবে পরিগণিত হন: মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও কানাইয়ালাল মুন্‌শী—গান্ধীজী ও মুন্‌শীজী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের অবসান ঘোষিত হলেও এবং দ্বিতীয় যুগের কয়েকজন লেখক বর্তমান শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত স্বধর্মনিষ্ঠ ভাবে লেখনী চালনা করলেও—গুজরাতী সাহিত্যে তৃতীয় যুগের শুরু ১৯৩০-এ। কারণ, গুজরাতের সমাজে ও সাহিত্যে গান্ধীজীর প্রভাব এই সময় থেকেই পড়তে শুরু করে।

১৯৩০-৪৫—গান্ধীযুগের বিস্তৃতি এই পনের বছর। সারা ভারতই সে-সময় গান্ধীবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল সত্যি—তবে কয়েকটি কারণে গুজরাতে এই প্রভাবটা পড়েছিল অনেক বেশি মাত্রায়। প্রথমত, গান্ধীজী তাঁর কর্মকেন্দ্র হিশেবে বেছে নেন আমেদাবাদকে—সেখানে সবরমতী আশ্রম ও গুজরাত বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। গান্ধীযুগের অধিকাংশ তরুণ লেখকই এই আশ্রম ও বিদ্যাপীঠের প্রেরণায় উদ্দীপিত। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীর অতুলনীয় গ্রন্থ আত্মজীবনীসহ তাঁর বেশির ভাগ রচনাই গুজরাতী ভাষায় লিখিত এবং প্রথমে 'নবজীবন' ও পরে 'হরিজন'-এ প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু, নিজে গান্ধীজী লেখক যদি না-ও হতেন, তবু গুজরাতের ভাবজগতে গান্ধীবাদ সেদিন যে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টির পক্ষে তার ভূমিকাও বড় কম নয়। রাজনীতিবিশারদ হলেও গান্ধীজী ছিলেন শিল্পীমনের অধিকারী। তাই তাঁর পক্ষে সমসাময়িক ভারতের হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করা সম্ভব হয়েছিল। পুনরুজ্জীবনবাদীদের অতীতপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীবাদকে সেই কারণে

এক বৈপ্লবিক মতবাদ হিশেবে অভিহিত করা যায়। গুজরাতী সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে গান্ধীবাদ। এবং এই যুগই আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। গুজরাতী সাহিত্যে এই প্রথম সাধারণ মানুষের মর্মবাণী ধ্বনিত হল—সাহিত্যের সঙ্গে জনগণের আন্তরিক যোগাযোগ গড়ে উঠল। অতীতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এই প্রথম কবি-কথাশিল্পীরা তাকালেন রূঢ়-বাস্তব বর্তমানের দিকে। আর, সেই সঙ্গে গুজরাতী ভাষাও সংস্কৃত শব্দালঙ্কারের বাহুল্য থেকে মুক্তি পেল। কাকা কালেলকর, কিশোরীলাল মশরুওয়ালা, উমাশঙ্কর জোশী, 'সুন্দরম', জভেরচন্দ্ মেঘানী, 'ধূমকেতু', পন্নালাল প্যাটেল, চুনিলাল মড়িয়া প্রমুখেরা এ-যুগের খ্যাতিমান লেখক।

এঁরা প্রত্যেকেই অবিশ্যি আক্ষরিক অর্থে গান্ধীবাদী নন। তবে গান্ধীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সকলেই।

কাব্যসাহিত্য

নর্মদাশঙ্কর আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের স্রষ্টা। শুধু সাহিত্যের স্রষ্টা নন, ভাববিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক নর্মদাশঙ্কর। বুদ্ধিবর্ধক সভার প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে তিনি যে নতুন আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন তাতে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারনার প্রশ্রয় মাত্র ছিল না, অন্ধ আনুগত্যের ওপর তিনি আসন দেন আধুনিক যুক্তিবাদকে। দেশপ্রেম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্গাতা নর্মদাশঙ্কর। গুজরাতী ভাষার প্রথম অভিধান-প্রণেতা ও বিশ্বদৃষ্টি ঐতিহাসিক হিশেবেও নাম এঁর স্মরণীয়। কাব্যক্ষেত্রেও নর্মদাশঙ্কর নতুন রীতির প্রবর্তন করেন, আত্মমুখী কবিতা গুজরাতী ভাষায় প্রথম লেখেন—'আত্মলক্ষী কাব্য'।

অভ্যুদয় যুগের আরেক মহারথী দলপৎরাম। নর্মদাশঙ্করের তুলনায় ইনি সমন্বয়বাদী। নতুনকে দলপৎরাম মুক্ত মনে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রাচীনকে শুধু প্রাচীনত্বের দোহাইয়ে বর্জন করেন নি। কাব্যক্ষেত্রে দলপৎরাম প্রচলিত আঙ্গিকের মাধ্যমে নতুন বক্তব্য পরিবেশন করেন। গুজরাতী ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাহিত্যপত্র 'বুদ্ধিপ্রকাশ'-এর সুযোগ্য সম্পাদক হিশেবেও দলপৎরামের নাম স্থায়ী হয়ে থাকবে। ভোলানাথ সারাভাই অধ্যাত্মবাদী কবি।

এ-যুগের অন্যান্য লেখকরা কাব্যক্ষেত্রে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

পরবর্তী যুগের প্রথমাংশের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি নরসিংরাও দিবেতিয়া, দ্বিতীয়াংশের নানালাল। নরসিংরাও সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ হিশেবে খ্যাতিমান হলেও মূলত ইনি কবি। এঁর 'কুসুম-মালা', 'হৃদয়বীণা' ও 'নূপুরঝঙ্কার' পরবর্তী বহু কবির প্রেরণার উৎস। বিশেষ করে,' কুসুম-মালা'। কবির উপজীব্য প্রেম ও প্রকৃতি। প্যালগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারীর' সঙ্গে কেউ কেউ বইটির তুলনা করে থাকেন। আধুনিক গুজরাতী কাব্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক নিদর্শন 'কুসুম-মালা'। বলবন্তরায় ঠাকোর সব্যসাচী লেখক—কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচক। ভাবসমৃদ্ধ কাব্য-আন্দোলনের স্রষ্টা। এবং গুজরাতীতে প্রথম সনেট-রচয়িতা। কবিতায় শ্রতিকটু ও দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দাবলী প্রয়োগ এঁর এক অ-সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

নর্মদাশঙ্করের মূলমন্ত্র ছিল 'প্রেম-শৌর্য'—আর আর্যসভ্যতার চারণ হিশেবে নানালাল কাব্যক্ষেত্র অবতীর্ণ হন 'প্রেম-ভক্তি' ছদ্মনাম নিয়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি এঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তরুণদের একাংশ এঁর প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ তাই পুনরুজ্জীবন-বাদী যুগের শেষাংশকে 'নানালাল-যুগ' নামেও অভিহিত করে থাকেন। নানালাল শুধু কবি নন, শক্তিশালী গীতিকারও। শুধু গীতিকারই নন, নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি ও অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের পুনঃপ্রয়োগে কাব্যসুষমামণ্ডিত নতুন একটি ভাষাও ইনি গড়ে তোলেন। গুজরাতী সাহিত্যে 'অপদ্যা গদ্য' অর্থাৎ ছন্দোময় গদ্যের প্রবর্তক নানালাল। 'কলাপী' (সুরসিংজী) ও 'কান্ত' (মণিশঙ্কর-ভাট)—এ-যুগের দুই বিশিষ্ট কবি। নরসিংরাওরের বৈদগ্ধ্য 'কলাপী'র ছিল না, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষাও তেমন পাননি—ইনি ছিলেন সহজাত কাব্যপ্রতিভার অধিকারী। একান্ত ব্যক্তিগত আবেগে অভিষিক্ত কলাপীর করুণ-মধুর কবিতাবলীর সংকলন 'কেকারব'-এ বায়রনীয় আমেজ অনুভূত হয়। এঁর তিরোধান ঘটে অকালে। 'কান্ত'র রচনাবলী পরিমাণে কম, সাহিত্যমূল্যে উপেক্ষনীয় নয়। এঁর 'পূর্বালাপ'-এর গীতিকবিতাগুলি আঙ্গিক ও ভাবসম্পদে অনুপম। গুজরাতী সাহিত্যে খণ্ডকাব্যের স্রষ্টা 'কান্ত'।

উমাশঙ্কর জোশী, 'সুন্দরম' ও জভেরচন্দ্‌ মেঘানী—গান্ধীযুগের তিন সর্বাগ্রগণ্য কবি ও কথাশিল্পী। তিনজনেই প্রথমজীবনে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন, তার ছাপ এঁদের রচনায় প্রতিফলিত। উমাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য

কাব্যগ্রন্থ 'গঙ্গোত্রী' ও 'নিশীথ'। সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময় রচিত এঁর 'বিশ্বশান্তি' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কবির চোখেঃ সত্যাগ্রহ শুধু পরাধীন ভারতের মুক্তিমন্ত্র নয়—এরি মধ্যে নিহিত রয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতাবাদের অঙ্কুর। উমাশঙ্করের রাজনৈতিক কবিতাবলী তদনীন্তনকালে সারা গুজরাতে বিপুল আলোড়নের সঞ্চার করেছিল। কাব্যক্ষেত্র বিদ্রোহী কবি হিশেবে উমাশঙ্করের আবির্ভাব। গণমুক্তি-সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক হিশেবে উমাশঙ্কর সেদিন ঘোষণা করেছিলেনঃ

রচো রচো অম্বরচুম্বী মন্দিরো !
ভুখ্যাঁ জননো জঠরাগ্নি জাগশে
খণ্ডেরনী বসম্‌কনী নলাধশে—

—নির্মাণ করো তুমি গগনচুম্বী মন্দির
কিন্তু বুভুক্ষু জনতার জঠরাগ্নি জ্বলে উঠলে
ধুলোয় নিশ্চিহ্ন হবে—
ওই মন্দিরশ্রেণী।

উমাশঙ্কর গান্ধীবাদী, কিন্তু তথাকথিত গান্ধীবাদী নন। সেদিনের সেই উমাশঙ্কর আর আজকের উমাশঙ্করে মূলগত তফাৎ নেই। আজকের স্বাধীন ভারতে অধিকাংশ গান্ধীবাদী সাহিত্যিক যখন জনতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 'জননেতা'দের মুখাপেক্ষী, একচক্ষু হরিণের মত স্বাধীনতার গুণগানে উগ্রকণ্ঠ—উমাশঙ্কর তখনো একনিষ্ঠভাবে গান্ধী মানবতাবাদের ও বিশ্বশান্তির মহান আদর্শ অনুসারী। উমাশঙ্কর সম্পর্কে এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট গুজরাতী সমালোচক ডাঃ পি বি ভাট বলেছেন—The most outstanding poet and also the most versatile writer of this epoch is undoubtedly Umashankar Joshi. His poetry····· is rich in fancy, in variety of themes and in verbal music. At times it is tender and lyrical but most often it glows with the mellow light of the setting sun. It is otfen meditative, introspective and philosophical, trying to understand the enigma of creation and the destiny of man on this planet······ এর মধ্যে অতিকথন নেই একবিন্দু।

উমাশঙ্করের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'প্রভাত বেলা'—তাঁর কবিমনের

চরিত্রটা এতে খানিক ফুটে উঠেছে: সবে ভোর হয়েছে, আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কবি শুনছেন—বাইরে কোথায়-যেন একটি বুলবুলি গান গেয়ে চলেছে অবিরাম। কী আশ্চর্য মৃদুমধুর সেই সুরলহরী! কবি উঠে দেখলেন—ছাদের ওপর 'এরিয়ালে' বসে রয়েছে ছোট্ট পাখিটি:

এরিয়াল ঝিলে ঘয়ো কো দূরদূর মথক পরে
কো মানবী কণ্ঠে করেলা।
তু অহো ঝিলে কহে ঘয়ো মৃদু উরে
ক্যাঁ অনে কো দিব্যকণ্ঠথকি প্রবেলা
আ সুরম্য প্রভাত বেলা ?·······

—দূরদূরান্ত থেকে অজানা মানুষের কণ্ঠস্বর বয়ে নিয়ে আসে এই এরিয়াল। হে পাখি! এমন সুন্দর প্রভাতে কোন মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সুরলহরী তুমি আত্মস্থ করেছ তোমার ওই সুকুমার হৃদয়ে ?···

সত্যিকারের একটি শিল্পীমনের অধিকারী উমাশঙ্কর। মানবদরদী লেখক। বর্তমান গুজরাতী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পলেখক ও সর্বাগ্রগণ্য নাট্যকার উমাশঙ্কর জোশী।

উমাশঙ্করের সমসাময়িক কবি জভেরচন্দ্। রাষ্ট্রীয় কবি হিশেবে ইনি পরিচিত ছিলেন। লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও দান এঁর অসামান্য। কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত জভেরচন্দের 'সোরাষ্ট্রানী রসধারা' একটি অমূল্য গ্রন্থ। গবেষকের চোখ দিয়ে তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতির দিকে তাকাননি, দেশপ্রেমিক কবি হিশেবে তাকে ভালোবেসেছেন, বুকে করে তুলে নিয়েছেন। শুধু বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্যই সংগ্রহ করেননি, তার থেকে প্রেরণাও সঞ্চয় করেছেন। লোকসংস্কৃতির স্বাক্ষর এঁর কবিতায় স্পষ্ট। জভেরচন্দের আরেক কীর্তি 'রবীন্দ্রবীণা'—রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গীতিকবিতার ভাবানুবাদ। গুটিকয় বাংলা উপন্যাসের সার্থক অনুবাদক হিশেবেও জভেরচন্দ্ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এঁর অকাল বিয়োগে গুজরাতী সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। 'সুন্দরম'ও এই একই ধারার অনুসারী, তবে মুখ্যত তিনি জনসাধারণের কবি। সাধারণ মানুষের মৌনমূক আবেগকে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ইনি কাব্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসময়ে অরবিন্দ আশ্রমে প্রস্থান কাব্যরসিকদের ক্ষুব্ধ করেছে। মনসুখ জাভেরী ও সুন্দরজী বেটাই এ সময়কার দুই বিশিষ্ট কবি।

এ এক খবরদার পার্শী হলেও, অধিকাংশ পার্শী লেখকের মত পার্শী-গুজরাতীর বদলে বিশুদ্ধ গুজরাতীতে লিখে থাকেন। শক্তিমান কবি ও গীতিকার ইনি—বিশেষ করে, ছন্দ ও ভাষার ওপর দখল এঁর অসামান্য। 'কলিকা'য় খবরদার ইংরেজি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের অনুকরণে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মুক্তধারা ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। 'দর্শনিকা' এঁর দার্শনিক কবিতাবলীর সংকলন।

অতিআধুনিক কবি হিশেবে কৃষ্ণলাল শ্রীধরাণী, রাজেন্দ্র সাহ্, পিনাকীন ঠাকোর, নিরঞ্জন ভগৎ, প্রিয়কান্ত মনিয়ার, বালমকুন্দ দবে, বেনীভাই পুরোহিত, মকরন্দ দবে, পূজালাল, প্রজারাম কর্সনদাস মানেক, স্বপ্নস্থ প্রমুখের নাম করা চলে।

এঁদের মধ্যে কৃষ্ণলাল শ্রীধরাণী অধুনা সাহিত্যচর্চায় প্রায় ইস্তফা দিয়ে সংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছেন। অথচ, প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি ও কথাশিল্পী। শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিশেবে রবীন্দ্রপ্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও এঁর কাব্যসংকলন 'কোড়িয়াঁ' (দীপাধার), ছোট উপন্যাস 'ইনসান মিটা ডুঙ্গা,' নাটক 'বডলো' (বটবৃক্ষ), 'মোরনা ইভা' (ময়ূরের ডিম) ও একাঙ্কিকা-সংকলন 'পিলা পলাশ' (হলদে পলাশ) এক শক্তিমান সাহিত্যিকের স্বাক্ষর বহন করে।

রাজেন্দ্র সাহ্ ও নিরঞ্জন ভগৎ আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, তবে অন্ধ অনুকারক নন। কবিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার এঁদের অন্ত নেই। বিশেষ করে, সার্থক সনেটশিল্পী হিশেবে শেষোক্ত জন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর 'মানুনীনে' (অভিমানিনি-কে) সনেটের গঠন-সৌকর্য ও ভাবসম্পদের দিক দিয়ে অনুপম ঃ

হে মানুনী হ্যাঁ জড়তা ধরীনে
পাষাণ ছে জে তুজ পাসমে'। পড্যো
যে রুক্ষতা অন্তর সম্ভবীনে
জানায়ছে নিত্য কঠোর শো ঘড্যো।
কালান্তরে যে কদি কোই কালে
উৎক্রান্তিনা সর্জনমাঁ, অজান

এ মঞ্জরી খે ফুল કોઈ ভাবে
এ মঞ্জুরী খৈ ফুল্ল কোই ভাবে
প্রফুল্লশে পথরমাঁয় প্রাণ ;
এ ভাবিনা পদ্মপ্রয়াণনে বিষে
পলী, হবে কৈক বিকাশ ল্হানে
পড্যো অহীঁ ছে তুজ পাসমাঁ দীসে ;
সন্তান, জানে অথবা অজানে
এনে জরী চরণরে তব যো অডেনা ;
নে ভূতকাল নিজনো স্মরণে চডেনা।

—হে মানিনি, জড়ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে এক পাষাণ তোমার পাশে পড়ে রয়েছে—নিজে তুমি নিঠুর কিনা, তাই তাকে পাষাণ বলে মনে করছ। কিন্তু কালান্তরে বা আগামী কোন কালে আমূল পরিবর্তনের পরে যখন নতুন সৃষ্টি হবে—এই পাষাণেই তখন মঞ্জরী ধরবে, এই পাথরেই তখন ফুল ফুটবে। সেই ভাবী পুষ্পবিকাশের আশাতেই তো এই পাষাণ পড়ে রয়েছে তোমার পাশে। হে মানিনি, দেখো দেখো—ভুলেও যেন তোমার চরণ একে স্পর্শ না করে! নিজের অতীত যেন ভুলেও তোমার মনে না পড়ে! (কবির শ্লেষ ঃ অতীতে তুমিও পাষাণী ছিলে, আমার প্রেমের যাদুস্পর্শেই না মানবী হয়ে উঠেছ—ওগো মানিনি, মনে কি পড়ে ?)

মকরন্দ দবেও কবিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে থাকেন। হিন্দুস্তানী বোলী ও ছন্দে কবিতা রচনা করে অতি আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যে ইনি বৈচিত্র্য এনেছেন ঃ

চল প্রীত নগরিয়াঁ মনমানী
গরথে বাঁধ নকাইঁ গঠরিয়াঁ ব্যরথ নদো নে নুকসানী
মেল হকুমত হকদাবানি পরনী মেল মহরবানী
অপনো পেঁইডো ন্যেরো পাগল, না বিগড়ি না বনবানী
আঠ পহর ঝুমে অলমস্তা সাহেবজাদা সুলতানী
অগ্নি বিচ রমে নিত রঙ্গে প্রাণ পতঙ্গা মরদানী
সাজন সঙ্গ্ মিলন মানিলে প্রীত পুরানী পহচানী।...

—চলো, তোমার মনের মত প্রেমনগরে। সাথে করে কিছু নিওনা, লাভ-লোকসানের কথা মনেও এনো না। সব দাবিদাওয়া ছেড়ে দাও,

পরের দয়ার মুখও চেওনা। ওরে পাগল, আপন বলতে তোর যা রয়েছে তার ক্ষয়ও নেই তার সৃষ্টিও নেই—রাজকুমার রাজকুমারীর মত সারাদিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক তুই। পুরুষ পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তুমি প্রিয়মিলনের আনন্দ উপভোগ করবে—যে প্রিয়ের সাথে তোমার বহু পুরাতন প্রেম।

অতিআধুনিক গুজরাতী কাব্যসাহিত্য, এবং কথাসাহিত্য সম্পর্কেও, একটি বড় কথা হল—আধুনিক সাহিত্যে প্রগতি আন্দোলনের জনক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা সেখানে দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারেনি। চতুর্ভুজ দোশীর মত কবি বা ভোগীলাল গান্ধীর মত কথাশিল্পী অবশ্য জনকয়েক রয়েছেন, কিন্তু এঁরা ব্যতিক্রম—সাম্প্রতিক গুজরাতী সাহিত্যের প্রতিভূস্থানীয় এঁরা নন। 'Gandhism lost its dynamism in literature long before it lost it in politics' সত্যি, তবু সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাও 'has not acquired the force of a faith as the Gandhian ideology used to be for some time.' তাই আজ 'The majority of young writers live in an intellectual and spiritual vacuum, a state of mind which generally breeds dilettantism in literature'. এই মন্তব্য ডাঃ ভাটের।

অতিআধুনিক গুজরাতী লেখকরা অনেকখানি দিশেহারা। একদল লেখক জনপ্রিয়তার মোহে উঠেপড়ে লেগেছেন অপসাহিত্য সৃষ্টির কাজে। আরেকদল পুরনোকেই উপস্থাপিত করছেন নতুন ভাষায়, নতুন ভাবে। অতিআধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবও এঁরা যথাসম্ভব পরিহার করে চলেন। এর প্রধানতম কারণ, মনে হয়, বাস্তবজগতে গান্ধীবাদের অবসান ঘটলেও গুজরাতের মানসজগতে তার জেরটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। যুক্তি-বুদ্ধির ওপরেও গান্ধীব্যক্তিত্বের একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীব্যক্তিত্বের প্রায়-অলৌকিক এই ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করেছি। গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত গুজরাতের সমাজমানসে সেই প্রতিক্রিয়া আজও অব্যাহত।

এই নাগপাশ থেকে মুক্তির প্রয়াস যে একেবারে না চলছে তা নয়। শক্তিমান তরুণ নাট্যকার শিউকুমার জোশী একটি গানে বলেছেন :

বন্ধননী ইস্নাত্‌নানী ঝাড়িওনী পেলীপার
এক এক মানবীনা কণ্ঠনু জ'া মুক্তগান

বিচরে নভান্তরাল—সত্যমুক্তি ষু প্রমাণ
এ র লক্ষ্য দিনরাত হয় তারু ̐ হে যোয়ান।

—বন্ধনের সমস্ত রকম শৃঙ্খল মোচন করে প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি যে-আকাশে বিচরণ করছে—সত্যিকারের মুক্তি সেখানেই। হে তরুণ, এই হোক তোমার দিনরাত্রির লক্ষ্য।

কিন্তু সর্বাঙ্গীন মানবমুক্তির আদর্শকে বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে গ্রহণ করতে তরুণ গুজরাতের অধিকাংশ কবি পেরেছেন বলে মনে হয় না।

শক্তিশালী মহিলা কবি হিশেবে জ্যোৎস্না শুক্‌ল, জয়ামানগৌরী, সুমতি ত্রিবেদী ও বিজয়লক্ষ্মী ত্রিবেদীর নাম করা চলে। উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ ও দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে শ্রীমতী শুক্‌ল একদা প্রভূত যশের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

কথাসাহিত্য

গুজরাতীতে উপন্যাস 'নবলকথা' এবং ছোট গল্প 'বার্তা' বা 'নভেলিকা' নামে পরিচিত। প্রথম যুগের ঔপন্যাসিক মহিপৎ রাম ও নন্দশঙ্কর। এঁরা লিখেছেন শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাস। স্কটের প্রভাবে দুজনেই সবিশেষ প্রভাবান্বিত। গুজরাতী সাহিত্যের সত্যিকারের প্রথম উপন্যাস গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠীর 'সরস্বতীচন্দ্র'। শুধু সে-যুগের নয়, সমগ্র গুজরাতী সাহিত্যের এ এক অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি।

উপন্যাসটি এপিকধর্মী, মোট চার খণ্ডে বিভক্ত। ভারতীয় সমাজে আর্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে ধর্ম, সমাজ, দর্শন, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—তাই উপজীব্য এই গ্রন্থের। গুজরাতের প্রকৃত জীবন নিয়ে প্রথম উপন্যাস 'সরস্বতীচন্দ্র'। পুনরুজ্জীবনবাদী হওয়া সত্ত্বেও গোবর্ধনরাম ছিলেন উদারদৃষ্টি লেখক—তাঁর রচনায় একই সঙ্গে বাণভট্ট, মাঘ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, লীটনের প্রভাব চোখে পড়ে। আধুনিক সমালোচকের চোখে 'সরস্বতীচন্দ্র'-র ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু-কিছু ধরা পড়লেও, গত শতকীয় ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে 'সরস্বতীচন্দ্র' নিসন্দেহে অন্যতম। কোন কোন সমালোচক একে নতুন 'পুরাণ' নামেও অভিহিত করে থাকেন।

রমণভাই নীলকণ্ঠ সমালোচক হিশেবে খ্যাতিমান, কিন্তু ব্যঙ্গ রচনাতেও তিনি যে সবিশেষ পারঙ্গম ছিলেন 'পিকউইক পেপার্স'-এর অনুকরণে রচিত এঁর 'ভদ্রম ভদ্র' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কবি নানালাল 'ঊষা' উপন্যাস ও 'ইন্দ্রকুমার', 'জয়া-জয়ন্ত', 'শাহানশাহ্ আকবর' ইত্যাদি নাটকও রচনা করেন। কথাসাহিত্য হিশেবে সেগুলি তত সার্থক হয়ে না উঠলেও কাব্যপাঠের আনন্দ তাতে পাওয়া যায়। রক্তমাংসের চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে প্রত্যেকটি চরিত্রকে এক-একটি আদর্শের প্রতীক করে তোলার দিকেই এঁর প্রবণতা ছিল। এযুগের আরেক শক্তিশালী কথাশিল্পী ভোগীন্দ্ররাও দিবেতিয়া। 'লে মিজারেবল'-এর অনুসরণে বোম্বাইয়ের শ্রমিকজীবন নিয়ে ইনি আশ্চর্যরকম বাস্তবনিষ্ঠ একটি উপন্যাস রচনা করেন।

আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের দিকপাল লেখক কানাইয়ালাল মুন্‌শী। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক, ছোটগল্প, সমালোচনা, জীবনী, আত্মজীবনী—এক কথায়, সাহিত্যের হেন শাখা নেই মুন্‌শী-প্রতিভার স্বাক্ষর যেখানে অনুপস্থিত। ব্যতিক্রম শুধু কবিতা। মুন্‌শীজীর গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশাধিক। শুধু গুজরাতী নয়, ইংরেজিতেও ইনি লিখে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'গুজরাট এ্যাণ্ড ইট্‌স্ লিটরেচর' ও 'হিস্টরী অব ইম্পীরিয়াল গুর্জর্স'-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

মুন্‌শীজী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবনবাদী, তাই বলে মন তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উপন্যাস-নাটকের মধ্যে দিয়ে গুজরাতের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে তিনি তুলে ধরেছেন, মহিমা কীর্তন করেছেন হারানো অতীতের—কিন্তু সেটা করেছেন নবোদ্ভূত বুর্জোআসুলভ উদারমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। তাই সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশেও ব্যক্তিপ্রেমের মর্যাদা স্বীকারে ও জয়গানে তিনি অকুণ্ঠ। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষা প্রেম-প্রতিহংসার রসায়নে এঁর উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মুন্‌শীজী ফুটিয়ে তুলেছেন সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রবহমান চিত্র। যেমন 'স্বপ্নদৃষ্ট'—বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কংগ্রেস আন্দোলন গুজরাতে যে নতুন প্রাণবন্যার জোয়ার নিয়ে আসে—তারই হৃদয়গ্রাহী পরিচয় পাওয়া যাবে এই উপন্যাসে। মুন্‌শীজীর ঐতিহাসিক উপন্যাস হিশেবে 'পাটন্‌নি প্রভুতা' (পাটনের প্রভুত্ব), 'পৃথিবীবল্লভ', 'গুজরাত নো নাত' (গুজরাত-

সম্রাট), 'রাজাধিরাজ' ও 'জয় সোমনাথ', সামাজিক উপন্যাস 'কোনো ওঁয়াক' ও 'স্বপ্নদৃষ্ট', পৌরাণিক নাটক 'তর্পন', 'পুত্রসমোবডি (পুত্রপ্রতিম), 'লোপামুদ্রা' ও সামাজিক নাটক 'বে থারাব জন' (দুটি বদলোক) গুজরাতী সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। ঔপন্যাসিক হিশেবে গোবর্ধনরামের পরেই মুন্‌শীজীর আসন।

আঙ্গিকদুরস্ত ও মনস্তত্বমূলক ছোটগল্প এবং মধ্যবিত্ত জীবনের অহমিকা ও ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক রেখাচিত্র রচনায় শক্তির পরিচয় দেন রামনারয়ণ পাঠক। 'বাদরায়ণ' (ভানুশঙ্কর ব্যাস), 'স্নেহরশ্মি' (জীনাভাই দেশাই) শক্তিশালী কবি ও কথাশিল্পী। এযুগের আরেক শক্তিমান লেখক 'ধূমকেতু' (গৌরীশঙ্কর জোশী)। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দরুন এঁর গল্পগুলি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। শেষের দিকে ইনি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। সেই হিশেবে মুন্‌শীজীর উত্তরসাধক 'ধূমকেতু'। রমণলাল দেশাইয়ের আবির্ভাব নাট্যকার হিশেবে। এঁর 'শঙ্কিত হৃদয়' একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—বিশেষ করে কলেজের ছাত্রমহলে। বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রমণলাল গান্ধীবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। 'কোকিলা', 'সিরিষ' ও 'দিব্যচক্ষু' এঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। শেষোক্তটি রচিত আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমিকায়। সাধারণ পাঠকসমাজে বইটির সমাদর যথেষ্ট। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচনার খাতিরে 'দিব্যচক্ষু'কে পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ বলা যায় না—বড়-বেশি স্থূল, বড়-বেশি প্রচারধর্মী, শিল্পজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির বড়-বেশি অভাব। এই একই অভিযোগ রমণলালের অন্যান্য উপন্যাস সম্পর্কেও কমবেশি প্রযোজ্য—ছকে-বাঁধা কাহিনী, যান্ত্রিক চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও অতিনাটকীয়তা দোষে এঁর প্রায় প্রতিটি বই-ই দুষ্ট।

বর্তমানে গুজরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী পন্নালাল প্যাটেল। মাত্র দশবারো বছরের মধ্যে যে কী অসাধারণ খ্যাতি ইনি অর্জন করেছেন ভাবলে অবাক লাগে। দরিদ্র নিরক্ষর এক কিসান পরিবারে পন্নালালের জন্ম, ইশকুলের বিদ্যা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত—জীবনের পাঠ নিয়েছেন জীবনেরই হাতে। জীবিকার জন্যে কৈশোর থেকে উদ্ব্যস্ত হতে হয়—ভাটিখানা থেকে পাটের গুদোমের খবর্দারি পর্যন্ত চাকরি করেছেন হরেক রকম। জীবনকে শাদা চোখে দেখেছেন,

নিচুতলার মানুষদের আন্তরিক পরিচয় পেয়েছেন, তাদের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের দরদী লেখক পন্নালাল। সহজ সরল এঁর রচনাশৈলী। গ্রামীণ কিসান জীবনের রূপায়ণে, জীবন্ত চরিত্র চিত্রণে, বাস্তবধর্মী পরিবেশ রচনায় ও ঘটনাগ্রন্থনে দক্ষতা অসামান্য। বিশেষ, নারীচরিত্র সৃষ্টিতে পন্নালাল তো অতুলনীয়। সেই হিশেবে কেউ কেউ এঁকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এঁর 'মলেলা জিউ' (যুগ্ম-হৃদয়), 'ভীরু সাথী' 'যৌবন' 'সুরভি', 'মানবীনী ভবাঈ', 'সুখদুখনা সাথী', 'জিন্দ্‌গীনা খেল', 'জীওদাঁড়', 'পানেতরনা রঙ্গ' ইত্যাদি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থগুলি গুজরাতের ঘরে ঘরে পঠিত। 'মলেলা জিউ' ও 'মানবীনী ভবাঈ' পন্নালালের শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস।

পন্নালালের সহধর্মী লেখক ঈশ্বর পেটলিকর। এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জনমটীপ' (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড)। কিসান জীবনের এক বাস্তব চিত্র লেখক এখানে উপস্থাপিত করেছেন। চুনিলাল মাড়িয়া কাথিয়াওয়াড়ের গ্রামজীবনের কুশলী লিপিকার। তবে, উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পেই মাড়িয়ার কৃতিত্ব সমধিক। প্রসঙ্গক্রমে এঁর 'ঘুঘোউতাপুর' (প্রলয় প্লাবন) এর নাম করা যায়। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসে গুণবন্তরায় আচার্য একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। সমুদ্রজীবনকে কেন্দ্র করে ইনি কয়েকটি জনরঞ্জন উপন্যাস লিখেছেন—'দরিয়া-লাল' (সমুদ্র-সন্তান) 'দরিয়া-ওয়াট' (সমুদ্রপথে) ইত্যাদি। এঁর সামাজিক উপন্যাস হিশেবে 'দরিদ্রনারায়ণ' এর নাম করা চলে। অন্যান্য প্রবীণ ও নবীন কৃতি কথাশিল্পী কিশনসিং চ্যাওড়া, মোহনলাল মেহতা, গুলাবদাস ব্রোকার, জয়ন্তী দালাল, স্বপ্নস্থ, জয়ন্ত ক্ষেত্রী ও যতীন্দ্র দবে।

মহিলা কথাশিল্পীদের মধ্যে লীলাবতী মুন্‌শী ও বিনোদিনী নীলকণ্ঠের নাম উল্লেখযোগ্য। কানাইয়ালালের যোগ্য সহধর্মিণী লীলাবতী। গল্প, রেখাচিত্র ও নাটক রচনায় শ্রীমতী মুন্‌শী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টিতে ইনি সবিশেষ পারঙ্গম। কানুবেন ও চৈতন্যবালা মজুমদারের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দেখা গিয়েছিল, অকালে এঁরা লোকান্তরিত। শ্রীমতী হংসা মেহতা আজ নারীনেত্রী হিশেবে

পরিচিত—কিন্তু প্রথম জীবনে ইনি খ্যাতি অর্জন করেন সাংবাদিক ও নাট্যকার হিশেবে। 'হ্যামলেট'-এর সার্থক অনুবাদের জন্যেও এঁর নাম স্মরণীয়।

নবলরাম, ডি বি কেশবলাল ধ্রুব, বলবন্তরায় ঠাকোর, কবি নানালাল, কে এম মুন্‌শী, চন্দ্রবদন মেহতা, উমাশঙ্কর জোশী, রমণলাল দেশাই প্রমুখ সেযুগ ও এযুগের লেখকদের দান নাট্যসাহিত্যে কম-বেশি থাকলেও আধুনিক গুজরাতী নাট্যসাহিত্য বলতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু এখনো গড়ে ওঠেনি। এক'শ বছর আগেই গুজরাতে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, পেশাদার রঙ্গমঞ্চও রয়েছে—কিন্তু তার সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অনাত্মীয়। মঞ্চোপযোগী নাটকের সংখ্যা তাই একেবারেই নগণ্য।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে তিনজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—উমাশঙ্কর জোশী, জয়ন্তী দালাল ও চন্দ্রবদন মেহতা। একাঙ্কিকায় উমাশঙ্কর অপ্রতিদ্বন্দ্বী—'সাপনা ভারা' ও 'শহীদ'-এ সংকলিত এঁর একাঙ্কিকাগুলি অনুপম সাহিত্যসৃষ্টি হিশেবে পরিগণিত। জয়ন্তী দালাল আঙ্গিক সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন—'যবনিকা,' 'প্রবেশ বীজো' (দ্বিতীয় দৃশ্য), 'অবতরণ,' ও 'ত্রীজো প্রবেশ' (তৃতীয় দৃশ্য) এঁর উল্লেখযোগ্য একাঙ্কিকা-সংকলন। চন্দ্রবদন 'আগগাড়ী' (রেলগাড়ি) ও 'নাগা বাবা'-য় যথাক্রমে রেলশ্রমিক ও ভিক্ষুকদের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। দুটিই পূর্ণাঙ্গ নাটক। বিশেষ করে, 'আগগাড়ীর নাট্যকার হিশেবে ইনি যে বস্তুনিষ্ঠা ও জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীজনোচিত।

প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে শিউকুমার জোশী অগ্রগণ্য। 'পাখঁ বিনানাঁ পারেবাঁ (পাখাহীন পায়রা) এঁর একাঙ্কিকা-সংকলন। 'দেবদাস'-এর নাট্যকার, 'বিরাজ বউ' নাটকের গুজরাতী অনুবাদক ও ছোটগল্প লেখক হিশেবেও ইনি কৃতিত্বের দাবিদার। শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলেছিল তার পটভূমিকায় ইনি আশ্চর্যরকম সার্থক একটি নাটিকা লিখেছেন—'মুক্তি প্রসূন'।

অনুবাদের দিক দিয়ে গুজরাতী সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিদেশি ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য থেকেও অনূদিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। এখনো হচ্ছে। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি হয়েছে বাংলা থেকে অনুবাদ। সে-যুগ ও এ-যুগের প্রত্যেকটি কৃতি বাঙালি লেখক গুজরাতের

পাঠকসমাজে পরিচিত। সার্থক অনুবাদক হিশেবে নগেনদাস পারেখ, ভোগীলাল গান্ধী, মহেন্দ্র মেঘানী, জভেরচন্দ্‌ মেঘানী, রামনিক মেঘানী, রমণলাল সোনী, বাচ্চুভাই শুক্ল, বিশ্বনাথ ভাট, শ্রীকান্ত ত্রিবেদী ও জয়ন্তী দালালের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য

ভারতীয় বিদ্যাভবনের মুখপত্র 'ভারতীয় বিদ্যা'র অন্যতম সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক জয়ন্তকৃষ্ণ এইচ দবে এক প্রবন্ধে বলেছেন—'Narmad was the father of Gujarati prose. Gobardhanrama, Manilal, Narasinharao, Ramanbhai and Anandasankar cultivated it and gave it richness, charm, and majesty. Munshi made it elastic terse, and vigorous, aiming at perfection of form. Gandhiji made it simple and appealing to the masses. Kalelkar added Sanskritic Grace and idiomatic charm without making the language pedantic—এর চেয়ে অল্পকথায় গুজরাতী গদ্য সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

আধুনিক গুজরাতী গদ্যের স্রষ্টা নর্মদাশঙ্কর ও সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্তক নবলরাম অভ্যুদয়-যুগের লেখক। এঁদের সঙ্গে সঙ্গে হরগোবিন্দদাসের নামও উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গুজরাতী কাব্যমালার সংগ্রাহক-সম্পাদক হিশেবে ইনি অমর হয়ে থাকবেন। প্রাচীন পুথিসাহিত্যের মর্যাদা ইনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয় যুগের লেখকের মধ্যে—মনিলাল দ্বিবেদী বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ও বেদান্তের গুজরাতী ভাষ্যকার। সমালোচক হিশেবে নবলরামের পরেই নাম উল্লেখযোগ্য রমণভাই নীলকণ্ঠ-র। এঁর 'কবিতা আনে সাহিত্য' সমালোচনা সাহিত্যের আদর্শস্থানীয় গ্রন্থ। ডি বি কেশবলাল ধ্রুব 'পদ্যরচনানী ঐতিহাসিক আলোচনায়' প্রাচীন গুজরাতী ছন্দালঙ্কার নিয়ে মনোজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। এ-যুগের লেখকদের অগ্রজস্থানীয় ডাঃ আনন্দশঙ্কর ধ্রুব—আচার্য আনন্দশঙ্কর। তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বসন্ত'র সম্পাদক হিশেবে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রামাণ্য বলে গৃহীত হত। এঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ছিল অসামান্য।

ব্যক্তিমানুষ হিশেবে গান্ধীজী একদা যে-কারণে আপামর ভারতবাসীর আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন সাহিত্যিক হিশেবেও তাঁর অনন্যতা সেই একই কারণে—বাহুল্যবর্জিত সহজ সরল ভাষা, অনাড়ম্বর রচনাশৈলী—বাইবেলের মত—অহেতুক উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগের প্রশ্রয় তাঁর লেখায় নেই। ব্যক্তি মানুষেরই প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যিক গান্ধীজীর মধ্যে। গুজরাতী গদ্যকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন গান্ধীজী। ডি বি কৃষ্ণলাল জাভেরী, বলবন্তরায় ঠাকোর, বিজয়রায় কল্যাণরায়, বিশ্বনাথ ভাট, নবলরাম ত্রিবেদী ও 'সুন্দরম' শক্তিমান সমালোচক। ঐতিহাসিক গবেষণায় ভগবানলাল ইন্দ্রজী গত শতাব্দীতে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দুর্গাশঙ্কর শাস্ত্রী, মুনী জিনাবিজয়াজী, কে এম মুন্‌শী, সাংকালিয়া প্রমুখ লেখকরা আধুনিক কালে এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। জীবনী-সাহিত্যে কান্তিলাল পাণ্ড্যা, বিনায়ক মেহতা, মুনশীজী ও বিশ্বনাথ ভাট এবং চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিশেবে মহাদেব দেশাই ও ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের নাম উল্লেখযোগ্য। কাকা কালেলকর ও কিশোরীলাল মশরুওয়ালা এযুগের দুই শক্তিমান গদ্যলেখক। মারাঠী হলেও, এবং মারাঠী সাহিত্যিক হিশেবে খ্যাতিমান হলেও—গুজরাতী সাহিত্যেই কাকা কালেলকরের দান বেশি। এঁর অনেক বই প্রথমে গুজরাতীতে রচিত ও পরে মারাঠীতে অনূদিত হয়। 'জীবন্‌নো আনন্দ,' 'মরণযাত্রা' ও 'দেবানু কাব্য' এঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পুনরুজীবন ও গান্ধীযুগের সেতু হিশেবে এঁকে অভিহিত করা চলে। মশরুওয়ালা শুধু গান্ধী দর্শনের প্রবক্তা হিশেবে নয়, 'সমূড়ী ক্রান্তি' (আমূল বিপ্লব), 'জীবনশোধন' ও 'গীতামন্থন'-এঁর মধ্যে এর দৃষ্টিভঙ্গির যে স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে সেজন্যেও ইনি দীর্ঘকাল চিন্তাশীল পাঠকদের শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন।

মারাঠী

ভাষার ভিত্তিতে মারাঠারা কবে জাতি হিশেবে গড়ে ওঠে—কোন ঐতিহাসিকই সে-সম্পর্কে আজো একমত নন। প্রাক-বুদ্ধ যুগেও কথ্য ভাষা হিশেবে মারাঠীর অস্তিত্ব ছিল, খৃস্ট-জন্মের দু'শ বছর আগেই মারাঠী ব্যাকরণ লিখিত হয়, এবং সেই সুদূর অতীতে একদা সরকারি ভাষার মর্যাদাও মারাঠী লাভ করেছিল—কিন্তু একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর আগেকার কোন লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন আজ আর পাওয়া যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে চক্রধর স্বামী 'মহানুভব' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 'মহানুভব'কবি ও গদ্যলেখকদের হাতেই মারাঠী সাহিত্যের জন্ম। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই 'মহানুভব' লেখকদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবময়। শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে এঁদের সম্পর্কে বলেছেন যে, এঁরা—'represented a revolt of the oppressed masses of the period.··· Hence they were boycotted and supressed, their literature went underground and was written and circulated in a code. The modern inheritors of this sect literature for a long time refused to decode and publish it in tho modern form till 1907 AD.

'মহানুভব'রা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরা মূর্তিপূজা ও অস্পৃশ্যতা প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন, সামাজিক সমানাধিকারের আদর্শ প্রচার করেন, এবং শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন। মধ্যযুগের সাহিত্য 'সন্ত সাহিত্য' নামে পরিচিত। অবশ্য 'সন্ত সাহিত্যের' সূচনাকাল দশম শতাব্দী, এবং মহারাষ্ট্রের গণমনে তার প্রভাব আজও অব্যাহত। সে-সাহিত্যের প্রধান সুর বিদ্রোহের সুর, অসাধারণ তার সাহিত্যমূল্যও। 'লীলাচরিত্র'-এ গদ্যের এবং 'রুক্মিনী স্বয়ম্বর' ও 'শিশুপালবধ'-এ পদ্যের যে নিদর্শন রয়েছে সত্যিই তা অনুপম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞানদেব রচিত ভগবত গীতার ভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' আজো মারাঠী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিশেবে স্বীকৃত।

জ্ঞানদেব, নামদেব, মুক্তেশ্বর, রামদাস, তুকারাম, একনাথ, বামন পণ্ডিত, শ্রীধর, রামজোশী, মোরোপন্ত প্রমুখ সন্ত কবিদের আবির্ভাব দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এঁদের কেউ কেউ গদ্যলেখক হলেও পরিচিত সকলেই কবি হিশেবে। আবার রামজোশী, হোনাজী, প্রভাকর প্রমুখেরা ছিলেন 'শাহিরী কবি'—অনেকটা চারণ জাতীয় কবি। পেশোয়া রাজত্বকালে এই কবি-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে, আধুনিক কালেও এর কিছুটা অবশেষ রয়ে গেছে।

পেশোয়া রাজত্বের অবসান ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়, মহারাষ্ট্রে কায়েম হল বৃটিশ শাসন। মারাঠী সাহিত্য ইংরেজির সংস্পর্শে এল। শুরু হল সাহিত্যের রূপান্তর।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ মারাঠী সাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায়। মহারাষ্ট্রের বঙ্কিমচন্দ্র হরিনারায়ণ আপ্তের উপন্যাসগুলি এই সময় লিখিত। এই সময়কার বিখ্যাত নাট্যকার দেবল, ঐতিহাসিক ভি কে রাজওয়াড়ে, প্রাবন্ধিক বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুনকর, সাংবাদিক-সাহিত্যিক বাল গঙ্গাধর তিলক—সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা এক-একজন দিকপাল।

১৮৭৪ সালে 'নিবন্ধমালা' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ আরেক যুগান্তকার ঘটনা। পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রায়-একমাত্র-লেখক ছিলেন বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুনকর। অন্ধ পাশ্চাত্যপ্রিয়তার প্রতিবাদ জানিয়ে উদার জাতীয়তাবাদ প্রচারের আদর্শে ইনি ব্রতী হলেন। তিলক ও আগড়কর এসে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন। জাতীয় চারিত্র্য বজায় রেখে ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে এঁরা নতুন একটি ইংরেজি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। আগড়কর বার করলেন মারাঠী সাপ্তাহিক 'কেশরী', তিলক ইংরেজি 'মারহাট্টা'। মহারাষ্ট্রের নব জাগরণে অসামান্য এই ত্রয়ীর ভূমিকা।

১৮৮২ সালে চিপলুনকরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর বছর কয়েক পরেই দেখা দিল সংকট। সমাজ-সংস্কার এবং রাজনীতির মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রশ্নে আগড়কর ও তিলকের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটল। তিলক 'কেশরী'র সম্পাদক হলেন, আগড়কর বার করলেন নতুন পত্রিকা—'সুধারক' (সংস্কারক)। আগড়করের বক্তব্য : নিজেদের গলদ-গাফিলতির জন্যেই ভারত পরাধীন হয়েছে। অতএব রাজনৈতিক আন্দোলনের আগে প্রয়োজন নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে নেওয়া, স্বাধীনতা অর্জনের উপযুক্ত হয়ে ওঠা। তিলক

বললেন : না—আগে চাই স্বাধীনতা। সমাজ-সংস্কারের সমস্যা করা যাবে পরে।

এমনিতে তিলকের বক্তব্য অধিকতর যুক্তিসহ মনে হলেও কার্যত কিন্তু এর পরিণাম দেখা গেল উল্টো রকম। আগড়কর তাঁর সংস্কার-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ধ্যানধারনা ও যুক্তিবাদকেই প্রাধান্য দিলেন, আর তিলক ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয়।

আর, মারাঠী লেখকরাও ভাগ হয়ে গেলেন দুটি শিবিরে—তিলক-শিষ্য ও আগড়কর-অনুগামী। একদল সংস্কারবাদী, আরেকদল রক্ষণশীল। আধুনিক মারাঠী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার আগে এই ভূমিকাটা মনে রাখা দরকার।

কাব্যসাহিত্য

আধুনিক মারাঠী কাব্যসাহিত্যের জনক কেশবসুত (১৮৬৬-১৯০৫)—কৃষ্ণাজী কেশব দামলে। যদিও কবিতার সংজ্ঞা সম্পর্কে কেশবসুত তাঁর 'কবিতা আণি কবি'-তে বলেছেন :

অশী অসাবী কবিতা, ফিরুন
তশী নসাবী কবিতা, ম্হণুন
সাংগাবয়া কোণ তুম্হী কবীলা
অহাত মোঠে? পুসতো তুম্হারা

—যারা বলে, কবিতা এ-রকম হবে বা ও-রকম হওয়া উচিত নয়—তাদের জিজ্ঞেস করি : একথা বলার তোমরা কে?

যুবা জসা তো যুবতীস মোহে
তসা কবী হা কবিতেস পাহে;
তিলা জসা তো করিতো বিনন্তী
তসা হিলা হা করিতো সবৃত্তী।
লাডীগুডী সালব লাডকীশী
অশা তর্হেনে, জরি হে যুব্যাশী
কোণী নসে সাঙ্গত, থোর গৌরবে
কা তে তুম্হী সাংগতসা কবীসবে?

—যুবক যেমন যুবতীকে দেখে মোহিত হয়, কবিও তেমনি কবিতাকে নিয়ে মুগ্ধ। যুবক যেমন যুবতীকে মিনতি করে বশে আনে, কবিও তেমনি অতি সযতনে কবিতাকে ছন্দে বাঁধে। প্রিয়তমার সাথে এইসব কথা বলে প্রেমালাপ করো—এ কি কেউ যুবককে শিখিয়ে দেয়? তবে কেন তুমি কবিকে উপদেশ দিতে আস?

কিন্তু কেশবসুতের কবি-পরিচয় শুধু এই কবিতাটি দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। শিশু যেমন অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীকে দেখে, নবযুগের কবি কেশবসুতও তেমনি মুগ্ধবিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীকে ভালো বেসেছেন, ভালো বেসেছেন পৃথিবীর সবকিছুকে। নরনারীর মানবিক প্রেমকে কেশবসুত প্রথম এক বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তোলেন। চারপাশের চলমান জীবনের দিকে তিনি মুক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন—তুচ্ছাতিতুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কোন-কিছুই তাঁর কবিদৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ছোটখাট নগণ্য বিষয় নিয়েও নির্মাণ করেছেন আশ্চর্যসুন্দর সার্থক কবিতা।

আঙ্গিকের দিকে তত দৃষ্টি না দিলেও—দৃষ্টিভঙ্গির নবীনতায় ও কাব্যবিষয়ের বিস্তৃতিতে কেশবসুত নতুন যুগের সূচনা করলেন। কবিতা সম্পর্কে তাঁর উপরোক্ত উধৃতির মধ্যে বিশেষ-এক-শ্রেণীর সাহিত্যাদর্শ ফুটে উঠলেও সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে অন্ধদৃষ্টি কেশবসুত ছিলেন না। তাঁর উপবাসী মজুরের স্বগতোক্তি—'মজুরাবর উপাসমারীচী পালী' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে:

এক উপবাসী মজুর বলছে—চারদিকে এত আনন্দ, কিন্তু হে ভগবান, আমার এত দুঃখ কেন? আজ সারা দিনে একটি কড়িও আমার রোজগার হয়নি। আমি তো কাজ করেই খেতে চাই—তবু কেউ আমায় কাজ দেয়নি! অথচ—

> হী মন্দিরে হো খুলতাত চাংগলী ;
> মাঝ্যা বডীলীচ ন কায় বান্ধিলী ?
> মী মাত্র হো আজ মরে ভুকেমুলে ;
> শ্রীমন্ত হে নাচতি মন্দিরী ভলে !
> হেবা তয়াঞ্চা মজলা মূলী নসে
> জাডী মলা ভাকর তী পুরে অসে ;

কষ্টাত দেবা ! মরণ্যাস তৎপর,
কা মারিসী হায় ! ভুকেমুলে তর ?
সর্বাস দেবা ! বঘতোসি সারখা,
হোতোস কা রে গরিবাস পারখা ?
কাঁহীস সুগ্রাস সদন্ন তু দিলে,
সাধী অম্হা ভাকরহী ন কা মিলে ?

—ওই যেসব সুন্দর সুন্দর মন্দির—আমাদের পিতৃপুরুষরাই কি ওগুলি তৈরী করেনি ? আজ আমি না খেয়ে মরছি, আর ধনীরা ওই মন্দিরে নাচগান করছে ! ওদের হিংসে আমি করি না—এক টুকরো রুটিতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি তো কষ্ট করে খেটে মরতে চাই, কিন্তু হে ভগবান, আমায় তুমি না খাইয়ে মারছ কেন ? লোকে বলে, তুমি নাকি সবাইকে সমানভাবে দেখ—তাহলে গরিবের দিকে তাকাও না কেন ? কারো জন্যে তুমি পরমান্নের ব্যবস্থা করো, আর মোটা একটা রুটির টুকরোও আমি পাব না কেন ?

মনে রাখা ভালো—কবিতাটি ১৮৮৯ সালে রচিত। কতখানি মানবতা-বোধ ও সমাজদৃষ্টি থাকলে তৎকালীন কোন কবির পক্ষে সাধারণ এক মজুরের—মজুর শ্রেণীর—জীবনের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসাকে এভাবে তুলে ধরা সম্ভব, ভাবলে অবাক লাগে। আগড়করের আদর্শকে কেশবসুত তাঁর কাব্যের মাধ্যমে রূপায়িত করে তোলেন। আধুনিক কালের প্রথম সার্থক গীতিকবিতা রচয়িতা হিশেবেও ইনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রেভারেণ্ড তিলক (নারায়ণ বামন তিলক), গোবিন্দাগ্রজ (রাম গণেশ গড়করি), বিনায়ক জনার্দন করন্দিকর, বাল কবি (ত্র্যম্বক বাপুজী ঠোমরে), 'বী', ভাস্কর রামচন্দ্র তাম্বে, মাধব জুলিয়ন (এম টি পটবর্ধন), যশোবন্ত, ভি ডি সাভারকর, গিরিশ, টেকাড়ে, অনিল, বি এস পণ্ডিত, কুসুমাগ্রজ—আধুনিক যুগের অন্যান্য সুপরিচিত কবি। এঁদের অধিকাংশই কেশবসুতের সমসাময়িক, কয়েকজন তাঁর অনুজস্থানীয়। কিন্তু কেশবসুতের যুগের গণ্ডি অতিক্রম কেউই পুরোপুরি করতে পারেননি।

রেভারেণ্ড তিলক প্রকৃতিপ্রেমিক দার্শনিকভাবাপন্ন কবি। ধ্রুপদী কাব্যরীতির অনুসরণে আধুনিক যুগে যাঁরা কবিতা লিখেছেন—তাঁদের সকলের

আগে চন্দ্রশেখরের আসন। বিনায়ক ঐতিহাসিক গাথা ও সঙ্গীতে খ্যাতিমান। মাধব জুলিয়ন পণ্ডিত সমালোচক, কিন্তু কবি হিশেবেও যথেষ্ট শক্তিশালী। তাঁর বর্ণনামূলক দীর্ঘ কবিতা 'সুধারক' আধুনিক মারাঠী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

সাভারকর, যশোবন্ত ও কুসুমাগ্রজ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কবি। উত্তেজনামূলক স্বদেশী কবিতা লিখে এঁরা একসময় সারা দেশে প্রভূত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তী যুগে সাভারকর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির পুরোধা হয়ে উঠলেও প্রথম জীবনে ছিলেন বিপ্লবী নেতা—সে-পরিচয় সকলেরই জানা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী কবি হিশেবেও মারাঠী সাহিত্যে এঁর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। যশোবন্তর 'অজিঙ্ক্য ভারতখণ্ড' (অজেয় ভারত) গীতিকবিতাটি একদা প্রচুর জনসমাদর লাভ করেছিল :

অজিঙ্ক্য ভারতখণ্ড
আমুচা অজিঙ্ক্য ভারতখণ্ড
লওয়ুঁ লব্‌হাল্যাপরী জরাসে পরচক্রাত প্রচণ্ড
মিলেল সন্ধী তেব্‌হাঁ তেব্‌হাঁ পুন্‌হা উভারুঁ বণ্ড
আমুচা অজিঙ্ক্য ভরতখণ্ড......

—ভারতবর্ষ অজেয়, অজেয় আমাদের ভারতবর্ষ। বৈদেশিক আক্রমণের প্রবল বন্যার মুখে জলজ তৃণের মত আমরা মাথা নিচু করব, কিন্তু সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে ফের দাঁড়াব মাথা উচু করে। আবার করব বিদ্রোহ। অজেয় আমাদের ভারতবর্ষ।

আরেকটি গানে যশোবন্ত বলেছেন :

হারপলে জে তে মাঝে ক্ষণ
দেইল কা কুণি মজসী পরতুন ?
পুনর্জনন জরি স্বেচ্ছেবরতী
তরী প্রভুবরা এক বিনন্তী
সকল সঙ্কিসহ ঘাল ভারতী
মানব-জন্মা ; দে জাগৃতপণ

—জীবনে যে-মুহূর্তগুলি আমি হারিয়েছি, কেউ কি তা আমায় ফিরিয়ে দেবে? যদি স্বেচ্ছায় পুনর্জন্ম হয়, তবে হে প্রভু, আমার মিনতি—এই ভারতের

মাটিতেই আমায় আবার পাঠিও। আর, সব রকম সুযোগ-সুবিধা সেদিন দিও, আমার সে-জীবন যেন আজকের মত ব্যর্থ না হয়।

বর্তমানে সাভারকরের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সংস্রব নেই, এবং কুসুমাগ্রজ কবিতার বদলে কথাসাহিত্যে মনোনিবেশ করেছেন।

মারাঠীতে যিনি গদ্যকবিতার প্রবর্তক নাম তাঁর 'অনিল' (এ আর দেশপাণ্ডে)। এঁর সুদীর্ঘ কবিতা 'প্রেম আণি জীবন' (প্রেম ও জীবন) মারাঠী ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক গদ্যকবিতা। প্রথম জীবনে অনিল মনোরম প্রেমের কবিতায় যশস্বী হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরে এঁর কাব্যাদর্শের পরিবর্তন ঘটে। নিজের একটি কাব্য-সংকলনের ভূমিকায় তখন কবি বলেন—'আমাদের চোখে পৃথিবীর সমস্ত দুর্ভাগা মানুষের অশ্রু ঝরছে।' তবু, প্রকৃত অর্থে, অতিআধুনিক কবি অনিল নন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আধুনিক কবিদের মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দেয়, কিন্তু তার যথাযথ রূপায়ণে কেউই তেমন সফল হননি। উগ্র অতিআধুনিকপন্থীরা ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে উপেক্ষা করে সমসাময়িক পাশ্চাত্য কবিদের অন্ধ অনুকরণে মগ্ন। স্বভাবতই তাঁদের বিরুদ্ধে আজ তাই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ উঠেছে।

নতুন কবিদের মধ্যে দুজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—বি এস মার্ধেকর ও পি এস রেগে। মার্ধেকর অবক্ষয়বাদী। সেই সঙ্গে আঙ্গিকের প্রতিও দৃষ্টি দিয়ে থাকেন বড়-বেশি। রেগে দেহবাদী। নতুন নতুন উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে ও চমকপ্রদ আঙ্গিকের উদ্ভাবনে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মোড় এঁরা ঘুরিয়ে দিয়েছেন সত্যি—নিজস্ব কোন ভাবপরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সক্ষম হননি।

তবু, এঁদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই করা হোক, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, গত শতকীয় রোমান্টিসিজমের পথকে পরিহার করে চিরাচরিত কাব্যরীতিকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে এঁরাই প্রথম যাত্রা করেছেন নতুন পথে। আংশিক ভাবে হলেও আধুনিক জটিল মানসিকতার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ এঁদের কবিতায়। কাব্যের আলঙ্কারিক দিক দিয়েও এঁরা নতুনের স্রষ্টা।

শরৎচন্দ্র মুক্তিবোধ ও বিন্দা করন্দিকর আধুনিক হয়েও জনপ্রিয়। মুক্তিবোধের কবিতা উদ্দীপনাময়ী, করন্দিকর ব্যক্তিকেন্দ্রিক, লীরিকধর্মী।

সাম্প্রতিককালের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি হিশেবে ওয়াই ডি ভাবে, মনমোহন, মঙ্গেশ পাড়গাঁওকর, বসন্ত বাপট, ওমর শেখ প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

কথাসাহিত্য

মারাঠীতে উপন্যাসকে বলা হয়ে থাকে 'কাদম্বরী'। বলা বাহুল্য, বাণভট্টের কাদম্বরীকে উপন্যাসের আদর্শ মনে করার দরুনই এই নামকরণ একদা হয়েছিল।

মারাঠী সাহিত্যে উপন্যাসের স্রষ্টা হরিনারায়ণ আপ্টে। এবং, সেক্ষেত্রে আজো তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'মী' (আমি) বা ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গড় আলা পণ সিংহ গেলা' ('সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে পড়ে আছে শুধু গড়')-র জনপ্রিয়তা এখনো অসাধারণ। আপ্টে-পরবর্তী জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক এন এস ফাড়কে ও ভি এস খাণ্ডেকর।

শুধু বাংলা থেকে অনুবাদ নয়, বাংলার পটভূমিতে গল্প-উপন্যাস-নাটকও মারাঠীতে কম রচিত হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে এস আর বিওয়ালকরের 'সুনীতা'র নাম করা যায়। প্রাক-বিভাগ বাংলার হিন্দু মুসলমান সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে বইটি রচিত। রাজনৈতিক উপন্যাসে সানে গুরুজী, আঞ্চলিক উপন্যাসে এস এন পেঁড়সে, সদানন্দ রেগে, বামন চরখরে, রঞ্জিত দেশাই ও শান্তারাম এবং মননশীল উপন্যাসে মার্ধেকর ও বসন্ত কানেকর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পেঁড়সের 'গরম্বীচা বাপু', 'এলগার' ও 'হার্দাপার'-এ হার্ডির প্রভাব স্পষ্ট হলেও উপন্যাস হিশেবে মোটামুটি সার্থক। পনের কুড়ি বছর আগে শ্রীমতী বিভাবরী শিরুরকর নারী আন্দোলনের পটভূমিকায় কয়েকটি গল্প লিখে বিরল খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছিলেন। দীর্ঘকালের বিরতির পর 'বলী' নিয়ে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। অপরাধপ্রবণ উপজাতি এলাকার পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। লেখিকা মানবধর্মী ও বাস্তবনিষ্ঠ। কিন্তু 'বলী'র মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল—দ্বিতীয় উপন্যাস 'জাঙ্গ'-তে তা অনুপস্থিত। কুসুমাগ্রজ কবি হিশেবে যতখানি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, উপন্যাসে তার এক-পঞ্চমাংশও দিতে পারেননি।

বর্তমানে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। নাগরিক উপন্যাস রচনার ব্যর্থতা থেকেই, মনে হয়, এর উৎপত্তি। অপরিচিত বিষয়বস্তু, অপরিচিত পরিবেশ ও অপরিচিত চরিত্র আমদানি করে নতুনত্ব

সৃষ্টির প্রয়াস। শুধুই প্রয়াস, তার বেশি নয়—মারাঠী কথাসাহিত্যে নাটক ও ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস এখনো অনেক পিছিয়ে। সত্যিকারের আধুনিক উপন্যাসের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। খ্যাতনামা সমালোচক এম ভি রাজাধ্যক্ষ এক প্রবন্ধে বলেছেন—Oddly enough, the novel has nothing to compare with the new surge in the short story. With a few exceptions it is still content with the superficial realism, which for a long time has been lulling the reader into the belief that he was getting a closer view of life when he was merely being helped to forget it.······the juvenile boy-meets-girl story, repeated by writer after writer with only insignificant variations of setting, still holds the ground, particularly in the Marathi novel. অধিকন্তু······ An occassional translation of Premchand or Krishan Chander or Ramanlal Desai apart, fiction in the other Indian languages has been generally neglected by the Marathi translators.

'গোষ্ট'র অর্থাৎ মারাঠী ছোটগল্পর জন্ম নিতান্তই আধুনিককালে, কিন্তু এরি মধ্যে এই বিভাগটি উপন্যাসের তুলনায় অনেকগুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণগুলি উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই পরিস্ফুট। আঙ্গিকের দিক দিয়েও ছোটগল্পে দক্ষতার পরিচয় স্পষ্টতর। ফাড়কে, বোকিল, গঙ্গাধর গাড়গিল, পি বি ভাবে, অরবিন্দ গোখলে, বেঙ্কটেশ মাড়গুলকর, শ্রীমতী কুসুমাবতী দেশপাণ্ডে, কুসুমাগ্রজ, অনন্ত কানেকর, আর বি জোশী, এস জে জোশী, এস এম মাটে, সি ওয়াই মারাঠে, রঙ্গনেকর, আন্নাভাই সাঠে প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গাড়গিল, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সাঠে।

মারাঠী নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবময়। সিনেমার দুর্বার অভিযানও রঙ্গমঞ্চকে প্রাণে মারতে পারেনি। বছর দশেক আগে মারাঠী রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারা মহারাষ্ট্র যেভাবে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল, তাতেই বোঝা যায় জনজীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যোগাযোগ আজো কতখানি অন্তরঙ্গ। প্রত্যেকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে রঙ্গমঞ্চ। লোকনাট্য-সংস্কৃতির মহান অবদানগুলি আত্মস্থ করতে পেরেছে বলেই আধুনিক মারাঠী নাট্য-সাহিত্যের এই অসাধারণ সমৃদ্ধি।

আধুনিক নাটকের জনক দেবল। সমাজ-সংস্কারই এঁর নাটকের বিঘোষিত উদ্দেশ্য, কিন্তু সাহিত্যমূল্যও সেগুলির যথেষ্ট। তাই দেবলের নাটক এখনো সগৌরবে অভিনীত ও সমাদরে পঠিত হয়ে থাকে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার প্রতিবাদে লিখিত এঁর 'শারদা'র জনপ্রিয়তা আজো অব্যাহত। দেবলের পরবর্তী কৃতি নাট্যকার এন সি কেলকর ও কে পি খাদিলকর। গোবিন্দাগ্রজ কবি হিশেবে খ্যাতিমান হলেও নাটকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাঠামো বজায় রেখেও যে যুগোপযোগী নাটক রচনা সম্ভব—সেটা প্রথম প্রমাণ করে খাদিলকর। প্রসঙ্গক্রমে এঁর 'কীচক বধ'-এর উল্লেখ করা যায়। কাহিনী পৌরাণিক। কিন্তু বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেরও বুঝতে বাকি থাকেনি যে এই কীচক আর কেউ নয়—তদানীন্তন কুখ্যাত গবর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জন। চরম দুঃসাহসের সঙ্গে কার্জনের দুর্নীতি ও ভণ্ডামিকে এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে নগ্নভাবে। উপসংহারে দেখা যায়—ভীম বাল গঙ্গাধর তিলক কার্জন কীচককে বধ করেছেন! মারাঠী সাহিত্যে যখন সংস্কারবাদী ভাবধারার প্রাবল্য, তখন এই নাটকটি রচিত। সরকার অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে 'কীচক বধ' বাজেয়াপ্ত করেন। 'কীচক বধ'-এর মত এমন অসংখ্য নাটকের নাম করা চলে যেগুলিতে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে প্রগতিশীল ভাবধারা পরিবেশন করা হয়েছে। বৃটিশ আমলে যে বিয়াল্লিশটি নাটক বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে তার প্রায় সবগুলিই হয় ঐতিহাসিক নয় পৌরাণিক।

বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বি ভি ওয়ারেরকর—মামা ওয়ারেরকর নামে যিনি সর্বজনপরিচিত। সত্তর বছর পেরিয়ে গেছেন, এখনো অক্লান্তলেখনী। গ্রন্থসংখ্যা প্রায় দেড়শ। সৃষ্টিধর্মী নাট্যকার ও প্রায় কুড়িটি উপন্যাসের রচয়িতা হওয়া সত্বেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মারাঠীতে অনুবাদ করেছেন ইনিই। এবং বাঙালি শরৎচন্দ্রকেই শুধু মারাঠী পাঠক সাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেননি, বাংলার পটভূমিকায় একাধিক নাটকও রচনা করেছেন। বাঙালি সমাজের বলি কুমারী স্নেহলতার আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত হয়ে পণপ্রথার বিরুদ্ধে মারাঠী ভাষায় প্রথম নাটক

রচনা করেন মামা ওয়ারেরকর—'হাচ মুলাচা বাপ।' কিছুকাল আগেও ওঁর যে-নাটকটি রঙ্গমঞ্চে আলোড়ন এনেছে—'পুর্‌ব্‌ বাঙ্গাল্‌'—তাও ছেচল্লিশের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এক বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখা। সংস্কারবাদী লেখক মামা ওয়ারেরকর, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশিত সমাধান গ্রহণযোগ্যও নয়—যেমন শ্রমিক-মালিক সমস্যা নিয়ে রচিত 'সোন্যাচা কালাস'—তবু বর্তমান নাট্যকারদের পুরোভাগে এঁর আসন। নাট্যকারের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইনি সচেতন, প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

পি কে আত্রে, এম জি রঙ্গনেকর ও নানা জোগ—অন্যান্য কৃতি নাট্যকার। আত্রে শ'-ইবসেনের অনুসরণে নাটক রচনা করে চতুর্থ দশকে অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইনি শস্তা প্রহসনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিণত হয় নিছক ভাঁড়ামিতে। রঙ্গনেকর নিজে মঞ্চমালিক ('নাট্যনিকেতন') ও জনপ্রিয় নাট্যকার। নানা জোগের নাটকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ইনি। প্রসঙ্গক্রমে সরকারি দুর্নীতিকে উপজীব্য করে লেখা এঁর 'সোন্যাচে দেব'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছাড়া শ্রীমতী মুক্তাবাঈ দীক্ষিত, কুসুমাগ্রজ ও পি এল দেশপাণ্ডেও সাম্প্রতিককালে নাটক রচনায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মৌলিক নাটক রচনার সঙ্গে বিদেশি নাটকের অনুবাদও চলেছে। সেক্ষেত্র অনন্ত কানেকর, মাধব মনোহর, কুসুমাগ্রজ, পি এল দেশপাণ্ডে প্রমুখের নাম করা যায়।

অন্যান্য

মারাঠী সাহিত্যে তিলকের অসামান্য অবদান তাঁর 'গীতা-রহস্য'। শুধু মারাঠী কেন, সারা ভারতে তিলকই প্রথম গীতার যুগোপযোগী ভাষ্য করেন। গীতাকে আগে নিছক ধর্মগ্রন্থ হিশেবে মনে করা হত, তিলকই প্রথম দেখালেন—ভক্তিযোগ নয়, কর্মযোগই গীতার মূল প্রতিপাদ্য। সুদূর মান্দালয়ে কারাবাসকালে গ্রন্থটি তিনি প্রণয়ন করেন। 'কেশরী'র সম্পাদক হিশেবে তিলক এমন বহু প্রবন্ধ লেখেন যেগুলি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলে পরিগণিত। কিন্তু আপসোস এই, তিলকের সাহিত্যিক পরিচয় মহারাষ্ট্রের বাইরে প্রায় অজ্ঞাত। এস এম পরাঞ্জপে

তিলকের অনুগামী সাংবাদিক ও শক্তিমান সাহিত্যিক। প্রাবন্ধিক হিশেবে এঁর জনপ্রিয়তা এক সময় তিলককেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। আধুনিক মারাঠী ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-প্রণেতা ডি পি তারখড়। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ভি কে রাজওয়াড়ে। পরবর্তীকালে ভাবে, সরদেশাই প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। ডাঃ কেটকর সমালোচক ও ঔপন্যাসিক হিশেবে পরিচিত হলেও 'জ্ঞানকোষ'-ই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। মারাঠী সাহিত্যের প্রথম বিশ্বকোষ হিশেবে বইটিকে অভিহিত করা চলে। এন সি কেলকর, ডি কে কেলকর, আর এস জোগ, এম ডি আলটেকর, বি এস মার্ধেকর, ডবলু এল কুলকরনি ও ডি কে বেডেকর শক্তিমান সমালোচক। প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে নন্দপুরকর, এন আর পাঠক, ডাঃ হর্শে, সুনথানকর ও প্রিয়লকর এবং জীবনীসাহিত্যে এস এল করন্দিকর, প্রিয়লকর, এস চিত্র শাস্ত্রী ও পি পি গোখলে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শঙ্কররাও দেও শুধু খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা নন, শক্তিমান গদ্যলেখকও। হু স্থং-এর ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তের সার্থক অনুবাদের জন্যে ইনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কাকা কালেলকর প্রধানত গুজরাতীতে লিখলেও মারাঠী সাহিত্যেও এঁর দান রয়েছে। বিশেষ করে হৃদয়গ্রাহী ভ্রমণ-কাহিনী রচনায়।

পরিশিষ্ট

॥ ক ॥

ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা

ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখাটা, সন্দেহ নেই, কবিজনোচিত অতিশয়োক্তি। তবে এ-ও সত্যি—ইংরেজি চোখ দিয়েই এ-যুগে আমরা নিজেদের দেখেছি, চিনেছি; ইংরেজ-বিতাড়নের মন্ত্র নিয়েছি ইংরেজিরই মারফৎ। ভারতের নবজাগৃতিতে ইংরেজির ভূমিকা তাই অনন্য। অতএব ইংরেজেরও নগণ্য না। যদিচ, এই নবজাগৃতি ভারতে ইংরেজ-শাসনের পুরস্কার নয়, 'বাই-প্রোডাক্ট'।

ইংরেজির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বা পরোক্ষ প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ। ইংরেজির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই দিকপাল লেখকরা সাহিত্যে নবযুগের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন, এবং, বলতে-কি, 'ভারতবর্ষের সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'।

আবার, ইংরেজিকে সাহিত্য-মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেছেন এমন লেখকের সংখ্যাও—সে-যুগে ও এ-যুগে—কম নয়। হয়ত ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে তাঁদের অধিকাংশেরই তুলনা চলে না, কিন্তু এমন কজন ইংরেজ লেখকই বা পাওয়া যাবে যাঁরা কোন ভারতীয় ভাষায় স্মরণীয় সাহিত্য রচনা করেছেন? বাংলা ভাষার উন্নতি বিধানে মিশনারিদের দান প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁরাই নাকি আমাদের নতুন করে বাংলা শিখিয়েছেন! কিন্তু, 'ঈশ্বর জগৎকে এমত প্রেম করিলেন যে তাঁহার একজাত পুত্রকে দান করিলেন' বা 'পাপের বেতন মৃত্যু'র হাত থেকে মিশনারি বাংলা আজো এগোতে পারেনি। মাইকেলের প্রতি বেথুন সাহেবের এবং সরোজিনী নাইডুর উদ্দেশে এর স্যর এডমণ্ড গস-এর উপদেশের ("...to write no more about robins and skylarks...but to describe the flowers, the fruits, the trees, to set her poems firmly among the mountains, the gardens, the temples, to introduce to us the vivid populations of her own voluptuous and unfamiliar province...to be a genuine Indian

poet of the Deccan, not a clever machine-made imitator of the English classics.") যথাযথ মর্যাদা দিয়েও আজ একথা মুখ ফুটে বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী, অরবিন্দ, জওহরলাল, রাধাকৃষ্ণণের মত ইংরেজি পদ্য ও গদ্যলেখক ইংলণ্ডেও ভূরি ভূরি জন্মায়নি, জন্মায় না। ভারতীয় জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি যে আজ বিশ্বজনের পরিচিত হয়েছে, এর জন্যে ভারতীয়-ইংরেজি কবি-কথাশিল্পীদের দান বড় কম নয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহির্ভারতে হৈচৈ-এর অন্ত নেই—অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরিত রচনার পরিমাণ মূলের তুলনায় কতই-না অকিঞ্চিৎকর! 'গীতাঞ্জলির'-র অনুবাদ তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল—'গীতাঞ্জলি' আর-যাই-হোক রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। তবু, ভাগ্যিশ 'গীতাঞ্জলি' কবিগুরু করেছিলেন অনুবাদ!

ইংরেজিতে লিখলে, বা ইংরেজিতে নিজেদের বই অনুবাদের ব্যবস্থা করলে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাদেশের আরো অন্তত পাঁচজন কথাশিল্পী নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন—সাম্প্রতিককালের পুরস্কার-বিজয়ীদের দিকে দৃকপাত করে অনায়াসে এ-ঘোষণা করা যায়।

ভারতীয়-ইংরেজি লেখকদের বিরুদ্ধে প্রধানত চারটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে। প্রথমত: ইংরেজি কোন ভারতীয়ের মাতৃভাষা নয়। মাতৃভাষার সম্মান নিশ্চয় সকলের আগে। কিন্তু মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশে অক্ষম কিম্বা সক্ষম হলেও কোন লেখক যদি বিদেশি মাধ্যম গ্রহণ করেও সফল হন তো অভিযোগের কী কারণ? ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করে বিখ্যাত এমন বহু অ-ইংরেজ ও অ-ভারতীয় শক্তিমান লেখকের পরিচয় কি আমরা পাইনি, না তাঁদের লেখার সমাদর আমরা করিনে? অবিশ্যি মাইকেলদের ক্ষেত্রে এ-অভিযোগ শিরোধার্য। মাইকেল ইংরেজিতে লিখলে ইংরেজি সাহিত্য যত-না সমৃদ্ধ হত, বেচারি বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হত তার অনেক-বেশি। দ্বিতীয় অভিযোগ: এই লেখকরা একান্তভাবে পাশ্চাত্য থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকেন, যেটা অস্বাভাবিক। আসলে কিন্তু এটা অভিযোগ নয়—অজুহাত। কেননা আধুনিক যুগের জন্মই তো পাশ্চাত্যের ঔরসে। এবং, যে-জাতীয়তাবোধ এই অজুহাত দেয়—তারো। প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক লেখক যদি জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকেন, ইংরেজিতে

লিখেছেন বলেই ইংরেজ না বনে যান, আপত্তি তাহলে ওঠা অনুচিত। তবে হ্যাঁ, ভারতীয় কবি যদি তাঁর ইংরেজি কবিতায় ইংলণ্ডের ঋতু বর্ণনা করেন, হ্রদ-অঞ্চলের চিত্র আঁকেন, স্কাইলার্কের গান শোনান—অবশ্যই তা আপত্তিজনক। তবে কিনা, বাংলা কাব্যেও তো আমরা বিসুভিয়স, নায়গ্রা, ঈগলের দর্শন পাই—তখন কি তত জোরালো আপত্তি জানাই? এমন-কি, শিশুদের যখন বাংলা লেখাতে মুখস্থ করাই 'ঈগল পাখি পাছে ধরে'—একবারো কি ভাবি যে পাখিটা একেবারে সাহেব? এদেশে তার কোনই অস্তিত্ব নেই? তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযোগ অঙ্গাঙ্গি: এঁদের ধ্যানধারনা ও পটভূমিকা সীমাবদ্ধ, সমগ্র দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। ফলত এঁদের রচনার আবেদনও গণ্ডিবদ্ধ, জনসাধারণের বৃহদংশ বঞ্চিত তার রসগ্রহণে। এ-অভিযোগ যথার্থ। কিন্তু, এঁদের প্রতিই কি এটা শুধু প্রযোজ্য? মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের —যেমন ধরা যাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের—আবেদনও কি, তুলনায় কম হলেও, গণ্ডিবদ্ধ নয়? জনসাধারণের বৃহদংশ তার রসগ্রহণে বঞ্চিত নয়? এই লেখকরাই কি সমগ্র দেশের প্রতিনিধিস্থানীয়? আসলে, শ্রেণীবিভক্ত এবং ঔপনিবেশিক সমাজে শিক্ষার ভয়াবহ অনগ্রসরতা ও খাপছাড়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উৎকট পরিমাণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাহিত্যিকমানসের এক বিজাতীয় ব্যবধান এ-যুগে গড়ে উঠেছে। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতার তুলনায় বাংলা কবিতা জনপ্রিয় যদিচ, কিন্তু সব কবিতা সর্বজনপ্রিয় নয়। রবীন্দ্রনাথই কি আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয়? ভাষার মাধ্যমটাই এক্ষেত্রে চরম-পরম কথা নয়।

ভারতীয়-ইংরেজি লেখকরা যদি মাতৃভাষায় লিখতেন, আমরা আরও খুশি হতাম। খুশি হতাম শুধু এই কারণে যে, মাতৃভাষা ও সাহিত্য তাতে অধিকতর সমৃদ্ধ হত। শেক্সপীয়র জার্মানে লিখলে ইংরেজি সাহিত্যের দুর্দশার অবধি থাকত না সত্যি, তবে গ্যেটেকে এখন আমরা যেমন সমাদর করি, শেক্সপীয়রকেও তা করতাম। সার্থক সাহিত্যের সমাদর ভাষা-দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। যুগের ফসল হয়েও সে সর্বজনীন, সর্বকালীন—তার বিশিষ্ট জাতীয় চেহারা ও চারিত্র্য সত্ত্বেও। যত দিন যাবে এ-সত্য আমরা তত বেশি বুঝব। যত বেশি বুঝব উপকৃত তত বেশি হব।

॥ ২ ॥

ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার শুরুতে ইঙ্গ-ভারতীয় কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। কেননা ভারতীয়রা ইংরেজিতে সাহিত্যরচনার আগেই একাধিক ইংরেজ ভারতের পটভূমিকায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আর, তাঁদেরই কাছে ভারতীয় লেখকদের হাতেখড়ি।

১৭৮৩ সালকে ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের জন্মকাল হিশেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ঐ বছরই বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ কবি স্যর উইলিয়ম জোন্সের ভারতে পদার্পণ ঘটে। তখনো ভারতে ইংরেজি সাহিত্য বলতে কিছু সৃষ্টি হয়নি, সাংবাদিকতাও না—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' সবে বেরিয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হয়ে জোন্স্ তো এদেশে এলেন, এসে শুরু করে দিলেন বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গভীর গবেষণা। ইংলণ্ডে থাকতেই পুথিপত্র মারফৎ জোন্স্ সাহেব প্রাচ্যের এক মুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, ভারতে আসার আগেই ভারত নিয়ে গুটিকয়েক কবিতাও লিখেছিলেন। এদেশে এসে তিনি *The Enchanted Fruit, Hindu wife* ইত্যাদি বিখ্যাত মৌলিক কবিতা ছাড়াও সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী থেকে বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বিশেষ করে এঁর শকুন্তলার অনুবাদ—*Sakuntala or the Fatal Ring*—সমধিক উল্লেখযোগ্য। কামদেব, প্রকৃতিদেবী, ইন্দ্র, সূর্য, লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীকে উদ্দেশ করে রচিত জোন্সের কবিতাগুলি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। যেমন নারায়ণকে উদ্দেশ করে কবি বলেছেন:

> Sprit of Spirits, who through every part
> Of space extended and of endle:s time,
> Beyond the stretch of lab'ring thought sublime
> Bad'st uproar into beauteous order start
> Befcre heaven was, thou art.

জোন্সের লক্ষ্মী-বন্দনা:

> Daughter of ocean and primeval Night,
> Who fed with moonbeams dropping silverd dew

And cradled in a wild wave dancing light
Saw'st with a smile new shores and creatures new.

অবিশ্যি কবির চেয়ে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ও ভাষাতাত্ত্বিক হিশেবেই জোন্‌স্‌ বেশি পরিচিত। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে এঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও যথেষ্ট।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ইঙ্গ-ভারতীয় কবি জন লেডেন ভারতে আসেন ১৮০৩ সালে। ভাষাতাত্ত্বিক ইনিও, তবে জোন্‌সের চেয়ে অধিকতর কবিত্বশক্তির অধিকারী। *Ode on leaving Velore Dirge of the Depaxted Year, Christmas in Penang* ও *Ode to an Indian Gold coin*-এ এঁর কাব্যশক্তির পরিচয় স্পষ্ট। বিশেষ করে শেষোক্ত কবিতাটির মধ্যে যে করুণ আর্তি ফুটে উঠেছে—মর্মস্পর্শী! একটি ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার দিকে তাকিয়ে কবির মনে পড়ছে : এরি জন্যে—নিছক জীবিকার প্রয়োজনে—জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে তিনি এসেছেন এই নাজানা দেশে! ভাবতে ভাবতে গুমরে ওঠে কবিহৃদয় :

From love, from friendship, country, torn,
To memory's fond regrets a prey
Vile slave, thy yellow dross I scorn;
Go, mix thee with thy kindred clay!

এরপরের শক্তিমান কবি হিশেবে স্যর এডউইন আর্নল্ড, রুডিয়ার্ড কিপলিং, পাদ্রী হেবার, হেনরী ডিরোজিও, হেনরী মেরিডিথ পার্কার, ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন, স্যর আলফ্রেড লায়াল প্রমুখের নাম স্মরণীয়। 'লাইট অব এশিয়া'র কবি আর্নল্ড এবং লায়াল ছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মৈত্রীর উপাসক, কিপলিং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চারণ—সকলেই জানেন।

গার্হস্থ্য প্রেমের কবিতায় অতুলনীয় পাদ্রী হেবার। স্ত্রীপুত্রের উদ্দেশে রচিত একটি কবিতায় প্রবাসী কবির বিরহবেদনার করুণ কাকুতি :

If thou wert by my side, my love,
How fast would evening fall
In green Bengala's palmy grove,
Listing the nightingale !·········

উপসংহারে

> I miss thee when by Gunga's stream
> My twilight steps I guide ;
> But most beneath the lamp's pale beam
> I miss thee from my side·········

শেষ পর্যন্ত কর্তব্যসম্পাদনের মধ্যে দিয়ে কবি সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করেন। এদেশেই পাদ্রী সাহেবের মৃত্যু হয়, জীবনে স্ত্রীপুত্রের দেখা আর তিনি পাননি!

রিচার্ডসনের *Consolations of Exile, A British Indian Exile to his distant Children, Home visions* ইত্যাদি কবিতার নামও উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে। এদেশে থেকেও মন এঁদের পড়ে রয়েছে স্বদেশে, থাকাই স্বাভাবিক। আবার, ক্যাম্পবেলের মত কেউ কেউ এদেশ থেকে বিদায় নেবার সময় সজল কণ্ঠে বলেছেন—The friends I leave, the friends I love, I ne'er may see again !······I love this Eastern shore.

মহাভারতের কাহিনী নিয়ে সার্থক কাব্য রচনা করেছেন পার্কার—*The Draught of Immortality.* ডিরোজিও শুধু তৎকালীন নব্য বাংলার গুরু নন, শক্তিশালী কবিও। এঁর কাহিনী-কবিতা *Fakir of Fungheera*-য় আবেগের গভীরতা বা কল্পনার বিশালতা তেমন না থাকলেও ভাষা ও ছন্দের ওপর কবির অসামান্য দখলের স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট। এবং, এক হিশেবে ডিরোজিওকে ভারতের অন্যতম প্রথম জাতীয়তাবাদী কবিও বলা চলে। একাধিক দেশপ্রেমমূলক কবিতার রচয়িতা ইনি। *Fakir of Fungheera*-র ভূমিকায় বর্তমান ভারতের দুর্দশার জন্যে কবির হাহাকার:

> My country, in thy day of glory past
> A beauteous halo circled round thy brow,
> And worshipped as a deity thou wast,
> Where is that glory, where that reverence now ?·······
> Well, let me dive into depths of time,
> And bring from out the ages that have rolled

A few small fragments of the wrecks sublime
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country, one kind word for thee.

রো কারো মতে : কীটসের অকাল বিয়োগে ইংরেজি সাহিত্যের যে-ক্ষতি ডিরোজিওর অকাল বিয়োগে সেই ক্ষতি হয়েছে ইঙ্গ-ভারতীয় ত্যর।

শ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত বারবার বিদ্রোহ করেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে সশস্ত্র কিসান ান—সে-ইতিহাস আজো অলিখিত। কিন্তু এ-সময়কার ইঙ্গ-য় কবিদের কবিতাবলীতে শোষক-শোষিতের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও র মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের কুড়ি বছর ই বেনামে বাংলাদেশের জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ান '*India*' শীর্ষক ায় লিখেছিলেন :

Oh ! horrors ! horrors ! wherefore will ye rise
In dark distinctness on my shrinkining eyes ?
The time when wide-leagued massacre shall creep
In smiling hatred on the British sleep !

সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে বহু কবিতা ও উপন্যাস রচিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গি ও ্য যাই হোক, ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের সে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। কবিতার চার্লস আর্থার কেলির *Delhi and other Poems* কাব্যগ্রন্থটির নাম শেষ উল্লেখযোগ্য।

ইঙ্গ-ভারতীয় রচনাবলী সম্পর্কে এদেশের পাঠক-সমাজের কোন কৌতূহল থাকলেও, তাই সেসব গ্রন্থ অধুনা অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলেও শে কিন্তু ওঁরা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ সালের Le Bas Essay Prize-এর উদ্দেশ্য ছিল—An appreciation the Chief Productions of Anglo-Indian Literature in the main of Fiction, Poetry, the Drama, Satire and Belles-Lettres ing the Eighteenth and Nineteenth centuries.

॥ ৩ ॥

১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিআম বেন্টিঙ্ক ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করলেন। মেকলের প্রস্তাব ছিল: প্রথমে নির্বাচিত কয়েকজনকে শিক্ষা দেওয়া হবে, শিক্ষা শেষে গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাঁরা নতুন শিক্ষার আলো বিতরণ করবেন। এইভাবে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে তামাম দেশ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এর আগেই অবিশ্যি বেসরকারিভাবে কয়েকজন বাঙালি ইংরেজি শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। ডেভিড হেআর ও এডওআর্ড হাইড্ ঈস্টের সহযোগিতায় ভারতপুরুষ রামমোহন ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন, তারই ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ। মেকলের বাহাদুরি সুযোগের সদ্ব্যবহার, বেন্টিঙ্ককে বশীকরণ।

মেকলের স্বপ্ন, বলাই বাহুল্য, সফল হয়নি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা গ্রামে গ্রামে যাওয়া দূরস্থান ভারতীয় সমাজ থেকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ম্ভু এক সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তোলেন। রাধাকৃষ্ণাণের ভাষায় তাঁদের কণ্ঠস্বর পরিণত হল—"an echo, his life a quotation, his soul a brain and his free spirit a slave to things".

কিন্তু, এটা সত্যের একদিক—অন্ধকার দিক। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির ফলে ভারতের ভাবজগতে প্রায়-বৈপ্লবিক এক যুগান্তর ঘটে গেল। কোন বিপ্লবেরই আশু ফল ভালো হয় না, এরও হয়নি। পরবর্তী যুগে হয়েছে। ভারতের নবজাগৃতির পটভূমি নির্মাণ করেছে এই ভাববিপ্লব।

ভারতের নবজাগৃতির পীঠস্থান বাংলা। শুধু ভারতের নয়—"...we can safely assert that she is the only country in the Orient which has shown any distinct indication of being thrilled by the voice of Europe as it came to her through literature....while there are other eastern countries captivated by the sight of the immense power and prosperity which Europe presented to us, Bengal has been stirred by the force of new ideas breaking

upon her from the western horizon" এই উধৃতি রবীন্দ্রনাথ থেকে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রদূত যেমন বাংলা, ভারতীয়-ইংরেজি সাহিত্যের স্রষ্টাও তেমনি বাঙালি।

বেন্টিঙ্কের নতুন শিক্ষানীতি যখন প্রবর্তিত হয়, ইংরেজি সাহিত্যে তখন রোমান্টিক কাব্য-পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের যুগ। এ এক মণিকাঞ্চন যোগাযোগ। ভারতীয়, মানে বাঙালি, লেখকরা শুধু যে পরোক্ষভাবে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন তাই নয়, প্রত্যক্ষভাবে কয়েকজন ইংরেজ লেখকের সংস্পর্শে আসারও সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল। ইতিপূর্বেই নাম তাঁদের উল্লিখিত। ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বাঙালি লেখকরা ইংরেজিতে কাব্য সাধনা শুরু করেন।

অবিশ্যি কবিতা রচনা সে-সময় অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার—এঁদের প্রয়াস সাংবাদিকতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

॥ ৪ ॥

বেন্টিঙ্কের নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হওয়ার আগেই কাশীপ্রসাদ ঘোষের *'Minstrel'* প্রকাশিত হয়—১৮৩০ সালে। রাজনারায়ণ দত্তর *Osmyn*-এর প্রকাশকাল ১৮৪১ সাল। এবং ১৮৪৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে মাইকেলের বহু-আলোচিত *The Captive Ladie.* এই বইগুলির সাহিত্যমূল্য বিচারের আগে যুগের ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখা দরকার। এবং, আজকের পাঠকের কাছে এ-সব বইয়ের তেমন-কোন আবেদন না থাকলেও সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালি সমাজে লেখকত্রয়, বিশেষ করে মাইকেল, প্রবল আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৭০ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত *The Dutt Family Album.* গভিন্ চন্দ্র্ (Govin Chunder), হর্ চন্দ্র্ (Hur Chunder), ওমেশ চন্দ্র্ (Omesh Chunder) ও Greece Chunder (মাপ করবেন, এর বাংলা উচ্চারণ জানিনে)—একই পরিবারভুক্ত চারজনের কবিতার সংকলন এই গ্রন্থ। ভূমিকায় সবিনয়ে নিবেদন করা হয়েছে: কবিরা কেউই ইংলণ্ডে কোনদিন যাননি, দেশে বসে ইংরেজি শিখে কবিতা লিখেছেন

ইংরেজিতে—রসিকজন সমালোচনার আগে যেন একথাটা মনে রাখেন দয়া করে।

বইয়ের মোট একশ সাতানব্বুইটি কবিতার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় কবি রচিত কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ছেষট্টি ও ছিয়াত্তর। হর্ চন্দ্রের কবিতা সংখ্যায় কম হলেও ইংরেজিতে কাব্য রচনা তিনি শুরু করেন *Album*-এ অন্তর্ভুক্ত বাকি কবিদের আগে—১৮৫১ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ***Fugitive Pieces*** প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। ঐতিহাসিক কাহিনী ও উপকথা, দেবদেবী, প্রকৃতি-বর্ণনা এবং হিন্দু ও খৃশ্চান ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা ছন্দে রচিত কবিতা *Album*-এ সংকলিত।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উপরোক্ত কাউকেই ভারতীয় কবি বলা যায় না। বিলেতে না গেলেও এঁরা ছিলেন মনে-প্রাণে সাহেব, ভারতকে দেখেছেন ইংরেজের চোখ দিয়ে—অন্তত দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন প্রাণপণ। ফলে, এঁদের কবিতা না ভারতীয় না ইংরেজ কারোই মনোহরণ করতে পারেনি। ভারতীয় মন, দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারনার স্বাক্ষর অনুপস্থিত এঁদের কবিতায়। তথ্যাভিজ্ঞ বিশিষ্ট সমালোচক ও শিক্ষাবিদ টি ও ডি ডান বলেছেন; when Kasiprosed Ghose addresses *Saraswati* in this manner—

> Goddess of every mental grace,
> And virtue of the soul,
> Which high exalt the human race,
> And lead to glory's goal,
>
> 'Tis thou who bid'st the infant mind,
> Its growing thoughts display,
> Which lay within it undefined
> In regular array.

—he is merely re-echoing the jingle of such 18th century rhymesters as William Hayley, and fails utterly to reproduce the atmosphere of his own faith.

আর, যদিই-বা দু'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে—যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষেরই *To a Young Hindu Widow*—সেটা কবিতা হয়ে ওঠেনি, বড়

জোর তাকে ছন্দোবদ্ধ বিবৃতি বলা চলে। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের এবং এই ধারার অনুসারী নবকিসেন ঘোষ (রাম শর্মা), মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ট্যাগোর প্রমুখের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে মাত্র, তার বেশি নয়। এমন-কি, লায়ালের 'শিব' বা আর্নল্ডের 'দি সঙ অব দি সার্পেন্ট চার্মার'-এ ইংরেজ পাঠক যে নতুন আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন, এঁদের কবিতায় তার ভগ্নাংশও পাননি।

ইংরেজিতে প্রথম যিনি সার্থক কাব্য রচনা করেন তাঁর নাম তরু দত্ত। ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের স্রষ্টা তরু দত্ত।

॥ ৫ ॥

সাল আঠারো শো ছিয়াত্তর। লণ্ডনের বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকা 'দি একজামিনার'-এর অফিশে বসে সমালোচক স্যর এডমণ্ড গস সম্পাদক উইলিআম মিণ্টোর কাছে আপসোস করছেন: আজকাল আর নতুন এবং ভালো কবিতার বই একদম চোখে পড়ে না। আশ্চর্য! কবিরা যেন সবাই ফুরিয়ে গেছে, বুড়িয়ে গিয়েছে! কী-যে দুর্দিন এল!

এমন সময় পিওনের প্রবেশ। নানা চিঠিপত্রের সঙ্গে কমলারঙের প্যাকেটে মোড়া একটি বইও সে হস্তান্তর করল।

সম্পাদক মশাই সাগ্রহে প্যাকেটটা আগে তুলে নিলেন। অবাক হয়ে দেখলেন—প্রেরকের নামের জায়গায় মুদ্রিত: *"Saptahik Sambad Press, Bhowanipore, Calcutta"*.

প্যাকেট ছিঁড়ে আরও তাজ্জব—অদৃষ্ট-পূর্ব প্রচ্ছদ, অশ্রুত-পূর্ব লেখকের নাম—Taru Dutta, Aru Dutta. তাড়াতাড়ি তিনি বইটি এগিয়ে দিলেন সমালোচক বন্ধুর দিকে।

সমালোচক বই খুললেন নিছক কৌতূহলবশে:

Still barred thy doors !—The far east glows,
The morning wind blows fresh and free,
Should not the hour that wakes the rose
Awaken also thee ?

No longer sleep,
Oh, listen now !
I wait and weep,
But where art thou ?

All look for thee, Love, Light and Song ;
Light, in the sky deep red above,
Song, in the lark of pinion strong,
And in my heart, true Love,
No longer sleep,
Oh, listen now !
I wait and weep
But where art thou ?

সমালোচক মুগ্ধ, স্তম্ভিত। ভিক্তর হুগোর 'মর্নিং সেরিনাড'-এর এ কী অনির্বাচনীয় অনুবাদ ! অনুবাদ করেছে কে ? তরু দত্ত। কে এই তরু দত্ত ?

বইয়ের নাম *A Sheaf Gleaned in French Fields*. মূল ফরাসি থেকে প্রায় সত্তর-আশিজন কবির বিখ্যাত কবিতাবলীর অনুবাদ। তার মধ্যে হুগোর কবিতা তিরিশটি। মূলের রস ক্ষুণ্ণ হয়নি বিন্দুমাত্র। অসাধারণ কবিপ্রতিভার অধিকারী না হলে এমন শিল্পসার্থক অনুবাদ অসম্ভব। অপ্রিয় সত্যভাষণে সিদ্ধবাক সমালোচক গস লিখলেন—

"If modern French literature were entirely lost, it might not be found impossible to reconstruct a great number of poems from this Indian version.······her book··· ··is an important landmark in the history of the progress of culture."

বইটিতে শুধু তরু নয়, তাঁর বোন অরুরও আটটি কবিতা ছিল। এবং, ওপরে উধৃত কবিতাংশের অনুবাদিকা তরু নন, অরু। গস ভুল করেছিলেন, ভুলটা প্রথম চোখে পড়ে ই জে টমসনের।

॥ ৬ ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন ঠাকুরপরিবার, ভারতীয়-ইংরেজি সাহিত্যের তেমনি দত্তপরিবার। গভিন্ চন্দ্রের মেয়ে তরু ও অরু। শোশীচন্দর এবং রোমেশচন্দ্রও (ইংরেজিতে লিখতেন বলেই সম্ভবত দত্তপরিবারের

সকলে নিজেদের নামের বানান-উচ্চারণ পর্যন্ত বদলে ফেলেছিলেন। তবে রোমেশচন্দ্র 'সমাজ', 'সংসার' ইত্যাদির লেখক হিশেবে রমেশচন্দ্র দত্ত নামেও পরিচিত।) একই পরিবারভুক্ত।

তরুর জন্ম ১৮৫৬ সালে। ছেলেবেলা থেকেই দুর্বলস্বাস্থ্য। পরে দত্তপরিবার খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তরুর জন্ম হয়েছিল হিন্দুপরিবারে। হিন্দু পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, স্বভাবতই হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদির প্রতি শৈশব থেকেই অকৃত্রিম একটা অনুরাগ জন্মে গিয়েছিল, গড়ে উঠেছিল নাড়ির সম্পর্ক। পরবর্তীকালে ধর্মান্তর গ্রহণ সত্বেও সে-সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তরুর সমগ্র কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আজীবন তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন। সাবিত্রীর মুখ দিয়ে তরু নিজের কথাই বলেছেন :

I know that in this transient world
All is delusion,—nothing true
I know its shows are mists unfurled
To please and vanish. To renew
Its bubble joys, be magic bound
In Maya's network frail and fair.......

আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় তরুর মন গড়ে ওঠে। এবং সে-শিক্ষা লাভ ঘটেছিল খোদ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে। তবু ভারতীয় ধ্যানধারনাকে তিনি মিথ্যা কুসংস্কার বলে ঘোষণা করেননি। আজকের দিনে তাঁর কথা-কাহিনী যে কিছুটা অবান্তর, অনেকখানি অবাস্তব সেটা বোঝেন, তবু সেজন্যে তিনি লজ্জিত নন। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধের কাছে পরাস্ত তাঁর যুক্তিবাদী মন :

Absurd may be the tale I tell,
Ill-suited to the marching times.
I loved the lips from which it fell.
So let it stand among my rhymes.

বিখ্যাত ফরাসি সমালোচক দার্মেসতেতো (Darmesteter) অল্পকথায় অতি সুন্দর ভাবে তরুর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন : "Hindu by race and tradition, an English woman by education, a French woman at heart, poet in English, prose writer in French, who at the

age of 18 made England acquainted with the poets of France in the rhyme of England, who blended in herself three souls, three traditions, and died at the age of 21 in the full bloom of her talent and on the eve of the awakening of her genius, she presents, in the history of literature, a phenomenon without parallel.

মাত্র তেরো বছর বয়সে তরু বাপ-মার সঙ্গে ইংলণ্ডে যান। লণ্ডন ও প্যারিতে শিক্ষা সমাপনান্তে ১৮৭২ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৭৭ সালে জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু মাত্র একুশ বছরের জীবনে তরু দত্ত যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা অচিন্ত্যনীয়, অবিস্মরণীয়। পূর্বসূরীদের মত ইনি ইংরেজের চোখ দিয়ে ভারতকে দেখেননি, শিল্পবিচারেও এঁর কবিতা অনেক—অনেক বেশি সার্থক।

তরুর ফরাসি উপন্যাস (রোমান্স বলাই সঙ্গত) 'ল জুর্নাল্ দ মাদ্-মোয়াজেল দ্' আর্ভ্যার্' (*Le Journal de Mademoiselle d'Arvers*) ও ইংরেজিতে রচিত মৌলিক কাব্যসংকলন 'এন্‌সিয়েন্ট ব্যালাড্‌স্ এ্যাণ্ড লিজেণ্ড্‌স অব হিন্দুস্তান' (*Ancient Ballads and Legends of Hindustan*) প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে—১৮৭৯ ও ১৮৮২ সালে। শেষোক্ত গ্রন্থের 'সাবিত্রী', 'লক্ষ্মণ', 'ধ্রুব', 'যোগাদ্যা উমা' ইত্যাদি কাহিনী-কবিতা এবং সনেট ও গীতিকবিতাগুলি দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে অভিনব, আলঙ্কারিক বিচারে আশ্চর্যরকম শিল্পোত্তীর্ণ। ভারতের ভাবসৌন্দর্য ইংরেজি কবিতায় তরু দত্তই প্রথম মূর্ত করে তোলেন। ব্যঞ্জনায় ও রূপকল্প রচনায় তাঁর সনেট ও গীতিকবিতাগুলি অনুপম। 'বাগমারী' (*Baugmaree*)-র মত চিত্ররূপময় সনেটের আবেদন সত্তর বছরের ব্যবধানে আজও অক্ষুণ্ণ :

> And o'er the quiet pools the seemuls lean,
> Red,—red, and startling like a trumpet's sound.
> But nothing can be lovelier than the ranges
> Of bamboos to the eastward, when the morn
> Looks through their gaps, and white lotus changes
> Into a cup of silver.……

তরু সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক মিঃ এইচ এ এল ফিশারের অভিমত হল—'This child of the green Valley of the Ganges is likely to

remain for ever in the great fellowship of English poets'. টমসন তরুকে এমিলি ব্রন্‌টির পাশে আসন দেন।

সংস্কৃত থেকে কয়েকটি গল্পও তরু অনুবাদ করেন। এবং *'Bianca or the young Spanish Maiden'* নামে একটি ইংরেজি রোমান্সও লিখতে শুরু করেন, শেষ করে যেতে পারেন নি।

শোশীচন্দ্রের কবিতায় ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের প্রভাব অত্যন্ত। বাঙালি পাঠকের কাছে রমেশচন্দ্র দত্তর নাম অপরিচিত নয়। ইংরেজিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ। তাঁর অনুবাদ আজও শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত, এভরিম্যানস্ লাইব্রেরি-প্রকাশিত বিশ্বের সেরা সাহিত্যের তালিকাভুক্ত। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ অবশ্য সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মূলানুগ—মূলের কাব্যমাধুর্যও অব্যাহত। এমন-কি, মূল গ্রন্থের উপমাদি পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ। এ-সম্পর্কে রমেশচন্দ্র নিজেই ভূমিকায় বলেছেন : 'The advantage of this arrangement is that, in the passages presented to the reader, it is the poet who speaks to him, not the Translator' ·····

॥ ৭ ॥

ভারতীয়-ইংরেজি সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ করেন তরু দত্ত। পরবর্তী যুগে মনমোহন ও অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ এবং সরোজিনী নাইডু, কে এস বেঙ্কটরমনী ও হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধনায় সে-সাহিত্য আজ রীতিমত সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র-প্রতিভা এক্ষেত্রেও অনেক অনুকারকের সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দের মত কবি অরবিন্দেরও একটি নিজস্ব 'স্কুল' গড়ে উঠেছে। কোন ভারতীয়ের ইংরেজিতে কবিতা লেখা—সার্থক কবিতা লেখা—আজ আর চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নয়। ভারতীয়-ইংরেজি কবির সংখ্যা এখন অজস্র—দেওয়ান বাহাদুর কে এস রামস্বামী শাস্ত্রী, জি কে চেট্টুর, পি শেষাদ্রী, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, হুমায়ুন কবির, যোসেফ ফার্তাদো (গোয়ানিজ), আরমান্দো মেঞ্জেস (ঐ), উমা মহেশ্বর, ভি এন ভূষণ, এ এফ খবরদার, কে ডি সেঠনা, দিলীপকুমার রায়, সিরিল মোদক, বি রাজন, পি আর কৈকিলি ইত্যাদি ইত্যাদি—কৌতূহলী পাঠক একটু সচেষ্ট হলেই পড়ে মুগ্ধ হবার মত প্রচুর সংখ্যক ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাবেন। ভারতীয় ইংরেজি কাব্যসাহিত্যকে

আজ আর কোন ভারতীয় সাহিত্য থেকে পৃথক করে দেখা চলে না, শুধু ভারতীয়ত্ব বজায় রাখাকেই কবিরা আজ আর নিজেদের অনন্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন না, শুধু বিদেশি পাঠকের মুখ চেয়ে আর এখন তাঁরা কবিতা লেখেন না :

> I, Poet, dip my pen
> In mine own blood to write my songs for men,
> Since every song is but a keen self-giving
> To tired life which, now and then
> Seems but a drab apology for living·····
>
> I do not write only because I can,
> I write because I must.

—হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

॥খ॥

পূবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য

ইংরেজ আমলের আগে হিন্দু সাহিত্য বা মুসলিম সাহিত্য বলে পৃথক কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল বাংলা সাহিত্য, হিন্দু মুসলমানের মিলিত অবদানে যার পুষ্টি। বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ভাবজগতে যুগান্তর আনে। বিবদমান আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও দেশজ অনার্য সংস্কৃতির ওপর ইসলামের প্রভাবে গড়ে ওঠে নতুন এক যৌথ সংস্কৃতি। মধ্যযুগের জনমানসের, লৌকিক ধ্যানধারনার, নরনারীর মানবিক প্রেমের ও উদার মানবতাবাদের উজ্জল স্বাক্ষর তাতে রয়েছে। উগ্র ধর্মান্ধতার স্থান সেখানে ছিল না। দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তাজা, আলীরাজা মুসলিম, কিন্তু তাঁদের সাহিত্য মুসলিম সাহিত্য নয়। বিশেষ করে বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে তো হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের দানই বেশি। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলিম কবির সংখ্যাই কি কম ?

ইংরেজ এসে বাংলার সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড আঘাত হানে, গ্রামীণ সমাজকে আধমরা করে শহর গড়ে তোলে। ভাগজগতেও ঘটে এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগৃতির সূচনা—তার পীঠস্থান কলকতা, পুরোহিত হিন্দু। হিন্দুরা সেদিন দোষগুণ নির্বিশেষে যত সহজে ইংরেজের সবকিছু আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিলেন, মুসলমানরা পারেন নি। রাজ্যোপহারী ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিমানের বশে তাঁরা তফাতে সরে দাঁড়ান, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা হারাম ঘোষণা করেন। নবাবী ঐতিহ্যের মোহটাকেই তাঁরা সেদিন আঁকড়ে ধরে ছিলেন।

কিন্তু, ইতিহাস কারো অভিমানের মুখ চেয়ে চলে না। বিরোধবন্ধুর পথে তার অগ্রগতি। দুর্বলতাকে, যুক্তিহীনতাকে নিষ্ঠুর হাতে দুপাশে সরিয়ে নিজের পথ সে করে নেয়। এই মর্মান্তিক সত্যটা মুসলমানরা বুঝেছিলেন পরে। বড়-বেশি দেরি তখন হয়ে গেছে। নতুন যুগের বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণ করেছেন হিন্দুরা, মুসলমান সেখানে অনুপস্থিত। শিক্ষায় দীক্ষায় সবদিক দিয়ে অনেক পেছনে তাঁরা পড়ে গিয়েছেন। সম্প্রদায় হিশেবে

সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু শিল্পসংস্কৃতির নেতৃত্ব তাঁদের হাতে নয়—সেখানে ভূমিকা তাঁদের নঞর্থক।

বাস্তবজীবনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নবোদ্ভূত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বভাবতই হিন্দুদের কাছে মার খেলেন। তাঁদের মধ্যে আত্মবিকাশের যে চেতনা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, হিন্দুরাও তার যথাযথ মর্যাদা দিলেন না। ভারতে নবজাগৃতির স্রষ্টা রামমোহন উপনিষদ কোরআন বাইবেল হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর উত্তরসাধকরা সেই সমন্বয়ের ঐতিহ্য একনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেননি। হিন্দু সাহিত্যিকরা বিমূর্ত মানবতাবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রবলকণ্ঠে প্রচার করেছেন, আপন ঘরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে পারেন নি। একদল মুসলিম লেখক যে অভিযোগ করে থাকেন—গুণ্ডা-গাড়োয়ানের প্রয়োজন না পড়লে হিন্দু-রচিত গল্প-উপন্যাসে মুসলিম চরিত্র বড়-একটা আমদানি করা হয় না—এটা একেবারে ভিত্তিহীন হলে যারপরনাই খুশি হতাম। বাংলা দেশে মুসলমানরা সংখ্যাধিক, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁরা কোথায়? এমন-কি, 'মুসলিম-বিদ্বেষী' বঙ্কিমও তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্স-উপন্যাসে যেটুকু অগ্রসর সেদিন হয়েছিলেন, আধুনিক লেখকরা তা-ও পারেননি।

এর প্রধানতম কারণ, আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি শহুরে সংস্কৃতি—'বাবু সংস্কৃতি'। শহরে হিন্দু মুসলিম প্রতিযোগিতা প্রকট, সাম্প্রদায়িক পার্থক্যটাও প্রত্যক্ষ। তাই 'বাবু সংস্কৃতির' পাশাপাশি এখানে গড়ে উঠেছে 'মিঞা সংস্কৃতি'। অপিচ, আধুনিক বাঙালি কথাশিল্পীরা প্রায়-সকলেই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। পুববাংলায় হিন্দু মুসলিম জীবনধারা যেমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত, পশ্চিমবঙ্গে ঠিক তেমনটি না। মুসলিম জনজীবনের সঙ্গে এই লেখকদের পরিচয় তত ঘনিষ্ঠ নয়। তাই ইতস্তত দু'একটি মুসলিম চরিত্র সার্থকভাবে এঁদের হাতে চিত্রিত হয়ে উঠলেও—মুসলিম সম্প্রদায়কে, তাঁদের আশাআকাঙ্ক্ষা ধ্যানধারনা ও দৈনন্দিন জীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে এঁরা অক্ষম হয়েছেন। এর ওপর রয়েছে কিছুটা সুপীরিয়রিটি কমপ্লেক্স্—কি সাহিত্যে কি জীবনে। সৈয়দ মুজতবা আলী ছাড়াও যে মুসলিম লেখক রয়েছেন হিন্দু পাঠকসাধারণ সে খবর জানেন না, জানা প্রয়োজনও বোধ করেন না। এবং, পুবপাকিস্তানে এই বই রফ্তানির

জন্যে কলকাতার প্রকাশকরা যে পরিমাণ দৌড়ঝাঁপ করেন, তার একদশমাংশও যদি করতেন পুবপাকিস্তান থেকে বই আমদানির জন্যে !

তারই ফলে উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মচেতনার বিকাশে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতার রঙ ধরেছে। মুসলিম শোষকশ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থে নিজেদের তাঁরা আলাদা একটা জাত বলে ভাবতে শুরু করেছেন, কৃত্রিম দেশভাগের দাবি তুলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে জাত-ধর্মের দোহাইয়ে মধ্যযুগের গৌরবময় বাঙালি সংস্কৃতিকে পর্যন্ত ভাগ করেছেন। ইসলাম-বিদ্রোহী সুফী কবিসাধকদেরও এখন মুসলিম 'তাহ্‌জীব ও তমদ্দুনে'র স্রষ্টা বলে মেনে নিতে তাঁদের বাধে না !

তারই চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপের প্রকাশে আজ দেখছি—পুবপাকিস্তানে কোন কোন বাঙালি মুসলিম কবি-কথাশিল্পীর পরুষকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—'রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাই।'

॥ ২ ॥

আধুনিককালে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন শক্তিমান মুসলিম লেখকেরও আবির্ভাব ঘটে। যথা—কায়কোবাদ, কাজি এমদাদুল হক, মীর মোশার্‌রফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজি নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদির, কাজি আবদুল ওদুদ, কাজি মোতাহের হোসেন, সুফী মোতাহের হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, বরকতুল্লাহ্‌, আবুল ফজল, শাহাদাৎ হোসেন, বেনজির আহ্‌মদ, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, হুমায়ুন কবির ইত্যাদি। এদের কেউ-কেউ লোকান্তরিত, অনেকেই এখনো জীবিত, কেউ-বা জীবন্মৃত। সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে এঁদের দান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়। হিন্দু সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বাস করেও এঁরা শক্তি ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

তবে হিন্দুদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারটা এক্ষেত্রে অবান্তর, অযৌক্তিক। আধুনিক যুগের প্রথম দিকে হিন্দুদের অনুসরণ ও অনুকরণ করাই ছিল মুসলিম সাহিত্যিকদের আদর্শ। ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাবে মধ্যবিত্ত হিন্দু মুসলমানের সামাজিক জীবনে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, কিন্তু মুসলিম লেখকদের মনে সে-বোধ

স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রভাবে অনেক হিন্দু লেখকের মত তাঁরাও দিশেহারা। মুসলিম সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করে তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু সেই সমাজ ও জীবনকে দেখেছেন হিন্দুর চোখ দিয়ে। ফলে, কালীতারা দাসী তাঁদের হাতে হয়েছে কুলসম বিবি, মুকলেসর রহমান মুকুলেশ্বর রহমান। হিন্দু লেখকরা বেশি চালাক কিনা, তাই মুসলিম সমাজকে উপজীব্য করে লেখেনইনি! আর এঁরা যা লিখেছেন রক্তমাংসের স্পন্দন তাতে পাওয়া যায়নি। কেননা হিন্দু লেখকদের মত এই মধ্যবিত্ত মুসলিম লেখকদেরও মুসলিম জনজীবনের সঙ্গে কোন আন্তরিক যোগাযোগ ছিল না। অনেক পরে—পাকিস্তান আন্দোলনের তাগিদে—এঁদের 'ম্যাস-কন্ট্যাক্ট' শুরু।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম—কাজি ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ্।' উপন্যাস হিশেবে 'আবদুল্লাহ্'—সমকালীন বাংলা উপন্যাসের মানদণ্ডে—পুরোপুরি সার্থক না হলেও কাজি সাহেব এখানে মুসলমানের চোখ দিয়ে মুসলিম জীবনকে দেখতে পেরেছিলেন। তাঁর অ-পূর্ব কৃতিত্ব এইখানে। প্রাবন্ধিক, গবেষক, বা আরবী-ফার্সী ইসলামী সংস্কৃতির পটভূমিকায় যাঁরা সাহিত্য রচনা করছেন তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

মুসলিম সাহিত্যিকদের এই হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির পরোক্ষ সমর্থনে বছর কয়েক আগে জনৈক সুপরিচিত তরুণ মুসলিম লেখক এক আজব যুক্তি পেশ করেন। মুসলিম সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রসঙ্গ তুলে তিনি মোক্ষম যুক্তি হানেন পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে : প্রেম (অবৈধ ?) ছাড়া গল্প হয় না—এবং মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার দরুন প্রেমের (অবৈধ ?) পথ বড়ই ঘোরালো—অতএব—! তাছাড়া, মুসলিম পাঠকই-বা কোথায় ? তাঁদের লেখা 'আধুনিক সাহিত্য' পড়বে কে ? অতএব—!

উপরোক্ত লেখক, বলা বাহুল্য, শ্রেণীধর্মে মধ্যবিত্ত—'মিঞা সংস্কৃতি'র ধারাবাহী—ফলে এই উন্নাসিকতা, প্রেম নিয়ে কল্পনাবিলাস। নইলে যে-পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ, মনেপ্রাণে তার ঘোরতর বিরোধী হয়েও জিজ্ঞাসা থেকে যায়—একমাত্র খানদানি ও তার কঙ্কালাশ্রয়ী মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত পরিবার ছাড়া মুসলিম জনসাধারণের বিরাটতম অংশের মধ্যে কোথায় এই পর্দার প্রতিরোধ ? পুববাংলার জেলে-জোলা-কিসান-মাঝিদের মধ্যে পর্দার বালাই

নেই, পশ্চিমবঙ্গেও না। অথচ এদের নিয়ে ধ্রুপদী সাহিত্য সৃষ্টির কী বিরাট সম্ভাবনাই উপেক্ষিত! বিশেষ করে, পুববাংলার শিল্পীপ্রাণ জনসাধারণ। মানুষ-প্রকৃতির আদিম সংগ্রামের যে মহিমময় ঐতিহ্য আজো এঁরা সগৌরবে বহন করে চলেছেন—তার নামমাত্র পরিচয়ও যদি উপরোক্ত ফরিয়াদী সাহিত্যিক ও তাঁর অনুগামীরা রাখতেন!

আসলে কন্টিনেন্টের ও হিন্দু সাহিত্যিকদের চোখধাঁধানো কাণ্ডকারখানায় এঁরা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই ওই অভিযোগ—মুসলিম পাঠকের অনস্তিত্বের অজুহাত।

কোন লেখকেরই পাঠক তৈরী হয়ে বসে থাকেনা—শক্তিশালী লেখক পাঠক তৈরী করে নেন। রবীন্দ্রনাথের আগে রবীন্দ্র-ভক্তরা কোথায়? আরো প্রয়োজন, ঐতিহ্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ সাহিত্য-আন্দোলনের। সাহিত্যে প্রচার-কার্য কথাটা কারো-কারো শ্রুতিকটু শোনালেও—সাহিত্যের প্রচারকার্যে আশাকরি চরম বিশুদ্ধবাদী সাহিত্যিকেরও আপত্তি নেই।

॥ ৩ ॥

অবিভক্ত বাংলায় নজরুল, জসীমউদ্দীন প্রমুখ দুচারজন ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম সাহিত্যিক সম্পর্কে হিন্দু পাঠক অজ্ঞ ছিলেন। বাংলা বিভাগে সে-অজ্ঞতার মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছে—'ঢাকা দূর অস্ত্'। দুএকটি টিমটিমে সাপ্তাহিক ছাড়া এখন পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম-পরিচালিত পত্রপত্রিকা নেই। নজরুল, কাজি আবদুল ওদুদ, গোলাম কুদ্দুস, আমিনুর রহমান প্রমুখ দুচারজন ছাড়া মুসলিম সাহিত্যিকই-বা এখানে আর কোথায়?

অবিভক্ত বাংলার যে দুটি মুসলিম-পরিচালিত মাসিক পত্রিকার নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়—তার একটি 'সওগাত', আরেকটি 'মাসিক মোহাম্মদী।' 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা', 'বুলবুল', 'গুলিস্তাঁ', 'শিশু সওগাত', 'মৃত্তিকা' ইত্যাদির নামও অবিশ্যি এই প্রসঙ্গে আসে—তবে অধিকাংশ মুসলিম সাহিত্যিকেরই সাহিত্যজীবন শুরু প্রথম দুটি পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। নজরুল থেকে অতিআধুনিক আলাউদ্দীন-আল আজাদ পর্যন্ত প্রায়-প্রত্যেক মুসলিম লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'সওগাত'-এর পৃষ্ঠায়। 'সওগাত'-এর

প্রগতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গি একদা গোঁড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় 'সওগাত' অথণ্ড জাতীয়তাবাদের আদর্শে অব্যাহত থাকে—সেজন্যেও কম বাধাবিপত্তির মুখোমুখি তাকে হতে হয়নি। তুলনায় মওলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের 'মাসিক মোহাম্মদী' ছিল প্রাচীনপন্থী—পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অবস্থা বড় করুণ হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িকতার—তা সে হিন্দুই হোক কি মুসলিমই হোক—রূপ ও প্রকাশ অভিন্ন। দেশবিভাগের প্রথম ধাপেই 'মাসিক মোহাম্মদী' সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানবাদী মুসলিম লেখকরাও দেশান্তরী হলেন। স্বেচ্ছায়। পরবর্তীকালে 'সওগাত' ও জাতীয়তাবাদী, অনেক বামপন্থী লেখকও, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে গেলেন। অবস্থাগতিকে।

বর্তমানে ঢাকায় 'সওগাত' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' ছাড়াও 'মাহে নও' 'দিলরুবা' 'নওবাহার,' 'ইমরোজ,' 'কাফেলা,' 'বেগম' ইত্যাদি মাসিক ও সাপ্তাহিক রয়েছে। দৈনিক পত্রিকাগুলির রববারের ক্রোড়পত্রেও নিয়মিত-ভাবে সাহিত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত পুববাংলায় সাহিত্য-প্রকাশন এখনো স্বনির্ভর ব্যবসা হিশেবে গড়ে ওঠেনি। সাহিত্য-জীবী লেখক সেখানে একজনও নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গের অতি সাধারণ লেখকও কম করে দশ-বারো খানা গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু পুববাংলার প্রথম শ্রেণীর লেখকের পক্ষেও এতগুলি বইয়ের মুদ্রিত রূপ দেখা আজও আকাশকুসুম। উদাহরণ নিন: ডাঃ শহীদুল্লাহ্, ডাঃ এনামুল হক, আবদুল গফর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ, কাজি মোতাহের হোসেন, আবুল মনসুর আহ্মদ, আবুল ফজল, বেগম সুফিয়া কামাল, ইব্রাহিম খান, গোলাম মুস্তফা, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, জসীমুদ্দীন, মাহ্বুব-উল আলম প্রমুখ প্রাবন্ধিক, কবি ও কথাশিল্পীদের কখানা করে বই প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তান কায়েম হবার পর?—ভেবে-চিন্তে জবাব দিতে হবে।

কিন্তু, শক্তিমান কবি ও সমালোচক কাদিরের মত এঁদের কেউ কেউ অধুনা সাহিত্য সাধনায় প্রায় ইস্তফা দিলেও অধিকাংশই স্বধর্মনিষ্ঠ। প্রবন্ধ সাহিত্যে ডাঃ শহীদুল্লাহ্, ডাঃ এনামুল হক, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও কাজি মোতাহের হোসেন, কথাসাহিত্যে 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স'-এর অবিস্মরণীয়

কথাশিল্পী আবুল মনসুর আহ্‌মদ', 'চৌচির' ও 'মাটির পৃথিবী'র আবুল ফজল, 'কাফেলা', 'মজনু বয়াতী'-র ইব্রাহিম খান, 'মো'মেনের জবানবন্দী'র মাহ্‌বুব-উল আলম, আর কাব্যক্ষেত্রে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল, নিষ্প্রয়োজনপরিচয় জসীমুদ্দীন আজও পুববাংলার লেখকদের অগ্রজস্থানীয়। পুথিসাহিত্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে মরহুম সাহিত্যবিশারদের পথের পথিক আবদুল গফর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ।

এঁরা সাহিত্যাগ্রজ, এঁরা শ্রদ্ধাস্পদ, এঁরা নমস্য—কিন্তু পুববাংলার নতুন সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন এঁদের রচনায় পুরোপুরি পাওয়া যাবে না।

॥ ৪ ॥

> "...অধুনা আমাদের সাহিত্যসাধনা স্পষ্টত দুইটি ধারায় অগ্রসর হইতেছে। একটা ঐতিহ্যানুসারী ইসলামমুখী ধারা, অপরটি ইউরোপীয়ইজম অনুগ সাধনা। সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে ইসলামমুখী ধারা বড়ই ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। যদিও আমরা মুখে ইসলামপ্রীতি জাহির করিতেছি, কার্যত তাহার যেন আশানুরূপ প্রতিফলন হইতেছে না। অপর ধারাটি তরুণরা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এমত অবস্থায় চিরদিন যাহা ঘটিতেছে তাহাই ঘটিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা। তাহা হইল আদর্শ-সংঘাত। ফলত বিপ্লব অনিবার্য। সকল দেশেই তাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। অবশ্য একপক্ষ যদি নিতান্ত দুর্বল হয় তবে আশঙ্কার কিছুই নাই—প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মোকাবেলা করিবার সামর্থ্য না থাকিলে দুর্বল সবলের বশ্যতা নীরবেই স্বীকার করিবে।..."

বছর কয়েক আগে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাক সংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতির মঞ্চ থেকে এই কথাগুলি বলেছিলেন মরহুম সাহিত্যবিশারদ। এর মধ্যে কিছুটা বেদনার সুর অনুরণিত, অশীতিপর বৃদ্ধের কাছ থেকে সেটা অপ্রত্যাশিতও নয়। তবু আজীবন সাহিত্যসেবী বাস্তবকে চোখ ঠারেননি, অপ্রিয় সত্যের উচ্চারণে কণ্ঠ তাঁর কাঁপেনি।

বর্তমানে পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য স্পষ্টত দুটি ধারায় বিভক্ত: একদল বাংলা সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের অনুসারী, আরেকদল বাংলা সাহিত্যের সমাধির ওপর পাকিস্তানী সাহিত্যের অমূল সৌধ নির্মাণের সাধনায় তৎপর। একদলের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বমানবের দিকে, আগামী ভবিষ্যতের দিকে—আরেকদলের 'হেরা পর্বতের' (হজরত মোহাম্মদের সাধনা ও সিদ্ধিস্থান) দিকে, ভবিষ্যত নয়—সপ্তম শতাব্দীর অতীত অন্ধকারে। একদল ইতিহাসের সঙ্গে এগোতে চান, আরেকদল ইতিহাসের গতি ফেরাতে চান। একদল বাংলা ভাষার ইয্‌যৎ রাখতে অকাতরে বুকের রক্ত ঢালেন, আরেকদল দাবি তোলেন 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু হোক'—তাঁদের লেখা পড়ে মনে হয় অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষাটা হল—'বাংলা-ভাষা উর্দু হোক!' যেন উর্দুর সঙ্গে ইস্‌লামের রক্তের সম্পর্ক! যেন উর্দুতেই রচিত হয়েছে কোর্‌আন, হাদীস! যেন উর্দুতে না-পাক শব্দ ভূরি ভূরি নেই!

প্রথম দলের পুরোভাগে শওকত ওসমান, সর্দার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দীন-আল আজাদ, আবদুল্লাহ্‌-আল মুতী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গনি হাজারী, আনিস চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, শামসুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্‌, রফিকুল ইসলাম ইত্যাদি। আবুল হোসেন, আহ্‌সান হাবীব, আশরাফ সিদ্দিকী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মবিন-উদ্দীন আহ্‌মদ, আবু রুশ্‌দ্‌, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রমুখ সুপরিচিত তরুণ কবি ও কথাশিল্পীরাও এই ধারারই অনুসারী। এবং রাজনীতি সম্পর্কে মতামত যাই হোক, প্রায়-প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে এই দিকে। গত পুবপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রবন্ধ-লেখক পেয়েছে। রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্টের মত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে সকল দলের সকল মতের সাহিত্যিকদের যে কিভাবে একত্র সমবেত করা যায়, সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সারা বাংলার সামনে। তাই বলে এঁরা সকলেই কিন্তু মার্কসবাদী বা পাকিস্তান বিরোধী নন—পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধ এক রাষ্ট্র হিশেবে গড়ে তুলতে এঁরা বদ্ধপরিকর।

তুলনায় অন্যদলের অনুগামী সংখ্যা মুষ্টিমেয়, জনসমর্থনও নেই তাঁদের পিছনে। পুবপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জগতে কার্যত তাঁরা কোণ্‌ঠাসা—

সাংস্কৃতিক জগতের মুসলিম লীগ! তবু যে এঁদের হাঁকডাক আজও শোনা যায়, হেতু তার অন্যত্র। গোলাম মুস্তফা, ফররুখ আহ্মদ, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, মুখাখ্খারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহ্সান, আবছর রশীদ খান, মোস্তাফিজুর রহ্মান, আস্কার ইবনে শাইথ ইত্যাদি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সুপরিচিত লেখক।

॥ ৫ ॥

পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য নিয়ে আলোচনার প্রধানতম অন্তরায় গ্রন্থাভাব। আগেই বলেছি, প্রকাশন-ব্যবসা সেখানে এখনো ঠিকমত গড়ে ওঠেনি। তার ফলে এঁদের অধিকাংশই এখনো পত্রপত্রিকার লেখক মাত্র, গ্রন্থকার মাত্র কয়েকজন। এবং সে-সব বইও এত আগে প্রকাশিত বা সংখ্যায় এত কম যে এঁদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাতে অনুপস্থিত।

যেমন আবুল হোসেন, আহ্সান হাবীব ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্—প্রাক বিভাগ যুগেই এঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আবুলের কাব্যগ্রন্থ 'নববসন্ত', হাবীবের 'রাত্রিশেষ' এবং ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পসংকলন 'নয়নচারা' বেরিয়েছিল সেইসময়। ওয়ালীউল্লাহ্র 'লাল সালু' উপন্যাস ছাড়া তারপর থেকে এঁদের আর কোন বই-ই বেরোয়নি। অথচ 'নববসন্ত'র আবুলের সঙ্গে আজকের আবুল হোসেনের পার্থক্য আসমান জমিন।

শওকত ওসমান বয়েসে তরুণ, চালচলনে আরো—তবু ইনিই হলেন পুবপাকিস্তানের তরুণ গোষ্ঠীর গুরুস্থানীয়। শওকতের সাহিত্যজীবন শুরু কবি ও রোমান্টিক গল্পলেখক হিশেবে। নিটোল রোমান্টিক গল্প 'পদ্মফুল'-এর শওকত ওসমান একদা অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। পরে ধীরে ধীরে এঁর মানসিকতায় রূপান্তর ঘটতে থাকে। তার প্রথম শিল্পসম্মত নিদর্শন 'ফাদার জোহানেস'।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জীবনের প্রথম সার্থক কথাকার শওকত ওসমান। বর্তমানে পুবপাকিস্তানের। গল্পের আঙ্গিক বা ভাষা সম্পর্কে ইনি যথোচিত সচেতন নন, কিন্তু জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ও বলিষ্ঠ জীবনবোধ সে-ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে। শওকতের 'বনি আদম' নিঃসন্দেহে আধুনিককালের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্প। সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ভণ্ডামির ওপর দ্বিধাহীন কষাঘাত—এঁর গল্পের অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'সওগাত'-এ 'জিন্দান' নামে শওকতের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থাকারে সেটা বা আর-কোন উপন্যাস বেরিয়েছে কিনা ঠিক জানিনে। তবে, আমার মনে হয়, সত্যিকারের ঔপন্যাসিকের সম্ভাবনা রয়েছে শওকতের মধ্যে। 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' এবং 'পিঁজরাপোল' এঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন। নাটকে ('কাঁকরমণি,' 'আমলার মামলা') ও শিশুসাহিত্যেও ('ওটেন সাহেবের বাংলো') শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ওয়ালীউল্লাহ্ রোমান্টিক হয়েও মননধর্মী। ভাষার কারুকর্মে, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায়, আঙ্গিকের সুষ্ঠু প্রয়োগে ও পটভূমির বৈচিত্র্যে এঁর 'নয়নচারা' অতুলনীয়। শওকতের মত মুসলিম সমাজকে ইনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেননি সত্যি, তার খণ্ডিত রূপটিকেই কিন্তু ফুটিয়ে তুলেছেন আশ্চর্যরকম নিপুণতার সঙ্গে। এমন 'ফিনিশ্ড্' ও 'সফিস্টিকেটেড' লেখক পুবপাকি-স্তানে দ্বিতীয় জন নেই। আবুল কালাম শামসুদ্দীন যেন গল্প লেখেন না, বলেন। অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথাশিল্পী হিশেবে এঁর আবির্ভাব—কিন্তু সে-প্রতিশ্রুতি শামসুদ্দীন পালন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। 'শাহের বানু'র লেখকের কাছ থেকে 'অনেক দিনের আশা' বা 'পথ জানা নাই' অপ্রত্যাশিত। গ্রামজীবন নিয়ে শিল্পোত্তীর্ণ কাহিনী নির্মাণে সবিশেষ যিনি পারঙ্গম, কেন-যে তথাকথিত শহুরে প্রেমের জোলো গল্প লিখতে গিয়ে নিজের ক্ষমতার অযথা অপব্যবহার তিনি করেন! 'কলঙ্ক'র মবিন উদ্দীন পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'ভাঙা বন্দর' ও 'হোসেন বাড়ির বউ'-এ তাঁর পূর্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—এর বেশি বলা যায় না। ছোট গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে ইনি যেমন সচেতন, দৃষ্টিভঙ্গিতেও যদি সে-পরিমাণ স্বচ্ছতা ও বিবৃতিতে সংযম থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে মবিন উদ্দীন পুবপাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ কথাশিল্পী হিশেবে পরিগণিত হতেন। আবু রুশ্দ্ যে পণ্ডিত তার্কিক—তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়লে সেটা বেকসুর বোঝা যায়। মুনীর চৌধুরী লেখেন কম, যতদূর জানি, গ্রন্থকারও আজ পর্যন্ত নন—কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এঁর ছোট গল্প, বিশেষ করে নাটিকাগুলি, প্রথম শ্রেণীর শিল্পী-স্বাক্ষর বহন

করে। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় মুনীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মতবাদ যাই হোক শাহেদ আলী শক্তিমান কথাশিল্পী নিঃসন্দেহে। 'জিবরাইলের ডানা'-র জন্যে সকল শ্রেণীর পাঠকেরই প্রশস্তি লাভের অধিকারী। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে সার্থক কথাশিল্পী বলতে শুধু এই একজনই রয়েছেন। আস্‌কার ইবনে শাইখ নাটকের ক্ষেত্রে কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তরুণতরদের মধ্যে আলাউদ্দীন-আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্, আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ কেউ—যথা আজাদ, আতীকুল্লাহ্— কবিতা লিখলেও, মুখ্যত সবাই কথাশিল্পী। পুবপাকিস্তানের তরুণ কথা-শিল্পীদের (প্রবীণরাই কি ব্যতিক্রম?) একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায়-সকলেরই উপজীব্য গ্রামজীবন কিম্বা বিত্তহীন শহুরে সম্প্রদায়। তরুণ হিন্দু লেখকরা সাহিত্য-সাধনার শুরুতেই 'কি বলবেন'-এর বদলে 'কি করে বলবেন' নিয়ে বেশি মাথা ঘামান—এর বিপরীতধর্মী পুবপাকিস্তানের লেখকরা। তাই পশ্চিমবঙ্গের মাপকাঠিতে এঁদের অনেকের লেখাই হয়ত শিল্পসুন্দর নয়—কিন্তু জীবনের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণে শিল্পসার্থক।

তরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথাশিল্পী আলাউদ্দীন-আল আজাদ। 'বাংলা দেশের লেখকরা গোখ্‌রো হয়ে জন্মায় ঢোঁড়া হয়ে মরে' বলে আশঙ্কা, নইলে পুবপাকিস্তানের ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আজাদ—এই ভবিষ্যৎবাণী অনায়াসে করা যেত। বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার এবং অনুপম রচনাশৈলী ও আঙ্গিকদক্ষতার যে পরিচয় আজাদ 'জেগে আছি' ও 'ধানকন্যা'য় দিয়েছেন—তা অসাধারণ।

সার্থক উপন্যাসের নিদর্শন পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্যে নেই বললেই চলে।

॥ ৬ ॥

তরুণ কবিদের নিয়ে আলোচনার আগে গোলাম মুস্তফা সম্পর্কে দুএকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন—ইনিই সবচেয়ে সিনীয়র কিনা। এবং, সিনীয়র কবিদের মধ্যে একমাত্র মুস্তফা সাহেবই সাম্প্রতিক সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গে

সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট, অন্যান্যদের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের কাছে পরিচিতও অধিকতর।

গোলাম মুস্তফা প্রথমে ছিলেন লীরিকধর্মী, পরে হয়ে ওঠেন নজরুল-অনুকারী। যদিচ সে-পরিচয় দিতে আপত্তি করতেন ঘোরতর। 'বিদ্রোহী'র প্রতিবাদে 'নিয়ন্ত্রিত' লিখে সেই আপত্তির চিহ্নও সেদিন রাখতে চেয়েছিলেন। শুধু কবি নন, 'রূপের নেশা' উপন্যাস ও মোহাম্মদের জীবনী 'বিশ্বনবী'র রচয়িতা হিশেবেও মুস্তফা সাহেব পরিচিত—যদিচ উপন্যাস হিশেবে 'রূপের নেশা' অসফল প্রয়াস, মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির উচ্ছ্বাসে 'বিশ্বনবী' ভারাক্রান্ত। বরং মওলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের 'মুস্তফা-চরিত', তুলনায় অনেক-বেশি ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। বর্তমানে গোলাম মুস্তফা দ্বিতীয় গোষ্ঠীর পুরোভাগে—কাব্যশক্তি নয়, বয়েসের বিচারে।

তরুণ মুসলিম কবিদের মধ্যে—ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, না আহ্‌সান হাবীব—কে বেশি শক্তিশালী বলা শক্ত। আসলে, ভিন্নধর্মী দুই কবির তুলনামূলক বিচারটা বিতর্ক-সাপেক্ষ ব্যাপার। একদা অসামান্য সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ফর্‌রুখের মধ্যে, ছাত্রজীবনে 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় তাঁকে তরুণ বাংলার অন্যতম কৃতি সনেটশিল্পী হিশেবে লক্ষ্য করে অনেকেই উল্লসিত হয়েছিলেন। ফর্‌রুখ তখন রীতিমত রোমান্টিক। আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে মনের যোগাযোগ না থাকলেও প্রাণের সংযোগ ছিল, প্রাণাবেগের প্রাচুর্যে তিনি নজরুলের অনুজ। নজরুলের মত অপ্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দপ্রয়োগের দিকেও এঁর প্রবণতা প্রথমাবধি। তবে, নজরুলের পরিমিতিবোধকে ইনি আত্মস্থ করতে পারলেন না, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতেও না। নজরুলের চোখ ছিল রাষ্ট্রের দিকে, ফর্‌রুখ হলেন অনন্যদৃষ্টি ধর্মের প্রতি। ভুলে গেলেন যে ইসলাম আর ইসলামী সংস্কৃতি হুবহু এক জিনিস নয়। ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকার মেয়াদ সীমাবদ্ধ, সংস্কৃতি বহতা নদী। বিংশ শতকের মধ্যাহ্নে ইসলামের 'পুনঃ আবাদ' অসম্ভব—সে-চেষ্টা বাতুলতা, প্রতিক্রিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা। ফর্‌রুখের ক্ষমতা অনস্বীকার্য, 'সাত সাগরের মাঝি'-র কবি অবিস্মরণীয়—তাই কাব্যপাঠক মাত্রেরই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ সীমাহীন।

ফর্‌রুখের বিপরীত হাবীব। ফর্‌রুখ প্রথমে মুসলমান, পরে কবি—হাবীব প্রথমে কবি, তারপরে মুসলমান। ফর্‌রুখ আগে মুসলমান, পরে বাঙালি—

হাবীব আগে বাঙালি, তারপরে মুসলমান। আধুনিক কাব্যের আঙ্গিকপদ্ধতি নিয়ে হাবীবের মন বিক্ষিপ্ত হয়নি, নতুন সংজ্ঞায় মননধর্মীও হাবীব নন— জীবনরসিক রোমান্টিক একটি কবি মন রয়েছে তাঁর। 'প্রেমের কবিতা' বা 'কান্না'র মত মনোরম প্রেমের কবিতা এমন-এক-সময়ে হাবীব আমাদের উপহার দিয়েছেন, ভ্রান্ত রাজনীতির আবর্তে দিশেহারা অধিকাংশ বাঙালি কবি যখন প্রেম নিয়ে পদ্য রচনাকে নারীহরণ তুল্য অপরাধ গণ্য করতেন। 'রাত্রিশেষ' হাবীবের একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কবিমনের রূপান্তরের একটা সুস্পষ্ট পরিণতি এতে লক্ষণীয়—মনোবিলাস ছেড়ে কবি মাটির পৃথিবীতে নেমে আসছেন। কিন্তু আমার ধারনা, রোমান্টিক প্রেমের কবিতাতেই হাবীব সার্থক। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা-দেশভাগের ধাক্কায় বিপর্যস্ত রোমান্টিক মানসিকতার অনিবার্য পরিণতি হয় বিপ্লবমুখীতা নয় নৈরাজ্যবাদ—ব্যঙ্গবিদ্রূপের পথ বেছে নেওয়া। হাবীব বিপ্লবী হয়ে ওঠেননি, শেষের পথই বেছে নিয়েছেন— 'হকনাম ভরসা,' 'ধন্যবাদ' ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণীয়। তবু, এখনো, মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় পুরনো হাবীবকে ফিরে পাওয়া যায়। তাঁর দুর্মর আশাবাদ আজো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। আজও হাবীব স্বপ্ন দেখেন—প্রেমের, সুন্দরের।

নতুন যুগের কাব্যজিজ্ঞাসা যে-কজন মুসলিম কবির মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল আবুল হোসেন তাঁদের সর্বাগ্রগণ্য। আঙ্গিকদুরন্ত— সমসাময়িক মুসলিম কবিদের মধ্যে আঙ্গিক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন। গদ্যকবিতা নির্মাণে এঁর নিপুণতাও অসাধারণ।—ছিল! কেননা, দেশভাগের পর 'মেহেদীর জন্য' পর্যায়ে গুটিকয় অত্যাশ্চর্য গদ্যকবিতা ছাড়া আর-কিছুই তিনি প্রায় লেখেন নি। কি-করে-যেন আবুলের মনে একটা ধারনা হয়ে গিয়েছে—বেশি লিখলে লেখা পড়ে যায়। হায়, আবুল হোসেন! রবীন্দ্রনাথের বাংলায় বেশির সংজ্ঞাটা যে কত-বেশি তা যদি ভেবে দেখতেন! মতিউল ইসলাম বিপ্লবী কবিতায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে ইনি আদর্শনিষ্ঠ নন। আসরাফ সিদ্দিকী জাত কবি, এঁর 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা'য় পড়ে-মুগ্ধ-হবার-মত অনেকগুলি কবিতাও রয়েছে, বর্তমানে লেখেনও আসরাফ সকলের চেয়ে বেশি—তবু আপসোস, আজও নিজস্ব একটি কাব্যরীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন না। অপরের অনুসরণে বা অনুকরণে—হোক

সে-অনুসরণ-অনুকরণ যারপরনাই সার্থক—নিজের প্রতিভার অনেকখানি অপচয় আসরাফ করে থাকেন।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে ফর্‌রুখের পরেই তালিম হোসেনের স্থান। তালিম হোসেন ও মুফাখ্‌খারুল ইসলাম 'ইসলামী নবজাগৃতির' কবি হিশেবে পরিচিত। তালিম হোসেন কিছু-কিছু সার্থক কবিতা লিখেছেন, শেষের জন সম্পর্কে কিন্তু মতামত দেওয়া দুষ্কর। কেননা এঁর কবিতার পাঠোদ্ধার কাফের পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। মুফাখ্‌খারুলের আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের ঘটা দেখে মনে হয়—আরবমরুর কোন কবি বুঝিবা বাংলা ক্রিয়াপদগুলো জেনে নিয়ে কবিতা লিখেছেন বাংলা হরফে। সৈয়দ আলী আহসান 'চাহার দরবেশ'-এর কবি হিশেবে শক্তির পরিচয় দেন—তবে কাব্যরচনার বদলে কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রেই ইনি অধিকতর সার্থক, যাই হোক দৃষ্টিভঙ্গি।

হাসান হাফিজুর রহমান ও শামসুর রহমান তরুণতরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। দুজনেই জীবনবাদী কবি—কিন্তু শুধু প্রগতিশীল বক্তব্যের খাতিরে নয়, তার সুচারু প্রকাশের জন্যেই এঁরা বিশিষ্ট। কাব্যের আলঙ্কারিক দিক সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন দুজনেই। এবং, আধুনিক মনন ও মানসিকতার অনুসারী, গৌরবময় বাংলা কাব্যঐতিহ্যের উত্তরসাধক।

এই হল পূর্বপাকিস্তানের নতুন সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয়। অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় কেউ দিতে পারেননি সত্যি, যুগন্ধর লেখকও কেউ নন—কিন্তু বহুর মিলিত প্রয়াসে এঁরা আজ নতুন ইতিহাস নির্মাণ করছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে, অস্বীকার করার যো নেই, মুসলিম লেখক মাত্রেই কম-বেশি প্রভাবিত হন। দেশ ভাগ হয়ত তাঁরা সবাই চাননি, সাম্প্রদায়িকতাকেও ঘৃণা করেছেন মনেপ্রাণে—কিন্তু ঘটনাচক্রে বিভ্রান্তিকে এড়াতে পারেন নি। 'পাকিস্তানী সংস্কৃতি'র স্বপ্নও দেখছেন কেউ-কেউ। অবিশ্যি সে-স্বপ্ন ভাঙতে দেরি হয়নি। রক্ত দিয়ে সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্য করতে এঁরা পিছু হটেননি।

গত সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতায় শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব পুবপাকিস্তানের জনমনেরই প্রতিধ্বনি করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিমের পদ্যাংশের উধৃতি দিয়ে।

> যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
> সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি॥

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায় ॥

পুবপাকিস্তানে নবজাগরণের স্রষ্টা বিগত ভাষা-আন্দোলন। বাংলা ভাষার প্রতি এই অকৃত্রিম ভালোবাসাই পুবপাকিস্তানকে আত্মস্থ করেছে, নতুন করে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছে।

এই উজ্জীবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশ' :

…কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি ;……
দেশ আমার ! তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম ॥……

লক্ষ লক্ষ চারাধানের মত আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
শিখাগুলো দেখি,
কী আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছ—একটি দিন আগেও তো বুঝতে
পারিনি,
কী আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রামিত হয়েছ—
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারিনি, দেশ আমার ॥……

হে আমার জ্ঞান ! একটি মাত্র উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও
যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়,
ওষধি জন্মের মত একবার স্পন্দিত হয়ে যে ঘৃণা আর
কখনো মৃত্যুকে জানে না, হে আমার জ্ঞান !

আয়ুর প্রথম হৃদয়মন্থিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্যে তারা যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল
বুদ্ধ আর মোহাম্মদের দৃষ্টির মতো দীপ্তি,
ফল্গুর মুখদেশের মত উন্মথিত আবেগ,
আকাশের যে সাতটি তারা সমস্ত নীলিমার ভেতর চিহ্নিত হয়ে আছে
তাদেরই মত অনন্য ;……

তাদের একজন আজ নেই,
না, তারা পঞ্চাশ জন আজ নেই—
আর, আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মত এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি।

হে আমার দেশ ! বন্যার মতো
সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে গড়িয়ে এনে একটি চেতনাকে উর্বর করেছি ;
এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবনের সন্ধি,
সমুদ্রসৈকতে দুঃসাহসী নাবিকের করোটির ভেতর যেমন
দূরদিগন্তের হাওয়া হাহাকার করে
তেমনি এখানে রয়েছে একটি কোমল নারীর আশাহত সখিনা হৃদয়,
এখানে রয়েছে মা আর পিতা,
ভাই আর বোন—স্বজনবিধুর পরিজন
আর তুমি আমি, দেশ আমার !
এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি,
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে ;
দেশ আমার ! শুব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষ থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি :
এবার আমরা তোমার ॥

বস্তিবাসিনী মা অকস্মাৎ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তানকে বুকের কাছে ধরতে পারলে
যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে
তেমনটি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইয়ের অকাল মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।
আজ তো জানতে এতটুকু বাকি নেই মাগো,
তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও—

বাঙালির মন বাঙালির আশা বাঙালির ভাষা—এক হউক এক হউক এক হউক…
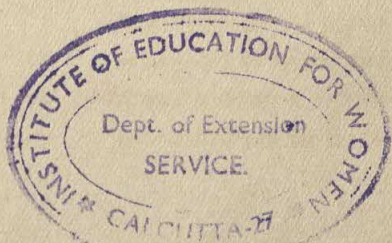
ঋণস্বীকার

এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন

অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, কানাইলাল সরকার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, কাজি আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা, আবদুল কাদির (ঢাকা), মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, ঈশ্বরচন্দ্র শেখর-শাস্ত্রী (বঙ্গ-তামিলন), অমল ঘোষ (মাদ্রাজ), টি এন সেনাপতি (ঐ), এম কে ধর (শ্রীনগর, কাশ্মীর), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী (কটক), শচীন দত্ত (ঐ), এম, কুনহাপ্পা, শিউকুমার জোশী, রামনিক মেঘানী, লক্ষ্মীকান্ত ভাট, অসীম সোম, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, হর্‌নামদাস সহরাই, মুহম্মদ জফীর, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী), শ্রীমতী শুভঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ), যাদব মুরলীধর মুলে (ঐ), বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, ভালচন্দ্র গোখলে, চিন্তামন বামন দাতার, এম এন নাগরাজ, পারভেজ শাহিদী ভাগবতচন্দ্র ঘোষ, ক্যালকাটা বুক ক্লাব ও মিহির সেন।